বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

ফিল্যানথ্রপি সংখ্যা

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা এপ্রিল–জুন ২০০৮

প্রকাশকাল

০১ মে ২০০৮

সম্পাদক

শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক

শরমিন নিশাত

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১, ই-মেইলঃ halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়

ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি

রবিন আহসান

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

শরমিন নিশাত ও শওকত হোসেন
(অজ্ঞাত শিল্পীর অংকন অবলম্বনে)

জনসংযোগ

আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ

খোরশেদ রানা

মুদ্রণ সহযোগিতায়

বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য

১৫০.০০ টাকা
১৫০.০০ রুপি
৫ $ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সমষ্টির জন্য মানুষের যে প্রেম, তাই ফিল্যানথ্রপি বা লোকহিতৈষণা। এই প্রেম, নিজের প্রতি নিজেরই দায়বদ্ধতা; অন্যের উপকার করার মধ্য দিয়ে নিজের আনন্দ আহরণ করা।

অতীতে এমন একটা সময় ছিল, রাজা বাদশা বা জমিদাররা পুকুর-দীঘি-জলাশয় খনন করে দিতেন, বড় বড় সড়ক-পুল-হাসপাতাল নির্মাণ করে দিতেন, গরিবদের জন্য আবাসস্থল, পথিকদের জন্য ছায়াঘেরা বনানী তৈরি করে দিতেন।

বর্তমানে মানুষের মধ্যে মানবকল্যাণের সেই ধারা সেভাবে দেখা যায় না। আর সাধারণ জনগণ যে ফিল্যানথ্রপিক কাজ করে থাকেন, তার কোনো প্রমাণই কোথাও ধরে রাখা হয় না; ইতিহাসে এদের ফিল্যানথ্রপিক অবদানের কথা প্রায় উল্লেখই নেই বলা যায়।

বর্তমান সময়ে এনজিও, বহুজাতিক কোম্পানি, প্রচারমাধ্যম ইত্যাদির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো যে সকল জনকল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বার্থই বেশি রক্ষিত হচ্ছে। জনগণ হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপকৃত হচ্ছে কিন্তু এভাবে জনগণকে শেষ পর্যন্ত করুণার পাত্রে পরিণত হতে হয়।

একমাত্র রাষ্ট্র পারে মানুষকে এই করুণার পাত্র হওয়া থেকে রক্ষা করতে এবং তাদের স্বাভাবিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে। রাষ্ট্রের নির্বাহীগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি; নির্বাহীদের কর্মকাণ্ড সন্তোষজনক না হলে জনগণ ঐ নির্বাহীদের পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু এনজিও বা বহুজাতিক কোম্পানির ওপর জনগণের সে ধরনের কোনো অধিকার থাকে না।

কল্যাণমুখী রাষ্ট্র তৈরির জন্যে সবার আগে আমাদের সাংস্কৃতিকভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার, যে বৃহৎ সাংস্কৃতিক আয়োজনের সঙ্গে 'হালখাতা'র এই ক্ষুদ্র অংশগ্রহণ। আমাদের প্রত্যাশা, ফিল্যানথ্রপিক সকল অর্জন মিলে কল্যাণমুখী-শ্রেণীমুক্ত রাষ্ট্র তৈরি করবে। সেদিন ফিল্যানথ্রপি'র আর দরকার হবে না।

'হালখাতা'র এ সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

শরমিন নিশাত
নির্বাহী সম্পাদক
০১.০৫.২০০৮

সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে আজ অবধি মানুষের মধ্যে যেমন হিংস্রতার প্রমাণ পাওয়া গেছে, একইভাবে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক কল্যাণবোধও লক্ষণীয়। এই কল্যাণবোধ নানা যুগে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দাস আমল, সামন্ত আমল, পুঁজির আমল এরকম সকল সময়ে মানুষ তার অন্তর্গত এই কল্যাণবোধের প্রকাশ দেখিয়েছে। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও তাদের স্বজাতির প্রতি কল্যাণবোধ রয়েছে কিন্তু মানুষের মধ্যে এই বোধের আধিক্য দেখা যায়।

দুই

আমরা যদি মানুষের মধ্যকার এই কল্যাণবোধকে একটি শব্দে ধরতে চাই, তাহলে পরোপকার, জনকল্যাণ, লোকহিতৈষণা, জনহিতৈষণা, বদান্যতা ইত্যাদি শব্দ হয়তো আসে। কিন্তু এর কোনোটি-ই পুরো বিষয়কে ধারণ করে না। বাংলায় দর্শনচর্চা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায়, অনেক বিষয় আমাদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও বাংলাভাষায় টার্মোলজিকাল শব্দের মাধ্যমে সেগুলোকে ফিলোসোফাইজড করে দেখা হয়নি। যেমন ফিল্যানথ্রপিক চর্চা আমাদের মধ্যে বহুকাল ধরে হয়ে আসছে কিন্তু এ-নিয়ে কোনো লেখালেখি বাংলাভাষায় হয়নি বললেই চলে। পাশাপাশি গ্রিক এবং পরে ইংরেজি ভাষায় বিষয়টি যেহেতু বহুকাল ধরে ফিলোসোফিকালি ব্যাখ্যাত হয়ে আসছে, সে কারণে 'ফিল্যানথ্রপি' শব্দটি পূর্ণাঙ্গরূপে বিষয়টিকে প্রকাশ করে। সে কারণে চেয়ার, কাপ-পিরিচ, প্লেট, ফুটবল ইত্যাদি শব্দের মতো 'ফিল্যানথ্রপি' শব্দটিকে বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত করা হলে কোনো বাংলাভাষী হয়তো বিরোধ সৃষ্টি করবেন না। বরং বাংলাভাষা আরও একটি শব্দকে গ্রহণ করার উদারতা দেখালে, এভাষা সমৃদ্ধই হবে।

তিন

কিন্তু সবসময় তো 'ইতর' শ্রেণীর কল্যাণ করে থাকে ধনী-শ্রেণী, যে কল্যাণ করতে যাওয়ার প্রাক্কালে অনুমতি নেয়া দরকার। এমন নজির নেই যে, 'ইতর' শ্রেণীর অনুমতির তোয়াক্কা করে ধনী-শ্রেণী তাদের কল্যাণ-কর্ম থামিয়ে রেখেছে। অনুমতি ব্যতিত এই যে কল্যাণ করতে যাওয়া, এটা কতটা শোভন? যদি এমন হয় যে, ধনীরা মনে করেন, অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনই নেই, তাহলে তো আর কথা থাকে না; যদি তাই হয়, তাহলে বিষয়টি এমন দাঁড়ায়, 'আমি তোর কল্যাণ করব তাতে তোর কী?'

'ইতর'শ্রেণী কি ধনীর কল্যাণ কখনো কোনোভাবে করতে পারেন? হয়তো একভাবে পারেন না, হয়তো অন্যভাবে পারেন! কিন্তু সেই কল্যাণকে ধনীরা কি কল্যাণ বলে স্বীকার করেন?... ইতিহাসে দেখা যায়, এসবের উত্তর দিতে 'ইতর'শ্রেণী সবসময়ই অক্ষম আর ধনীরা গিয়েছেন এ-জাতীয় প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে।

চার

ছোটবেলায় নাটক বা অন্য নানা সংগঠন গড়ে তুলতাম; আমরা ধনী-শ্রেণীভুক্ত না হয়েও সেসব সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের ছোটখাট সমস্যা সমাধান করতাম। এ ধরনের ঘটনা হয়তো অনেকেরই জীবনে ঘটেছে। কিন্তু নাটকের সেই দল কিংবা অন্য সংগঠন বা ক্লাব আজ সেভাবে নেই। সেসব প্রসঙ্গ প্রায় রূপকথার মতো শোনায়। অথচ এটি ছিল আমাদের সংস্কৃতির অংশ। সেই সহজ-শাদা হৃদয়ের বোধটি আজ নানাভাবে বাণিজ্যিক রূপ নিয়েছে।

পাঁচ

সমাজসেবা বা চ্যারিটি হিসেবে রেজিস্টার্ড বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মানুষের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন ও সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনোটি এতই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে যে, এরা সরকারেরও অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যা একটি রাষ্ট্রের জনগণের জন্য স্বস্তিকর খবর নয়। এধরনের প্রতিষ্ঠানে নির্বাহীর পদ একই ব্যক্তি দ্বারা সবসময় অলংকৃত থাকে। সোনার হরিণ 'গণতন্ত্র' বা 'জবাবদিহিতা'র কোনো বালাই এখানেও নেই। কাজেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এদের পার্থক্য করা কঠিন। অথচ চ্যারিটি বা সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এরা রাষ্ট্রের অতিরিক্ত সুবিধাদি ভোগ করে। এদের এক ধরনের এন্টি-পলিটিকাল রোলও রয়েছে। যা দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক অঙ্গনের জন্য অশনি সংকেত। এজন্য যে, এদের নিজেদেরও এক বিশেষ সুপ্ত-গুপ্ত রাজনৈতিক মিশন রয়েছে; সেই রোডম্যাপ অনুসারে প্রগতিশীল রাজনীতিকে হত্যা করে নিজেদের মিশন বাস্তবায়নের জন্য এরা মাঠে নেমে পড়েছে।

ছয়

মান্যবর বদরুদ্দীন উমর-এর মত অনুসারে, মানুষের মধ্যে ফিল্যানথ্রপিক শক্তি আছে বলেই তার সর্বোচ্চ সাংগঠনিক রূপ মানবতাবাদী ও শ্রেণীমুক্ত সমাজ তৈরি করা সম্ভব। এবং মান্যবর এম এম আকাশ-এর মত অনুসারে, ফিল্যানথ্রপির মহত্ত্ব তখনই চরিতার্থ হবে যখন এর লক্ষ্য হবে ফিল্যানথ্রপি'র প্রয়োজন বিলুপ্ত করা। 'ফিল্যানথ্রপি' সংখ্যাটি সেই প্রত্যাশা নিয়েই প্রকাশিত হল।

এটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য বিএফএফ ও বিজ্ঞাপনদাতাদের ধন্যবাদ জানাই। জনাব সাফি রহমান খান আমাদের মানসিক উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

শওকত হোসেন
সম্পাদক
০১.০৫.২০০৮

সূচি

‘অবদমন’ সংখ্যার প্রতিক্রিয়া

অতিক্রান্ত পরিধি: একশ পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠার হালখাতা
মুনমুন হোসেন ০৭

হালখাতা: সাহসদীপ্ত উদ্ভাসন
হাসান অরিন্দম ১০

হালখাতা: অতঃপর অবদমন
হেনা সুলতানা ১৪

প্রবন্ধ

ফিল্যানথ্রপি: সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
অনুপম সেন ১৬

ফিল্যানথ্রপি: প্রত্যয় পর্যালোচনা
এম এম আকাশ ২০

সাক্ষাৎকার

ফিল্যানথ্রপি আর এনজিও-র কর্মকাণ্ড এককথা নয়
বদরুদ্দীন উমর ২৭

প্রবন্ধ

জনহিতৈষণা ভাবনা
বদিউর রহমান ৪৯

ফিল্যানথ্রপি: সাহিত্যে ও পুরাণে
শোয়েব শাহরিয়ার ৫৭

ফিল্যানথ্রপির প্রয়োজনীয়তা: বর্তমানের প্রেক্ষাপটে
ফরীদুল আলম ৬৪

আলাপ

ফিল্যানথ্রপি: মোটিভ বিশ্লেষণ
মঈন চৌধুরী – আনু মুহাম্মদ ৭৯

প্রবন্ধ
লোকহিত? কোন লোক? কীভাবে?
জাকির তালুকদার ৯৩
জনহিতৈষী কাজ!
আহমাদ মোস্তফা কামাল ৯৭
ফিল্যানথ্রপি: একটি দার্শনিক সমীক্ষণ
সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার ১০০

সাক্ষাৎকার
ফিল্যানথ্রপি: প্রয়োজন গভীর বিশ্লেষণ অতঃপর গ্রহণ বর্জন
শাহাদুজ্জামান ১০৯

নিবন্ধ
কয়েকজন জনহিতৈষী
জয়নাল আবেদীন ১১৫
ফিল্যানথ্রপি এবং বাস্তবতা
ফেরদৌসী সুলতানা ১২৮

প্রবন্ধ
ফিল্যানথ্রপি: লোকসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রভাবনা
মাসুদুল হক ১৩৫
জাতিসত্তায় ফিল্যানথ্রপি
বিভানূর মুন্সী ১৪৫

অনুবাদ
পাশ্চাত্য ফিল্যানথ্রপির প্রাচীন উৎস বার্জার এ.পিয়ারসন
বার্জার এ. পিয়ারসন/শওকত হোসেন ১৪৮

অতিক্রান্ত পরিধি: একশ পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠার হালখাতা

মুনমুন হোসেন

সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে একটি নতুন বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা 'হালখাতা'; পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বিষয় ছিল 'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব', পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ দ্বিতীয় সংখ্যাটির নির্বাচিত বিষয় হচ্ছে 'অবদমন'। অবদমন-এর মতো একটি চিকিৎসাবিজ্ঞানগত তথা মনোবৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে পত্রিকাতে অত্যন্ত বিশদ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। অবদমন-এর সামাজিক রূপ, রাষ্ট্রীয় রূপ, ব্যক্তিমানুষের সংকট, অর্থনৈতিক রূপ ইত্যাদি বিষয়াদি পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যার লেখাগুলোতে লেখকদের লেখায় উঠে এসেছে।

নীহাররঞ্জন সরকার, অজয় রায়, হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন, সলিমুল্লাহ খান প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি প্রতিশ্রুতিশীল বেশ কিছু প্রতিভাবান লেখকের লেখা সংখ্যাটির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছে।

কোনো কোনো পত্রিকাতে 'সম্পাদকীয়' অংশেই সম্পাদক বেশ বড়সড় করেই তাঁর লেখনী চালাবার অবকাশ পেয়ে থাকেন– ফলে আমাদের দেশে বেশিরভাগ পত্রিকাতেই 'সম্পাদকীয়' শিরোনামযুক্ত অংশটি হয়ে থাকে খুবই ক্লিশে ও গতানুগতিক। কিন্তু 'হালখাতা' পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখাটিও খুব লোভনীয় এবং আকর্ষক– আমি এ ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না–

'প্রচণ্ডভাবে অবদমিত আমাদের সমাজে তো আলোর চেয়ে ছায়ার ছড়াছড়িই বেশি– হতে পারে সূর্য হতে পৃথিবী অনেক দূরে বলে এখানে আলোর তুলনায় ছায়া এতটা বেশি এসে যাচ্ছে;... বলা যায় সেই কারণমতো উপযুক্ত পরিস্থিতির দাবি মেটাতে আমাদের সমাজেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসন্ন। এই সমাজ তখন আর এভাবে অবদমিত থাকবে না, এটা প্রকৃতই আমার ও আমাদের হয়ে উঠবে।'

সম্পাদক মহোদয়ের এহেন আশাবাদের সঙ্গে আমরাও সম্পূর্ণ একমত, প্রত্যাশা করি শীঘ্রই এমন একটা সমাজের দেখা পাব আমরা– যে সমাজে অবদমন থাকবে না, কিংবা থাকলেও বর্তমানের মতো সিন্দাবাদের কাঁধে দৈত্যের বোঝার মতো হয়ে থাকবে না।

সালভেদর দালি-র যে পেইন্টিংটি নিয়ে প্রত্রিকাটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই পেইন্টিংটির বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন মঈনুদ্দীন খালেদ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বক্তব্যশৈলীতে ‘প্রচ্ছদ পরিচিতি’ শিরোনামের লেখাটিতে, ১৯৩৮ সালে আঁকা দালি-র এ ছবিটি প্রচ্ছদে সংযুক্ত করে নির্বাহী সম্পাদক এবং সম্পাদক তাঁদের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন।

নীহাররঞ্জন সরকার-এর ‘অবদমনের অ আ ক খ’ শীর্ষক লেখাটি পুরোপুরি একাডেমিক; অজয় রায়-এর ‘অবদমনের স্বরূপ’ লেখাটিও একইভাবে একাডেমিক কিন্তু চমৎকারভাবে বিশ্লেষণধর্মী। পাঠক এ লেখা দু’টো থেকে বেশ উপকৃত হবেন। সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখা এসেছে মোট চারটি– এর মধ্যে হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন এবং জাকির তালুকদার এই তিনজনের সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখাগুলো অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। জাকির তালুকদার অত্যন্ত সাহসী বক্তব্য দিয়েছেন।

সলিমুল্লাহ্ খান, ফরীদুল আলম ও সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার-এর লেখা তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবদমন বিষয়ে সার্বিক ধারণা পেতে সাধারণ পাঠককে অত্যন্ত সহযোগিতা দেবে এই তিনটি লেখা। নির্মলেন্দু গুণ মূলত স্মৃতিচারণমূলক লেখা লিখেছেন, অপর্ণা হাওলাদার বেশ পরিশ্রমী লেখা লিখেছেন তাঁর ‘বাণিজ্যনীতিতে অবদমন: রাষ্ট্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত’ লেখাটিতে। মিশেল ফুকো-র মূল লেখাটির অনুবাদ করেছেন শওকত হোসেন [ইনি পত্রিকাটির সম্পাদক শওকত হোসেন নন– ভিন্ন ব্যক্তি]। পত্রিকাতে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দেখতে পাচ্ছি যে অনুবাদক শওকত হোসেন অনূদিত ২১ টি অনুবাদগ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও ৭ টি গ্রন্থ প্রকাশিতব্য রয়েছে– যা থেকে আমরা এ রকম ধারণা পেতে পারি যে অনুবাদক হিসেবে শওকত হোসেন সাহেব বেশ সফল কিন্তু আলোচ্য অনুবাদটিতে আমরা অনুবাদকের মুন্সীয়ানার তেমন নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি না। মিশেল ফুকোর মতো বিশ্বমানের একজন বুদ্ধিজীবীর লেখা অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখাটিকে পাঠকের বোধগম্য করে তুলবার জন্য যে ধরনের পাণ্ডিত্য ও রচনাশৈলী থাকা প্রয়োজন ছিল আলোচ্য লেখাটিতে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ‘দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব’ সংখ্যায় শওকত হোসেনের যে অনুবাদ ছিল, সে অনুবাদের ভাষার তুলনায় এ-সংখ্যার অনুবাদটির ভাষা বেশ কিছুটা ঝরঝরে হয়েছে। ভবিষ্যতে এই কুয়াশা হয়তো পুরোটাই কেটে যাবে।

হাসান অরিন্দম-এর লেখাটি অত্যন্ত চমৎকার তবে 'বাংলা সাহিত্যে অবদমন'– এ বিষয়টি এতই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা যথাযথ আলোচনার অবকাশ থাকে না। বিভানূর মুন্সীর লেখাটি ভালো তবে কিছুটা সরল চিন্তার লেখা লিখেছেন, তাঁর লেখায় ভবিষ্যতে আরও গভীরতা আসবে বলে আশা করি। ফেরদৌসী সুলতানা প্রবন্ধ লিখতে গল্পের ছলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলোকপাত করেছেন। তবে কোথাও কোথাও খেই হারিয়ে ফেলে পারম্পর্যহীন কিছুটা এলোমেলো লেখাও লিখেছেন। কিন্তু গল্পের ঢঙে লেখা তার এই লেখাটি ভিন্ন ধরনের রস আস্বাদনে সহযোগিতা করে। তাঁর এবং সালেহা চৌধুরীর লেখায় প্রাবন্ধিকসুলভ নৈর্ব্যক্তিকতার পরিবর্তে পুরুষ-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে যা আমরা একজন প্রাবন্ধিকের কাছে প্রত্যাশা করি না। টোকন ঠাকুরের লেখাটি পাঠ করে আমরা 'ব্ল্যাকআউট' ভিডিও ফিল্ম-টির নির্মাতার ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে জানতে পেলাম।

এ সংখ্যার সবচেয়ে বিস্ফোরক লেখাটি হচ্ছে তুহিন সমদ্দার-এর লেখাটি। তুহিন সমদ্দারকে লেখাটির জন্য প্রাণভরে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এমন অনেককিছু বলার থাকে যা ইচ্ছা থাকলেও আমরা বলতে পারি না– সমাজে বিদ্যমান এসব বিষয়সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে আমাদের অনেক কিছু চিন্তা করে নিয়ে নিজেকে সামলিয়ে নিতে হয়– কিন্তু তুহিন সমদ্দার অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সেগুলো বলে ফেলতে পেরেছেন; বিশেষ করে তাঁর লেখার গ এবং ঙ অংশটির জন্য তাঁকে আবারও ধন্যবাদ। সম্পাদক মহোদয়-এর কাছে দাবি জানাচ্ছি প্রতিটি সংখ্যায় এ ধরনের অন্তত একটি লেখা যেন তাঁর পত্রিকায় স্থান করে নিতে পারে।

'হালখাতা' যেন তার এগিয়ে চলার পথকে ক্রমশ অতিক্রম করে যেতে পারে এই আশা নিয়ে পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় রইলাম। সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক দুজনকেই আশ্বাস দিচ্ছি আমরা আপনাদের সাথে আছি।

মুনমুন হোসেন
এম. বি. এ শিক্ষার্থী
ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা

হালখাতা: সাহসদীপ্ত উদ্ভাসন

হা সা ন অ রি ন্দ ম

বাংলা গদ্যভাষায় সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা উনিশ শতকে। সাময়িকপত্র-সংবাদপত্রকে কর্ষণের ক্ষেত্ররূপে নির্মাণ করে কিংবা লাভ করে একদিকে যেমন গদ্যভাষা অনুশীলনের পথ প্রসারিত হয়, পাশাপাশি নবউদ্বুদ্ধ জাতির আলোকপ্রাপ্ত ও আলোকঅন্বেষী ব্যক্তিবর্গের চেতনার সাথে স্বাক্ষর জনগোষ্ঠী পরিচিত হতে পারে উক্ত মাধ্যমকে অবলম্বন করেই। সে সময় থেকে এদেশের প্রধান লেখকদের অনেকেই পত্রিকা সম্পাদনা কিংবা অন্যভাবে এসকল পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ প্রভাকর, অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্ববোধিনী, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের মাসিক পত্রিকা, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতী, প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র, কাজী নজরুল ইসলামের ধূমকেতু, মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র শিখা প্রভৃতি নাম স্মর্তব্য। সেই স্রোত পরবর্তী পর্যায়ে আরও বেগবান হয়েছে সহজপ্রাপ্য ছাপার উপকরণ, নতুন নতুন চিন্তা ও সাহিত্যভাবনার বিকাশ, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রণোদনার প্রেক্ষাপটে । এসকল পত্রপত্রিকার উদ্দেশ্য, দর্শন, বিষয়ভাবনাও বিচিত্র। বিশেষত বিগত দুই দশকে ছাপার কাজটি অনেক অনায়াসসাধ্য করে দিয়েছে কম্পিউটার। ফলে রাজধানী, শহরনগর এমনকি পাড়াগাঁ থেকেও প্রতিনিয়ত নানা আকৃতি, মেজাজ ও মানের অজস্র পত্রিকা প্রকাশ পাচ্ছে। বলাবাহুল্য এগুলোর অধিকাংশ কাঙ্ক্ষিত মানের নয় এবং বিষয়বস্তু প্রায়ই পরিকল্পনাহীন। প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত কিছু পত্রিকার কথা বাদ দিলে গবেষণাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক পত্রিকার অভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকাগুলো মুখ্যত সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রবন্ধের কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা পূরণের বলির পাঠা হয়ে উঠেছে। বাস্তব এই প্রেক্ষাপটে ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম প্রকাশ পায় 'হালখাতা'।

'বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা'– এই সাবটাইটেলের মধ্যে বাংলাভাষার পত্রিকাসমূহের মধ্যে হালখাতার অনন্যতা লক্ষ্যগোচর হয়। এদেশে এ-জাতীয় পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি। এ ধরনের প্রকাশনার প্রতিটি সংখ্যা একই জাতীয় পাঠককে সমানভাবে আকৃষ্ট করে না। কারণ কোনো ব্যক্তিই জ্ঞান বা চিন্তার সকল দিক সম্পর্কে সমান আগ্রহী নন। সন্দেহ নেই এর সম্পাদক শওকত হোসেন ও নির্বাহী সম্পাদক শরমিন নিশাত এ-ধরনের পত্রিকা প্রকাশ করে সাহস ও পরিণত

ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। তারা গোষ্ঠী-চেতনার উর্ধ্বে থেকেই লেখকগণকে সূচিভুক্ত করছেন বলেও আমার মনে হয়েছে।

আলোচনা কেন্দ্রীভূত করা যাক এ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ 'অবদমন' সংখ্যা নিয়ে। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত সালভাদর দালির পেইন্টিং স্পেন-এর পরিচয় বিধৃত হয়েছে মইনুদ্দীন খালেদের লেখায়। দু পৃষ্ঠার রচনায় পাঠক অনেক মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব পেয়ে যান। এ লেখার প্রতিটি বাক্যই গুরুত্ববহ। নীহাররঞ্জন সরকার অবদমনের অ আ ক খ রচনায় মুখ্যত ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণাকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই সঙ্গে লেখকের নিজস্ব আরও কিছু মতামত হয়তো পাঠকের প্রত্যাশা ছিল। অজয় রায় ফধসঢ়রহম-এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে অবদমনকে শুরুতেই মনোগ্রাহী ব্যতিক্রমী উপমায় উপস্থাপন করেন। মানসিক চাপ ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় লেখকের নিজস্বতা লক্ষণীয়। এখানে শারীরিক-মানসিক-রাজনৈতিক–ইত্যাকার বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবদমনকে ব্যাখ্যা করায় অবদমন শব্দটির অর্থক্ষেত্র কতখানি তা সহজেই বোধগম্য হয়।

খ্যাতনামা ও বড় ব্যক্তিত্বের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা সবসময়ই বেশি থাকে। হাসান আজিজুল হক আলোচনার প্রথম দিকে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে রাজনৈতিক দিকে আলোচনা টেনে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন ফ্রয়েডীয় দর্শন তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। এখানে পাঠক লক্ষ করেন একাধিক বার আলোচনা কেন্দ্রচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় হালখাতা ফ্রয়েডের সুতো দিয়ে আলোচনাকে টেনে কেন্দ্রমুখি করতে চেয়েছে। সেলিনা হোসেনের বক্তব্য সুস্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক। লক্ষণীয় যে তিনিও ফ্রয়েডীয় দর্শনকে 'আজ তেমনভাবে অর্থবহ নয়' বলে মনে করেন । নারী প্রসঙ্গই তাঁর আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে। সেলিনা হোসেনের বেশিরভাগ বক্তব্যই নির্দেশ করে এ-সমাজে নারী কতখানি বঞ্চনা ও নিগ্রহের শিকার। অর্থাৎ এ আলোচনায় Suppression প্রাধান্য পেয়েছে Repression নয়। সলিমুল্লাহ খান শুরুটা ভালোই করেছিলেন। তিনি নিজেই জানেন আলোচনা মাঝামাঝি আসার আগেই তাঁকে শেষ করতে হয়েছে। সলিমুল্লাহ খান যে তড়িঘড়ি করে লেখাটি শেষ করেছেন তা নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ লেখার অংশ হয়তো এ লেখাটিকে বলা যায়; পাঠক লেখককে 'অসীম ক্ষমায়' দেখলেও আরও কিছু অভিব্যক্তি জানবার বাসনাকে কিন্তু তাদের দমন করতে হয়েছে। সলিমুল্লাহ খান ভবিষ্যতে এরূপ অবদমনের হাত থেকে পাঠককে রেহাই দিলে পাঠকও তাকে রেহাই দেবে তাঁর খণ্ডিত লেখা দ্বারা অন্যদের অবদমনে রাখার অভিযোগ থেকে।

ফরীদুল আলমের অবদমন:অবয়ব বিশ্লেষণ প্রবন্ধে মানসিক ব্যাধির কথা বলেছেন এবং এক্ষেত্রে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বের উল্লেখ ও তা বিশ্লেষণ করেছেন। শিল্পসাহিত্যে ফ্রয়েডীয় উদ্ভাবনের প্রভাবও তুলে ধরেন তিনি। সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপনায়। তবে এই প্রবন্ধের তৃতীয় অংশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে লেখক ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করেন আবার

এ তত্ত্বের নিত্যতাও ব্যাখ্যা করেন তিনি। এছাড়া বিচিত্রগামিতার বিষয়টিও তিনি যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। মেহতাব খানম তাঁর সাক্ষাৎকারে মানসিক রোগীর অপরাধ, শিশু-অপরাধী, অপরাধীর প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ বিষয়ে যে বক্তব্য প্রকাশ করেন তা মূল্যবান। 'ফ্রয়েডের সব জিনিস' তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তারপরও তিনি মানুষের বায়োলজিকাল নিডসকে যৌক্তিকভাবেই গ্রাহ্য করেন। তাঁর মতে হাঙ্গারের পরই আসে সেক্স। প্রসঙ্গক্রমে মনোবিজ্ঞানের এই অধ্যাপক উল্লেখ করেন 'মেয়েরা কিন্তু ইমোশনালি অনেক স্ট্রং'– যা বোধকরি সার্বজনীন নয় বলেই বিষয়টি বিতর্কসাপেক্ষ। (পুরুষেরা) তার কাজের জায়গাগুলোতে ইমোশনাল– এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি যে উদাহরণ টেনেছেন– জ্ঞানচর্চা, রাজনীতি, সৃষ্টিশীলতা, আবিষ্কার-উদঘাটন, পরিস্থিতি মোকাবেলা প্রভৃতি বিষয়ক বাস্তব উদাহরণ টেনে এ বক্তব্য নাকচ করা সম্ভব। বিয়ে সম্পর্কে বক্তার অভিমত: 'এটা মানুষের জন্য সম্মানের কথা নয়, যতটা সম্মানের সে হতে পারত লিভ-টুগেদারের মাধ্যমে'। অথচ বিয়ে যেভাবে একটি পরিবারের গঠন, শৃঙ্খলা ও পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কের সূত্রকে সুদৃঢ় করে লিভ-টুগেদার তা পারে না। পশ্চিমা বিশ্বও প্রাচ্যের পরিবারের বন্ধন ও শৃঙ্খলাকে অনেক ক্ষেত্রে অনুকরণীয় মনে করছে– সেখানে পাঠকের জন্য এ ধরনের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর বলে আমি মনে করি।

জাকির তালুকদারের সাক্ষাৎকারে অবদমনের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ ফুটে উঠেছে। আমরা প্রায়ই সংযমকে অবদমনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলি, দমনের শিকার অবদমনে বাধ্য হয়– এই মৌলিক ধারণাগুলো তিনি স্পষ্ট করেন। গণতন্ত্রে অবদমনের বিষয়টি জনাব তালুকদার প্রাসঙ্গিকরূপেই বিশ্লেষণ করেছেন। তবে কোথাও কোথাও বক্তাকে খানিকটা বিক্ষুব্ধ ঠেকেছে। দৈনিক পত্রিকার কাছে মানুষের মুখ্য প্রত্যাশা তো সংবাদ ও সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে। এখানে সংশ্লিষ্ট কলামিস্ট বা লেখকদের 'সাম্প্রতিকতা আর তাৎক্ষণিকতায় আচ্ছন্ন মাতাল' অভিহিত করার মধ্যে একহাত নেওয়ার প্রবণতা ফুটে উঠেছে কিনা সে প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগতে পারে, (যদিও পাঠকের অজানা নয় সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধতা ও প্রবণতা এমনকি, দুরভিসন্ধিও, ধর্মের নবীকরণের কথা না বলে তাকে অপ্রয়োজনীয় বললে তাঁর বক্তব্য স্ববিরোধিতা থেকে রেহাই পেত। বাঙালি মুসলমানদের থিয়োলজি চর্চা মোল্লারা নিয়ন্ত্রণ করছে– তাঁর এই পর্যবেক্ষণটি তাৎপর্যবহ।

নির্মলেন্দু গুণের প্রবন্ধের নাম অবদমনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত। কিন্তু এ রচনায় 'বিভিন্নের' তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা অবদমনের আলোকেই যে এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে সে প্রতীতি পাঠকের মোটেই জন্মে না। প্রথমে কার্ল মার্কস ও রবীন্দ্রনাথের উক্তি এবং লেখকের শেষের বাক্যটি বাদ দিলে অনুমান করাই কষ্ট যে এ লেখার মূল উপজীব্য অবদমন। তবে অবদমন সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে রচনাংশ তিনি তুলে ধরেছেন তা খুবই গভীর চিন্তা উদ্রেককারী। আহমেদ স্বপন মাহমুদের রচনায় রাষ্ট্রীয় পর্যায় ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবদমনকে ব্যাখ্যা

করা হয়েছে। রামতনু ঘোষের রচনাটি ক্ষুদ্র হলেও প্রাঞ্জল ও পূর্ণাঙ্গ । অপর্ণা হাওলাদারের লেখায় আরও কিছু তথ্যের সংযোজন হলে ভালো হত। ফেরদৌসী সুলতানার লেখার মধ্যে গল্পের ও প্রবন্ধের স্বাদ একইসঙ্গে পাওয়া যায়। শওকত হোসেন এ সংখ্যায় ফরাসি চিন্তাবিদ মিশেল ফুকোর রচনা থেকে অনুবাদ করেন। আমাদের দেশে ভাষান্তর-অঙ্গনে যোগ্য ও নিষ্ঠাবানের যে স্বল্পতা তার একাংশ তিনি পূরণ করেন। মূল রচনা সম্পর্কে বক্তব্য এখানে প্রয়োজন মনে করছি না। এ-জাতীয় বিষয়ের প্রাঞ্জল অনুবাদ সহজসাধ্য নয়। অনূদিত এই রচনার কোনো কোনো বাক্য ও শব্দপ্রয়োগ কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট ঠেকেছে। 'সাহিত্যে অবদমন 'বিষয়ে আমার নিজের লেখাটিতে আরও বেশকিছু দিক সংযোজিত হতে পারত বলে কয়েজন পাঠক আমাকে জানিয়েছেন। দৈনিক পত্রিকার বিনোদনের পাতার উপযোগী টোকন ঠাকুরের রচনাটি এ সংখ্যার জন্য অপরিহার্য মনে হয়নি । ভালোমন্দ যা-ই লাগুক তুহিন সমদ্দারের লেখাটিকে অন্তত অগ্রাহ্য করা যায় না। এরূপ ভাষাভঙ্গিমা রপ্ত ও প্রয়োগ করে ছোটকাগজের কতিপয় লেখক কোন শূন্যতা পূর্ণ করতে চান তা বোঝা মুশকিল। খাপছাড়া স্ল্যাং শব্দবহুল গদ্যরচনা কি আদৌ কোনো শক্তির দ্যোতক ? নাকি দুর্বলতা ঢেকে ভিন রাস্তায় মনোযোগ আকর্ষণের কারসাজি?

নির্বাহী সম্পাদক ও সম্পাদকের পরিমিত বক্তব্যে অবদমন-পরিচিতি এবং এই সংখ্যার ফোকাস-ক্ষেত্রের পূর্বাভাষ মেদহীনভাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা বলেই যিনি এ পত্রিকা হাতে নিচ্ছেন তার প্রত্যাশা পরিসীমিত, গভীর এবং সুনির্দিষ্ট; পাঠক চাইবেন নির্বাচিত বিষয়টি সম্পর্কে যারা এক্সপার্ট অন্তত তাদের প্রধান কয়েকজনের লেখা সংশ্লিষ্ট সংখ্যায় অপরিহার্যরূপেই স্থান পাক; প্রয়োজন না হলে একই ব্যক্তি বা লেখককে বারংবার প্রাসঙ্গিক করার চেষ্টা পত্রিকার মানকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। গত সংখ্যায় একাধিক পাঠক তাদের প্রতিক্রিয়ায় হালখাতার আয়ু নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই। তবে 'সিরিয়াসনেস পত্রিকাটির টিকে থাকার ক্ষেত্রে কাল হয়ে উঠতে পারে'– এ বক্তব্যে আমি একমত নই। এর অপমৃত্যু ঘটলে (বালাই ষাট) সেজন্য সিরিয়াসনেসকে দায়ী করা ঠিক হবে না। সিরিয়াস পাঠকেরা এ পর্যন্ত যথেষ্ট সাড়া দিয়ে উক্ত আশঙ্কা অনেকটাই লঘু করে দিয়েছে। হালখাতার দীর্ঘায়ু কামনার সাথে সাথে এই প্রত্যাশাও অগোপন করি– এর কলেবর দু-এক ফরমা স্থূলতর হোক, লেখকসূচিতে আরও বিচিত্রতা আসুক, বজায় রাখুক সিরিয়াসনেস– এমনকি প্রয়োজনে হয়ে উঠুক আরও গম্ভীর, তেজি (এমনকি রাগী) আর ওজস্বী। ওপার বাংলার প্রাসঙ্গিক চিন্তক ও লেখকদের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা গেলে নিশ্চিতরূপেই হালখাতার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব বিস্তৃত ও দূরপ্রসারী হত। উৎকৃষ্ট ছাপা কাগজ ও বাঁধাই হালখাতাকে দৃষ্টিনন্দন করেছে। পত্রিকাটি হোঁচট খেলে তা পাঠককুলের পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে নিঃসন্দেহে।

[লেখক: হাসান অরিন্দম। গল্পকার। প্রভাষক, সরকারী কে.সি কলেজ, ঝিনাইদহ।]

হালখাতা: অতঃপর অবদমন

হে না সু ল তা না

একবার এক কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রশ্ন করা হল– যত জন্মে তার চেয়ে বেশি মারা যায় কী?

বাংলাদেশের শিশু।

প্রশ্নকর্তা উত্তরটি সঠিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের শিশুর জায়গায় যদি বলা হত বাংলাদেশের ছোটকাগজ আশা করি উত্তরটা ভুল হত না।

ছোটকাগজ চর্চা এক ঝুঁকির নাম, নিজেকে নিজের মতো করে প্রকাশ করারও নাম। এই চর্চা মানে অফুরন্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে রাখা। জীবনের সমগ্র সম্ভাবনার অজস্র তাৎপর্যে পরিপূর্ণ থাকার সমূহ সম্ভাবনা এখানে জাগ্রত হয়। তবুও ভয়; জন্মই যেন তার মৃত্যুর জন্যে। অবশ্য এর নানা কারণ রয়েছে। আমার মনে হয় কোনো কাজে যদি পেশাগত মনোভাব না থাকে তাহলে তার স্থায়িত্ব হয় বড় টলমলে। আমাদের ছোটকাগজের চরিত্রে কোনোদিন পেশাগত বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলেই তার পরিণতি কচুপাতায় শিশিরবিন্দুর মতো। একটু ভিন্নভাবে বলা যায় মেয়েরা সোনার গহনা পরে সাজে আবার ইমিটেশনের গহনা পরেও সাজে। ফ্যাশন করে পরা সস্তায় কেনা ইমিটেশনের গহনা দু'চার বার ব্যবহারের পর শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সোনার গহনা অর্থ, ভালোবাসা ও স্বপ্ন দিয়ে তৈরি হয় বলেই তাকে মেয়েরা দীর্ঘকাল প্রাণপণে রক্ষা করতে পারে।

নতুন একটি পত্রিকা দেখলে নবজাতকের মুখ দেখবার মতো আনন্দের পাশাপাশি 'বাঁচবে তো' এ আশঙ্কায় মনটা দমে যেতে যায়। কিন্তু 'হালখাতা' নামের নতুন চরিত্রের পত্রিকাটি দেখে আমি আশাহত হতে পারেনি বরং আশাময়ী হয়ে উঠেছি।

'হালখাতা' বাঙালি সংস্কৃতিতে পয়লা বৈশাখের একটি সর্বজনীন অনুষ্ঠান। আমাদের দেশের সব শ্রেণীর মধ্যে এই অনুষ্ঠানটির এখনও প্রচলন রয়েছে। হালখাতা মানে পুরনো হিসাব চুকিয়ে নতুন হিসাব খোলা। দোকানগুলো ধুয়ে মুছে রঙিন কাগজের ফুল, লতা, পাতায় সাজানো হয়। গ্রামবাংলায় নানা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মিষ্টিমুখ চলে দিনভর। তথ্যপ্রযুক্তির এই আগ্রাসী-যুগে এদেশে কত কিছুরই তো পরিবর্তন হল কিন্তু হালখাতা ঠিকই রয়ে গেছে। আমার জানা হালখাতার সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক এ ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন তাদের শ্রমে ও ঘামে– আমি

চাই এখন থেকে ছোটকাগজ প্রক্রিয়া আর এ্যমেচার নয় প্রফেশন হবে। কেননা ছোটকাগজ একটি দর্শনের নাম, লড়াইয়ের নাম। এই অসাধ্য সাধন করার বয়স ও সাহস দুই-ই তাদের আছে বলে আমি মনে করি।

নববর্ষের প্রাক্কালে হালখাতার অবদমন সংখ্যাটি হাতে নিয়ে এর পেলবতা অনুভব করলাম। প্রচ্ছদের দিকে চেয়ে রইলাম অনেকটা সময় নিয়ে। কারণ শিল্পী দালির ছবিটাতে বেশ কিছু খোঁজাখুঁজির ব্যাপার আছে। যুদ্ধ ও কামনা যে ছবিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে সে ছবি নিজেই পত্রিকার অন্দরমহলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় পাঠককে।

নির্বাহী সম্পাদক ও সম্পাদক পৃথকভাবে 'অবদমন', যা আমাদের হাড়ে মজ্জায় চিবিয়ে খাচ্ছে সর্বস্ব, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন শুরুতেই। তাতে পাঠকের পাঠের আগে এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি হয়ে যায় সহজেই। অসম্ভব ভালো কিছু লেখা এবং সাক্ষাৎকার পড়ে সমৃদ্ধ হলাম সন্দেহ নেই। তবে সাক্ষাৎকার নেয়া হল যাঁদের কেবল তাদেরই পরিচয় পেলাম । অন্যেরা কেন রয়ে গেলেন পরিচয়ের বাইরে, বোঝা গেল না। লেখার শেষে ছোট্ট করে হলেও লেখক পরিচয় দিলে শোভন লাগত। প্রবন্ধগুলোর ভেতর কবি গুণের লেখাটি অন্যান্য লেখার চাইতে ব্যতিক্রম মনে হয়েছে। বোঝা গেল তাঁর গদ্য লেখায়ও বেশ আকর্ষণ আছে। কারো কারো লেখায় অবদমন বিষয়টি চর্বিতচর্বণ হয়ে গেছে। হাসান আজিজুল হক ও সেলিনা হোসেন দুজনেই ফ্রয়েডীয় দর্শনের আলোকে আজকের সমাজকে ব্যাখ্যা করতে রাজি নন। আমার ধারণা এ তাঁদের আধুনিক মানসিকতারই প্রমাণ। বেশ কিছু জায়গায় মতামত প্রকাশে দু'জনের মিলও পেলাম।

প্রবন্ধ-নিবন্ধের পাশাপাশি এক আধখানা কবিতা ও গল্প থাকলে ভালো লাগত যার বিষয় হতে পারত অবদমন। বিষয়ভিত্তিক যখন তখন বিষয়কে প্রবন্ধ-নিবন্ধে সীমাবদ্ধ না রেখে সাহিত্যের অন্যান্য ভাণ্ডারেও হাত বাড়ালে আরও বোধ হয় রসময় হয়ে উঠত পত্রিকাটি। অবদমন থেকে বেরিয়ে আসতে হলে পথ খুঁজতে হবে সৃষ্টিশীলতার মাঝে। অবদমনের কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না।' অজয় রায়ের এই কথাটি আমি নানাভাবে আমার ছাত্রীদের বলি। যে মাধ্যমেই হোক একটা সৃজনশীলতায় নিজেকে জড়াতে পারলে মুক্তির আনন্দ পাওয়া যায়। মুক্তির আনন্দই অবদমনের যন্ত্রণাকে হারাবার হাতিয়ার। বিভানূর মুন্সী ও ফেরদৌসী সুলতানার লেখায় নারীর অন্তর্ব্যথা প্রকাশিত হয়েছে, যা নারীর অবদমিত রূপকেই আমাদের সামনে হাজির করে।

নানাভাবে অবদমিত হতে হতে প্রতিক্ষণে কত আত্মার যে মৃত্যু ঘটছে তার কোনো হিসেব নেই। এ পোড়া দেশে সে হিসেব রাখার প্রশ্নও ওঠে না। এভাবে দিন দিন আমরা মৃত আত্মার জাতিতে পরিণত হচ্ছি। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় বলতে হয় 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রার রাখা হয় আত্মার হয় না।'

[লেখক: হেনা সুলতানা। প্রাবন্ধিক, শিক্ষক, ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।]

প্র ব ন্ধ

ফিল্যানথ্রপি: সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

অ নু প ম সে ন

জনহিতৈষণা বা Philanthropy সভ্য সমাজের প্রায় সমার্থক। সভ্য সমাজ বলতে আমি বোঝাচ্ছি যখন মানুষ কৃষি ও শিল্প-উৎপাদনে উৎপাদন-ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির সেই পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যেখানে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির হাতে বিপুল বিত্তের সঞ্চয় ঘটে। এই অবস্থায় প্রকৃত উৎপাদক বা শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবনযাপনে তেমন কোনো শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। তাদের জীবনমান দিনে-এনে-দিনে-খাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ, এই সভ্য সমাজের পরিচয় হল এটি একটি শ্রেণীসমাজ। আজও আমরা সেই সভ্য সমাজ বা শ্রেণী-সমাজেই বাস করছি। এই শ্রেণীসমাজে অধিকাংশ লোকই গরীব। সামান্য ভাগ্য বিপর্যয়েই এদের জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়ে। জীবনের বহু মৌল চাহিদাই, যেমন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-বিনোদন ইত্যাদি এরা মেটাতে পারে না। এমনকি পুত্র-কন্যা-আত্মীয় পরিজনের চিকিৎসারও জন্য এরা বিত্তবানের কৃপাপ্রার্থী হয়। সহৃদয় বিত্তবানরা যখন এইসব দুঃস্থের কল্যাণে এগিয়ে আসেন, তখন তাঁদের বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত করা হয়। যেমন দানবীর, Philanthropist, সমাজসেবক ইত্যাদি।

দুই

এই উপমহাদেশের ইতিহাস খুব প্রাচীন। উপমহাদেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসে বহু কল্যাণকামী রাজা-মহারাজা ও বাদশা জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁদের বিরাট হৃদয়ের Philanthropist বা জনহিতৈষী রাজন্য হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। সম্রাট অশোক এদের অন্যতম। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে যে-বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য এই উপমহাদেশে গড়ে উঠেছিল তার শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক। ইতিহাস থেকে আমরা জানি, কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতার দৃশ্য তাঁকে যুদ্ধে বীতরাগ করে জনহিতৈষণার পরম অনুরাগী করে তুলেছিল। তাঁর বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রলিপি থেকে আমরা জানতে পারি, সেই সুদূর আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তিনি বহু জনকল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন যার মধ্যে ছিল বিশাল জলাশয় খনন,

বৃক্ষরোপণ, সড়ক নির্মাণ, দুঃস্থদের আবাসন ব্যবস্থা, দীঘি ও সুপরিসর ছায়াবীথি তৈরী, হাসপাতাল নির্মাণ, অভাবের সময় রাজকোষ থেকে শস্য বিতরণ ইত্যাদি। এইসব বড় বড় রাজন্যবর্গছাড়াও সে সময়কার জাতকের গল্পে আমরা দেখতে পাই ধনী শ্রেণীরাও সাধারণ মানুষের কল্যাণে বিপুল বিত্ত ইত্যাদি দান করে গেছেন। এঁদের অনেকে এমনকি দান করতে করতে নিঃস্বও হয়ে গেছেন।

পরের বঞ্চনাকে নিজের করে নিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে বহু বিত্তবান লোকই এভাবে অকাতরে দান করে গেছেন। আমাদের শৈশবে আমরা হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কথা পড়েছি। পড়েছি কিভাবে বিদ্যাসাগর অন্যের দুঃখ মোচনের জন্য, শিক্ষার, বিশেষত নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য কেবলমাত্র নিজের সবকিছু দান করেই ক্ষান্ত হননি, অন্যের কাছে হাত পেতে, ভিক্ষা করে এনেও মানবকল্যাণে ব্রতী হয়েছেন।

বর্তমান যুগের বিত্তবানরা দেশে দেশে জনকল্যাণে অনেক ফাউন্ডেশন, ট্রাস্ট ইত্যাদি গঠন করছেন। ফোর্ড ফাউন্ডেশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন, বিল গেটস ফাউন্ডেশন, কার্নেগী এনডাওমেন্ট প্রভৃতির নাম সারাবিশ্বে পরিচিত। এইসব জনহিতৈষণার উদ্যোগীরা বা Philanthropist-রা যেমন হেনরী ফোর্ড, জন রকফেলার, এনড্রু কার্নেগি প্রমুখ তাঁদের বিত্ত আহরণ করেছেন শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে। যে-বিপুল-বিত্ত তাঁরা অর্জন করেছেন, অনেক সময় তারই একটা অংশ দান করেছেন জনকল্যাণে, জনহিতৈষণায়। এমন অনেক Philanthropist-এর কথা ইতিহাসে লেখা রয়েছে যাঁরা অনেক সময় তাঁদের বিত্ত খুব সুষ্ঠু উপায়ে আহরণ করেননি। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে সেই বিত্তের পুরোটাই দান করে গেছেন মানবকল্যাণে। এনড্রু কার্নেগি এমনই এক ব্যক্তিত্ব। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যে-বিশাল রেলরোড স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে দেশ-বিদেশ, বিশেষত চিন থেকে শ্রমিক এনে তাদের অমানুষিক শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। প্রাচীনকালের Philanthropy'র সঙ্গে একালের Philanthropy'র একটা বড় ধরনের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। প্রাচীন Philanthropy ছিল মুখ্যত এককালীন দান। এইসব দানের বিধিবদ্ধ প্রবাহমানতা ছিল না। এর একটি বড় কারণ ছিল প্রাচীনকালের দানের সুফলকে বহমান রাখার জন্য সুষ্ঠু কোনো ব্যাংকিং বা পুঁজিব্যবস্থা তখন গড়ে ওঠেনি। বর্তমানে দান বা Philanthropy-কে দীর্ঘস্থায়ী ও চলমান সমাজকল্যাণ প্রক্রিয়ায় রূপান্তরে ব্যাংক বা অন্যান্য মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগ একটি বড় ভূমিকা রাখে। কেবলমাত্র বিত্তবান ব্যক্তিরা এককভাবে নয়, অনেক সময় ব্যক্তি ও পেশাজীবীরা একত্রিত হয়ে জনহিতৈষণা বা সমাজকল্যাণে সমষ্টিগত ভূমিকা রাখছে যেমন, লায়ন, রোটারি, এপেক্স ইত্যাদি ক্লাব। দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেকসময় এসব ক্লাবসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্মেলন বা পারস্পরিক বিনিময়ের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসা বা শিল্প-উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়া যায়– গৌণ বা পার্শ্বউদ্দেশ্য হল দেশহিতৈষণা বা জনকল্যাণ।

বলাবাহুল্য, উন্নত দেশগুলোতে জনহিতৈষণা বা Philanthropy এখন বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে গত কয়েক দশকে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা বা N.G.Oদের ভূমিকাও অনুল্লেখ্য নয়। কিছুদিন আগে বিশ্বব্যাংকের এক প্রকাশনায় বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে N.G.Oদের বড় ভূমিকা নিতে হবে। অধুনা Microcredit বা ক্ষুদ্রঋণকেই দারিদ্র্য বিমোচনের একটি বড় মাধ্যম হিসেবে দেখা হচ্ছে। মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচীর এক বড় গবেষণাগার আমাদের বাংলাদেশ। দীর্ঘ প্রায় আড়াই দশক এদেশে মাইক্রোক্রেডিট ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও এর মাধ্যমে দারিদ্র্য-বিমোচন বা সংকোচনের সুস্পষ্ট কোনো ফল আমরা দেখতে পাইনি। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যা এবং ২০০৮ সালের সিডরের আঘাত ও বিপুল মুদ্রাস্ফীতির কালে মাইক্রোক্রেডিটের প্রায় কোনো ভূমিকাই ছিল না। সামাজিক অর্থনীতির হিসেবে ২০০৮ সালের প্রথমার্ধে যে Stagflation মন্দা- মূল্য উল্লম্ফন ঘটেছে তাতে আরো প্রায় ৩০ শতাংশ জনসংখ্যা দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। অর্থাৎ একজন মানুষের জীবনপ্রবাহকে সচল রাখতে ন্যূনতম যে পরিমাণ ক্যালোরি প্রয়োজন, তাও তারা পাচ্ছে না। কিন্তু মাইক্রোক্রেডিটের পুঁজির ভাণ্ডার স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছে।

আমার উপরের বক্তব্য থেকে মনে হতে পারে আমি হয়তো জনহিতৈষণার বিপক্ষে। বস্তুত আমি মনে করি প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজে ধনী সামন্ত ও বিত্তবানরা মানুষের কল্যাণে যে বিত্ত বিনিয়োগ করেছেন তা তাঁদের হৃদয়ের ঔদার্যের পরিচায়ক। ব্রিটিশ আমলে এখানেও অনেক জমিদার দীঘি, জলাশয় ইত্যাদি খনন করেছেন। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। এসব কাজ প্রশংসনীয় কিন্তু যা মনে রাখা প্রয়োজন, এইসব জনকল্যাণ একটি প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ, যে-সমাজব্যবস্থা দারিদ্র্যকে পোষণ ও উৎপাদককে শোষণ করে। উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জনহিতৈষণার ক্ষেত্রে এরচেয়ে উন্নততর ও অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও পুঁজিবাদী দেশসমূহ দারিদ্রের চরমতম প্রকাশকে ঠেকিয়ে রাখতে, অর্থনৈতিক মন্দাকে প্রতিহত করতে, উনিশশ তিরিশের মহামন্দার পর থেকে Unemployment insurance, social security, old age pension ইত্যাদি চালু করেছে।

তিন

দেশহিতৈষণা, জনহিতৈষণা বা Philanthropy বর্তমানে কেবলমাত্র দেশভিত্তিক নয়। জাতিসংঘের মাধ্যমে এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রূপও আমাদের কাছে পরিস্ফুট। UNESCO, FAO, WHO ইত্যাদি সংস্থা জনহিতৈষণাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই মুখ্যত ধনাঢ্য পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল। প্রায় সাড়ে ছয়শো কোটি লোক অধ্যুষিত আজকের বিশ্ব। এর মধ্যে ১৫০ কোটি বাস করে উন্নত বিশ্বে। তারাই ভোগ করে বিশ্বের ৮০ শতাংশ গাড়ি, প্রায় ৭৫ শতাংশ উন্নত খাদ্য যেমন মাংস ইত্যাদি। তাদের ভোগেই ব্যয় হয় ৭৫% জ্বালানী অর্থাৎ তারাই

বিশ্বের ৭০ শতাংশ উন্নত প্রযুক্তির ভোক্তা। বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশ যেমন চিন, ভারত, ব্রাজিল ইত্যাদির একটি উঠতি-মধ্যবিত্ত-শ্রেণী উন্নত প্রযুক্তির ভোক্তা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু এসব দেশেরও অধিকাংশ এবং তথাকথিত উন্নয়নশীল বিশ্বের ৯০% মানুষ চরম দরিদ্র। বিশ্বের প্রায় ৪৫০ কোটি লোকের দৈনিক আয় দু'ডলারের কম, যা World Development Report অনুযায়ী দারিদ্র্যের মাপকাঠি। আগেই বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে খাদ্যসামগ্রীর হঠাৎ মুদ্রাস্ফীতির কারণে বাংলাদেশের প্রায় ৩০% জনগোষ্ঠী নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। অর্থাৎ বর্তমানে দেশের ৭০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে কালাতিপাত করছে। বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি নতুন করে দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলোকে দেয়ার জন্য জর্জ ডব্লিউ বুশ উন্নত দেশগুলো থেকে এডিবি'র জন্য এক বিলিয়ন ডলার আহরণ করেছেন। উল্লিখিত সংখ্যাটি কি হাস্যকরভাবে নগণ্য নয়? বিশ্বের বহুজাতিক সংস্থাগুলোর অনেকগুলোর দৈনিক আয় কয়েক বিলিয়ন ডলার। ফরচুন (Fortune) ৫০০-এর মতে এধরনের করপোরেশনের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। এক হিসেব মতে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী-সত্তা ১০০ টির মধ্যে ৫১-টি বহুজাতিক সংস্থা, বাকী ৪৯ টি হল বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ। অর্থাৎ পৃথিবীর দু'শো দেশের মধ্যে সোয়া একশো দেশের জাতীয় আয় ৫১টি বহুজাতিক সংস্থা থেকে কম। এরচে পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ ব্যাপার আর কি হতে পারে? অর্থাৎ বহুজাতিক সংস্থা ও তাদের পণ্যই বর্তমান বিশ্ব শাসন করছে। এই বিশ্ব পণ্যের বিশ্ব; যেখানে দরিদ্র জনতা কেবল পণ্যের বাহক ও স্রষ্টা, কিন্তু সেই পণ্যের ভোগে তাদের কোনো অধিকারই নেই। বহুজাতিক সংস্থাগুলো তাদের প্রতিভূ হিসেবে জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো জনহিতৈষণার বহু প্রকল্প খুলেছে, ভিক্ষার দানসত্র খুলেছে। আমাদের দেশে এই জনহিতৈষণার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা এমন এক বিশ্বব্যবস্থা চাই যেখানে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তির সব মৌলিক চাহিদার ভার নেবে, তাকে সৃজনশীল কাজের সুযোগ দেবে আর সেই কাজের মাধ্যমে সে বিরাট প্রবৃদ্ধি ঘটাবে অর্থনীতির, সেটাই তাকে জীবনের সন্ধান দেবে। আমাদের প্রজন্ম ও তার পরবর্তী প্রজন্মকে এমন এক বিশ্ব সৃষ্টির জন্যই সচেষ্ট ও সক্রিয় হতে হবে যেখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তির দান বা জনহিতৈষণার প্রয়োজন থাকবে না। যতদিন পর্যন্ত সে সমাজব্যবস্থা আমরা না পাচ্ছি, ততদিন পর্যন্ত ফিল্যানথ্রপি বা জনহিতৈষণার প্রয়োজন ফুরোবে না ।

ফিল্যানথ্রপি: প্রত্যয় পর্যালোচনা

এ ম. এ ম. আ কা শ

'ফিল্যানথ্রপি' বা বদান্যতার মহত্ত্ব তখনই চরিতার্থ হয় যখন বদান্যতার লক্ষ্য হয় বদান্যতার প্রয়োজন বিলুপ্ত করা।

দুই

ফিল্যানথ্রপির তিনটি রূপ

'বদান্যতা' বা 'ফিল্যানথ্রপি' একটি সমাজনির্ভর প্রত্যয়। সমাজভেদে তার রূপও ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। বিমূর্তভাবে 'ফিল্যানথ্রপি' বা 'বদান্যতার' সংজ্ঞা বিচারের আগে তার রূপভেদগুলোর সঙ্গে পরিচয় হওয়া উচিত। তাই শুরুতে আমি তিন ধরনের 'বদান্যতার' দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে চাই।

ধরুন একটি আদিম শিকারী গোত্র একটি হিংস্র প্রাণী শিকারের অভিযানে বের হয়েছে। তাদের মধ্যে ধনী-গরীব ভেদাভেদ নেই। শিকারের সময় সবাই সবাইকে সহযোগিতা না করলে কেউই বাঁচবে না– এমনই হচ্ছে উৎপাদন শক্তির বিকাশের স্তর। এ ক্ষেত্রে এর পরেও কোনো সবল লোক যদি একজন দুর্বল লোককে তার লব্ধ শিকারের অংশবিশেষ খেতে দেয় তাহলে এটাকে 'বদান্যতা' বলা যেতে পারে আবার এটাকে সামাজিক স্বাভাবিক কৃষ্টিও বলা যেতে পারে।

ধরুন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ তৈরি হয়ে গেছে। একজন ধনী ব্যক্তি আরেকজন গরীব মানুষকে কিছু দান করলেন। এটা যতই প্রচ্ছন্ন বা গোপন থাকুক্ না কেন–এর মধ্যে অবশ্যই কোনো-না-কোনো রূপে দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের অসমতাটি প্রচ্ছন্ন উপাদান হিসাবে বিরাজ করবেই করবে। এটাকে 'ফিল্যানথ্রপি' বলা যায় কিনা সেই প্রশ্নটিই আমি এই প্রবন্ধে উঠিয়েছি।

তবে অসম সম্পর্কের মধ্যেও এমন একটি বদান্যতা সম্ভব যা এই অসমতার কাঠামোটি ভাঙতে চায় বা এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে চায় যখন এধরনের 'বদান্যতার' বিষয়টি পুনরায় একটি স্বাভাবিক কৃষ্টিতে পরিণত হবে অথবা যখন 'বদান্যতার' প্রয়োজনই আর থাকবে না।

এখানে কৃষ্টি বলতে বোঝাচ্ছি Culture বা Norm; এ ক্ষেত্রে কৃষ্টিটি হচ্ছে 'সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করব, প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করব'। আপাতঃ দৃষ্টিতে এ ব্যাপারটি অসম সমাজে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে– কিন্তু আসলে এ ধরনের

আত্ম-বিধ্বংসী বদান্যতা দুর্লভ হলেও অসম্ভব নয়– এটাই এই প্রবন্ধের দাবি। হযরত (দ:) প্রসঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বহু আগে থেকেই এ ধরনের বদান্যতার একটি দৃষ্টান্তের বিবরণ চালু আছে। কথিত আছে যে হযরতের কাছে এক দরিদ্র লোক ভিক্ষা চাইতে এসেছিলেন। তিনি তাকে ভিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে একটি 'কুঠার' উপহার দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এই 'ভিক্ষাই' আমার শেষ 'ভিক্ষা'। এর পর তোমার আর 'ভিক্ষার' প্রয়োজন হবে না। তবে হযরত (দ:)-এর নিজের এই বদান্যতা আর 'যাকাতের' বিধানটি কিন্তু একরকম ব্যাপার নয়।

তিন

সংজ্ঞার সমস্যা

ইংরেজী 'ফিল্যানথ্রপি'র বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে 'জনহিতৈষণা'। ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিকশনারিতে এর আরো বিভিন্ন সমার্থক বাংলা শব্দ খুঁজে পেলাম, যেমন: 'লোকহিতৈষণা', 'বদান্যতা' প্রভৃতি। ফিল্যানথ্রপির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি বলা হয় 'কোনো কিছু পাওয়ার আশা ছাড়াই মানুষের কল্যাণে যা কিছু করা হয় তা-ই ফিল্যানথ্রপি'। তাহলে দেখা যায়, এই সংজ্ঞা নিয়ে কূটকচাল অনেক করা যেতে পারে। যেমন কেউ বলতে পারে বাইরে প্রকাশিত উদ্দেশ্য জনকল্যাণ হলেও ভেতরে গোপন উদ্দেশ্য বা কোনো-না-কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকবে। যেমন: খ্যাতি, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, স্বর্গ লাভের বাসনা, রাজনীতি ইত্যাদি। অবশ্য ব্যক্তির জন্য 'জনকল্যাণই' হতে পারে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য (End in itself)–এই অর্থেই 'ফিল্যানথ্রপি'কে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যক্তিগত আনন্দ ও সমষ্টিগত কল্যাণকে পরস্পর থেকে পৃথক করা খুবই কঠিন হয়ে যাবে। আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় মনে হয় 'ফিল্যানথ্রপি' কখনোই নিখাদ 'বদান্যতা'র সমার্থক হওয়া উচিত নয়। কারণ তাতে গ্রহীতাকে শুধুই একটি করুণার পাত্র বা 'অবজেক্ট' হিসেবে দেখা হয়, সেবামূলক কাজ 'সাবজেক্ট' বা 'কর্তা' হিসেবে নয়। কিন্তু 'গ্রহীতা' এবং 'দাতা' উভয়ের সম্মান রক্ষা করে যদি 'ফিল্যানথ্রপি' পরিচালনা করতে হয় তাহলে এই ক্রিয়াকাণ্ডে সেবক এবং সেবাগ্রহীতা উভয়কে একই সঙ্গে সেবক ও সেবাগ্রহীতা উভয় ভূমিকার অধিকারী হতে হবে।

প্রথমে এই আলোকিত বোধ সঞ্চারিত হতে হবে মানসিকভাবে। পরবর্তী সময়ে তা হতে হবে বাস্তব-প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরুন কোনো ফিল্যানথ্রপিক ডাক্তার ঠিক করলেন যে তিনি কোনো বস্তিতে সপ্তাহে দুদিন বিনামূল্যে প্র্যাকটিস করবেন। এখন তিনি যদি ভাবেন যে তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিছক একটি 'পরোপকার ব্রত' এবং দয়াবোধ থেকে তা আসছে, অথবা ধর্মীয় নির্দেশ বা স্বর্গের লোভে যদি তিনি কাজটি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে এটাকে ঠিক ফিল্যানথ্রপি বলা উচিত হবে না। বড়জোড় এটি একটি দয়ালু মানুষের দান বলে অভিহিত হতে পারে। কিন্তু তিনি যদি এই একই কাজ একটি অংশগ্রহণমূলক

মানসিকতা নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে করেন এবং তাঁর পরিকল্পনার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, এমন একদিন আসবে যেদিন বস্তিবাসী নিজেরাই নিজেদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার দায়িত্ব নিজেদের 'কমিউনিটি'র কাঁধে তুলে নিতে সক্ষম হবেন এবং তিনি নিজেকে অপসারণ (Withdraw) করলেও ঐ ধরনের সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হবে না, বরং টেকসইভাবে চলতে থাকবে এবং এই ভাবেই তিনি পরিপূর্ণ সফল করে তোলার উদ্যোগ নেন তাহলেই শুধু তার ঐ ছোট কাজটিকেও আমরা একটি প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিক কাজের সূচনা হিসেবে গণ্য করতে পারব।

চার

জরিপ অনুসন্ধানের উদ্যোগ

ফিল্যানথ্রপিক কাজের তালিকা তৈরি করাটা মোটেও সহজ কাজ নয়। অনুসন্ধানকর্মে প্রথম ও প্রধান সমস্যা থাকে তথ্যের অপ্রতুলতা। তাছাড়া এ ক্ষেত্রটিতে এর আগে তেমন একটা কাজ হয়নি। শুধু যে কাজ হয়নি তা নয়, সমগ্র কাজটির যারা লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ ফিল্যানথ্রপিক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি তাদের অনেকের মধ্যেই তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আছে খুবই অনীহা। এই অনীহা আবার দুধরনের। একটি হচ্ছে 'মহৎ অনীহা', যেমন: খুলনার একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে যে তিনজন ডাক্তার নিয়মিত অর্থ ও ওষুধ দিয়ে সাহায্য করেন তারা তাঁদের নাম গোপন রাখেন। এটি একটি মহৎ উদাহরণ। আবার এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা তথ্য দিতে অস্বীকার করেন এই ভেবে যে, এতে অনেক অপ্রিয় জিনিস হয়তো প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে। এই বিষয়ে যত গবেষণাই হোক না কেন সবাইকে এই সমস্যাটির মোকাবেলা বারে বারেই করতে হতে পারে।

জরিপলব্ধ তথ্য

আমার মনে হয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো অপেক্ষাকৃত পরস্পর তুলনীয়, যেমন: যেগুলো শুধুমাত্র 'শিক্ষা'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বা শুধুমাত্র 'স্বাস্থ্য-সেবাকে' কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বা যেগুলো বর্তমানে 'বৃহৎ জাতীয়ভিত্তিক' কার্যক্রম চালাচ্ছে সে সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রে কতকগুলো গুচ্ছে (Cluster Group) বিভক্ত করে অন্ততঃ তিনটি বিশেষ মানদণ্ডের নিরিখে পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি তিনটি বিশেষ মানদণ্ড ব্যবহারের প্রস্তাব করতে চাচ্ছি। সেগুলো হচ্ছে আর্থিক স্বনির্ভরতার মাত্রা, যে লোকদের মধ্যে কাজ চলছে তাদের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণের মাত্রা এবং প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাত্রা। এই তিনটি মানদণ্ড ছাড়াও আরো অন্যান্য নানা ধরনের মানদণ্ড ব্যবহার করে এই মূল্যায়নের কাজটি শুরু করা সম্ভব। তবে এই তিনটি মানদণ্ডের বিশেষ উপযোগিতা হচ্ছে, এগুলো অন্ততঃ নকল ফিল্যানথ্রপিকে আসল ফিল্যানথ্রপি থেকে ছেঁকে আলাদা করতে পারবে।

আরো দুটো উল্লেখযোগ্য সত্য হল: প্রথমত এ থেকে আমরা জানতে পারব যে, বর্তমানে ফিল্যানথ্রপিক এ সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রধান প্রতিযোগিতা চলছে 'এনজিও' সংগঠনগুলোর। জরিপে আরো জানা গেছে যে, এই প্রতিযোগিতায় জনগণের মতামতটি ফিল্যানথ্রপিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে এনজিওগুলোর তুলনায় অধিকতর অনুকূল। যেহেতু এনজিওগুলোর ব্যাপারটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী দাতাগোষ্ঠী নির্ভর এবং তাদের কর্মীরাও স্বেচ্ছাসেবক নন। পক্ষান্তরে ফিল্যানথ্রপিক সংস্থাগুলোর আর্থিক শেকড় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের ভেতরে প্রোথিত এবং কর্মীরাও কমবেশি বেতনবিহীন স্বেচ্ছাসেবক। অবশ্য সেই কারণেই হয়তো এগুলোর বহিরাবরণ তত অনুজ্জ্বল, চাকচিক্যহীন এবং প্রাচুর্যশালী নয়। বৃহৎ এনজিওগুলোর মতো বিশাল সাম্রাজ্য ও শক্তিও তারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি।

তবে 'এনজিও' কি 'ফিল্যানথ্রপি'? উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই জনমনে রয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবের আশঙ্কা। দ্বিতীয়ত, আরেকটি যে সত্য বের হয়ে আসে, তা হচ্ছে কর্পোরেট সেক্টরও বর্তমানে এ ধরনের কিছু কিছু তথাকথিত ফিল্যানথ্রপিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে। এদের মধ্যে মিডিয়া, ব্যাংক, বহুজাতিক কর্পোরেশনও রয়েছে। তবে এদের কার্যক্রম প্রায় সবটাই নিজস্ব স্বার্থভিত্তিক এককালীন নিজস্ব বাণিজ্যিক প্রোগ্রাম বা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এগুলো অনেকটাই হয় বিজ্ঞাপনধর্মী। তাই এসব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কেও জনমনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। যদিও এগুলো থেকেও জনগণ কিছু কিছু ব্যাপারে উপকৃত হচ্ছেন। আবার ফিল্যানথ্রপির এমন উদাহরণও আছে, যা নিয়ে যে কোনো জাতি গর্ববোধ করতে পারে। জাতির গর্ববোধ করার জন্য একজন 'পলান সরকারই' কি যথেষ্ট নয়? আমি এ ধরনের আরো একটি উদাহরণের উদ্ধৃতি তুলে ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না–

সাহিত্যিক রমা চৌধুরী ও এক অনাথ আশ্রমের কাহিনী

কাঁধে একটা ঝোলা আর মাথায় ছাতা নিয়ে নগ্ন পায়ে হেঁটে-বেড়ানো চট্টগ্রামের রমা চৌধুরীর কাহিনী এখন সর্বজনবিদিত । গত ত্রিশ বছর ধরে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে নিজের লেখা বই বিক্রি করে চলছেন ছেষট্টি বছরের এই বৃদ্ধা। নিজের মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলে এবং আশ্রিত এক এতিম ছেলেসহ মোট তিনজনের সংসার চলে তার বই বিক্রি করা টাকায়। যেদিন বিক্রি হয় সেদিন চুলোয় হাঁড়ি চড়ে। আর যেদিন কেউ বই কেনে না সেদিন অভুক্ত রাত কাটান তারা। এভাবে প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যতার সঙ্গে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ রমা চৌধুরী। তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত নন তিনি। এখনও আকাশের মতো অসীম তাঁর মানসিক শক্তি। জনকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার বাসনা তাঁর দীর্ঘদিনের। তাই স্বল্প আয়ের টাকা দিয়েই তিনি তাঁর পৈতৃক বাড়ি বোয়ালখালীর পোপাদিয়ায় গড়ে তুলেছেন অনাথ আশ্রম–'দীপঙ্কর স্মৃতি অনাথালয়'। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন রমা চৌধুরী। সংঘাতময় জীবনে তাঁর বিয়ে হয়েছিল দু'বার। কিন্তু

কোনোবারই সংসার করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত দু'ঘরের চার পুত্রসন্তানকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য এখানেও তাঁকে দাঁড় করিয়েছে নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকসেনারা বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে তার দুই শিশুসন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সন্তানদের চোখের সামনেই তাঁর উপর চালায় শারীরিক নির্যাতন। সন্তান আর সম্ভ্রম হারানোর বেদনা আর শোক ভুলে থাকার জন্য একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে মনকে শক্ত করেন তিনি। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পেশা হিসাবে বেছে নেন শিক্ষকতা। এরপর কিছু টাকা-পয়সা জমা হলে চাকরি ছেড়ে তিনি তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজে নেমে পড়েন। ১৯৯৪ সালে গড়ে তোলেন 'দয়ার কুটির' নামে এক অনাথ আশ্রম। এরমধ্যে তাঁর জীবনে নেমে আসে আরেক বিপর্যয়। ১৯৯৮ সালে তাঁর ছেলে দীপঙ্কর টুনু সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। তৃতীয় সন্তান হারানোর শোককেও তিনি শক্তিতে পরিণত করেন। বেড়া দিয়ে গড়ে তোলা আগের আশ্রম ভেঙে ২০০০ সালে টিনশেডের নয়টি ঘর নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'দীপঙ্কর স্মৃতি অনাথালয়'। নিয়ম করেন তাঁর আশ্রমে জাত-ধর্মের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না এবং মৃত্যুর পর কাউকে পোড়ানো যাবে না। কিন্তু ধর্মান্ধ সমাজ তাঁর এই উদার অসাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে মেনে নেয়নি। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রবল বাধায় এখন পর্যন্ত আশ্রমে কোনো অনাথ ছেলে-মেয়েকে ঠাঁই দিতে পারেননি তিনি। তারপরও দমে যাননি রমা চৌধুরী। রাস্তায়-রাস্তায় বই বিক্রি করেন আর সবাইকে বলেন, 'আপনাদের কাছে কোনো এতিম ছেলে-মেয়ে আছে? আমাকে দেন, আমি তাদের মানুষ করব।' বৃদ্ধা রমা চৌধুরীর বিশ্বাস, তাঁর মৃত্যুর আগেই কোনো একদিন অনাথ শিশু-কিশোরে ভরে উঠবে তাঁর স্বপ্নের আশ্রম।

এ-রকম স্বপ্নভরা সাদা মনের মানুষ যে জাতির মধ্যে থাকে, সে জাতি নিশ্চয়ই একদিন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। আমরা সেদিনের প্রত্যাশায় রইলাম।

পাঁচ

উপসংহারের পরিবর্তে

প্রশ্ন উঠতে পারে 'পলান সরকার' বা 'রমা চৌধুরী' সম্পর্কে আমার উল্লিখিত উক্তি ও প্রত্যাশা কি অতিশয়োক্তি নয়? তাঁদের কর্মপরিধি ছোট, আর্থিক সঙ্গতি সামান্য এবং ফলাফল অত্যন্ত সংকুচিত নয় কি?

এ কথা সত্য যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব দেশেই বিরাট বিরাট ধনী 'ফিল্যানথ্রপিস্ট' রয়েছেন যাদের কাজের পরিধি ও ফলাফল অনেক বড়। কিন্তু তাদের প্রকৃতি আমার মতে অনেকটাই 'রবিন-হুডের' মতো। বরং একার্থে তারা রবিন-হুডের চেয়েও খারাপ। তারা ধনীকে নয় বরং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চুরি করেই অর্থ-সঞ্চয় করেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তার থেকে কিছু অংশ দান-খয়রাত করেন। বর্তমানে বহু-জাতির শোষক বহুজাতিক কর্পোরেশনের মালিকরাও

পৃথিবীতে নানা 'ফাউন্ডেশন' তৈরি করে পৃথিবীতে একই কায়দায় অর্থ বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। রকেফলার ফাউন্ডেশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, বিল গেটস্ ফাউন্ডেশন, ইত্যাদি কয়েকটি তথাকথিত ফিল্যানথ্রপিস্ট ফাউন্ডেশনের নাম এখন পৃথিবীতে সুপরিচিত। পাঠক নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে আমি বাংলাদেশে 'ফিল্যানথ্রপির' যে দুটি মহৎ দৃষ্টান্ত পূর্বে উল্লেখ করেছি: 'পলান সরকার' ও 'রমা চৌধুরী' তাঁরা দুজনের কেউই এরকম ধনী কোনো লোক নন্। এদের তুলনায় তাঁদের ধনসম্পদের পরিমাণ নস্যি মাত্র! তাঁদের 'বদান্যতার' জন্য তাঁদের নিজেদেরই যথেষ্ট দুঃখ কষ্ট ও আত্মত্যাগ বরণ করতে হয়েছে। তাঁদের 'বদান্যতার' পেছনে কোনো বিশেষ ব্যক্তিগত খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠার স্বার্থও কাজ করেনি, কাজ করেছে কঠোর পরিশ্রম এবং নিছক সাধারণ মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ মঙ্গলপ্রেরণা। তাই এই প্রবন্ধে আমি তাঁদের শুধু জাতির গৌরবময় বীর সন্তান হিসাবে তুলে ধরতে চাচ্ছি তাই নয়, আমি তাঁদের পরিমাণে সামান্য কিন্তু গুণে অসামান্য কাজকে 'বিল গেট্স' বা 'ফোর্ডের' পরিমাণে অসামান্য (নাকি নেতিবাচক?) দানের চেয়ে ঊর্ধ্বে স্থান দিতে চাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এ দেশে যারা পরের বা বিদেশী ঋণের ওপর ভিত্তি করে এন.জি.ও. বা নানা সমাজসেবামূলক কাজ করছেন তাদের কাজের বাস্তব ফলাফলকে আমি খাটো করে দেখতে চাই না, অবশ্য এদের মধ্যে যারা উচ্চ সুদে মাইক্রো-ক্রেডিট করছেন তাদের কথা আলাদা। তদুপরি আমি বিদেশী টাকায় সমাজসেবার যে বিপদ ও সীমাবদ্ধতা আছে সেটাই শুধু আরেকবার এসব 'ভালো কাজের' উদ্যোক্তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এই সীমাবদ্ধতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দাতা দেশগুলোর বিদেশীরাই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি আমার হাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কালো মহিলাদের মাঝে সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত একটি এন.জি.ও. সেবা প্রতিষ্ঠান 'Incite! Women of Colour Against Violence'-এর পক্ষ থেকে সম্পাদিত একটি গ্রন্থ 'The Revolution Will not be Funded: Beyond The Non-profit Industrial Complex' এসে পৌঁছিয়ে। বইটি এদেশের দাতাভিত্তিক এন.জি.ও আন্দোলনের জন্য একটি অবশ্য-পাঠ্য বই হতে পারে। বইটির প্রকাশক Read-Write-Revolt, মুদ্রক সাউথ এন্ড প্রেস, ক্যামব্রিজ ২০০৭। এই গ্রন্থের ভূমিকাটির শিক্ষণীয় শিরোনাম হচ্ছে 'Introduction: The Revolution Will not be funded.' ভূমিকার লেখিকা Andrea Smith ভূমিকায় তাঁর সংগঠন 'Incite'-এর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে তাঁদের Incite সংগঠনটি যখন ২০০০ সালে আমেরিকায় কালো মহিলাদের মধ্যে কাজ শুরু করেছিল তখন সংগঠনটির অর্থের উৎস ছিল মূলত ব্যক্তিগত গণচাঁদা। 'Incite' সংগঠনটির মূল কাজ ছিল কালো মহিলাদের ওপর আমেরিকায় যে সব পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস বা নিপীড়ন চালানো হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রতিকারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলা। সংগঠনটির কাজ চমৎকারভাবে এগোতে থাকে এবং নানা ধরনের ধনিক গোষ্ঠির ফাউন্ডেশন সংগঠনটিকে 'ফান্ড' যোগান দিতে শুরু করেন। এসব অর্থ গ্রহণ করলেও এগুলো যাতে

নিঃশর্ত হয়, সন্দেহজনক মতলবপ্রসূত না হয় এ ব্যাপারে Incite-এর নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই সজাগ ছিলেন। তারপরেও শেষ পর্যন্ত তাদের করুণ অভিজ্ঞতা কী হল সেটা আসুন তাদের নিজেদের মুখেই শোনা যাক। Andreas লিখেছেন:

"... ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে আমাদের সংগঠন Incite ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে একটি ই-মেইল পেল। ঐ চিঠির বিষয়বস্তুর জায়গায় লেখা ছিল 'অভিনন্দন' আর চিঠির ভেতরে বলা হয়েছিল যে ফোর্ড ফাউন্ডেশন 'ইনসাইটকে' এক বছর বা দুই বছর মেয়াদী ১,০০,০০০ ডলারের একটি অনুদান দিতে আগ্রহী সুতরাং ইনসাইট যেন তার কার্য-পরিকল্পনা পেশ করে। এই চিঠি পেয়ে Andreas লিখেছেন, 'আমরা খুবই উৎসাহিত হই এবং তখনই দুটি বৃহৎ কাজ-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করি। একটি প্রকল্প হচ্ছে 'Sisterfire Multimedia Tour' এবং অপরটি হচ্ছে 'নিউ অরলিয়ান্সে কালো মহিলাদের একটি সম্মেলনের' প্রকল্প। কিন্তু কিছুদিন কাজ চলার পর ৩০ জুলাই ২০০৪ তারিখে আকস্মিকভাবে ফোর্ড ফাউন্ডেশন আমাদের আরেকটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় যে অনুদানের সিদ্ধান্তটি বাতিল করা হয়েছে কারণ Incite-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কর্তাব্যক্তিদের একজন দেখতে পেয়েছেন যে Incite সংগঠনটি প্যালেস্টাইনীদের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করে"।

এই দৃষ্টান্তটি বৃহৎ অংকের অর্থের ক্ষুদ্রত্বকেই উন্মোচিত করে। এই ঘটনার পর ইনসাইটের নেতৃবৃন্দ অবশ্য ফোর্ডের টাকা ছাড়াই এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। Andreas-এর ভাষায় তখন তাঁরা তৃণমূল থেকেই অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন– হাউজ পার্টি, ব্যক্তিগত সংগ্রহ, টি-শার্ট-বিক্রি– ইত্যাদি বিভিন্নভাবে স্ব-অর্থায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাঁরা। Andreas-এর মতে এই ঘটনাটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এখান থেকে বোঝা যায় 'বৃহৎ দানের' মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র-তীক্ষ্ণ-প্রচ্ছন্ন 'কাঁটা' ও 'শর্ত' লুকিয়ে থাকে। তাই সবসময় 'বড় ফান্ড' পাওয়াটাই একমাত্র কথা হতে পারে না– কে কীভাবে কিসের বিনিময়ে বড় 'ফান্ড' পেয়েছেন সেই ইতিহাসটুকুও জানা প্রয়োজন। প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্টদের চিহ্নিত করা ও স্বীকৃতি প্রদান করার সময় এই
দিকটাও যাতে আমরা খেয়ালে রাখি।

ফিল্যানথ্রপি আর এনজিও-র কর্মকাণ্ড এক কথা নয়

ব দ রু দ্দী ন উ ম র

[জন্ম ২০ ডিসেম্বর ১৯৩১ বর্ধমান, পশ্চিমবাংলায়। পিতা আবুল হাশিম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৬৮-তে পদত্যাগ। প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৭০ এর অধিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: সাম্প্রদায়িকতা ১৯৬৬, সংস্কৃতির সংকট ১৯৬৭, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা ১৯৬৮, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১৯৭০, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক ১৯৭২, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ১৯৭৪, বাঙলাদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা ১৯৭৪, যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ ১৯৭৬, যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ ১৯৭৪, ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ১৯৮০, বাঙলাদেশে মার্কসবাদ ১৯৮১, বাঙলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক ১৯৮৭, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ১৯৮৪, মার্কসীয় দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ১৯৮৬, বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন ১৯৮৬, ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল ১৯৮৫, বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ১৯৮৭, বাঙলাদেশে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারা ১৯৮৭, বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ১৯৮৯, বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ১৯৮৯, সামরিক শাসন ও বাঙলাদেশের রাজনীতি ১৯৮৯। উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা: সুকান্ত সমগ্র, স্টালিন প্রসঙ্গ, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিপীড়ন ও সংগ্রাম, নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৭২ প্রত্যাখ্যান, ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার ১৯৭৪ প্রত্যাখ্যান। তাঁর লেখা প্রধানত উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী। সাম্প্রদায়িকতা, অপসংস্কৃতি, ভাষা আন্দোলন, কম্যুনিস্ট আন্দোলন, কৃষক সমাজ, মুক্তিযুদ্ধ, মার্কসবাদ, গণতন্ত্র, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, নারী, সামরিক শাসন এবং চলমান নানাবিধ সমস্যা নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখি করছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলার ক্ষমতা মুসলমানদের হাত থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে চলে গেল এবং ক্ষমতাশূন্য সেই মুসলমান অবাঙালি ছিল, তা সত্ত্বেও ঘটনার প্রভাব বাঙালি মুসলমানদের মনস্তত্ত্বের ওপরও অনেকখানি পড়েছিল। সে প্রভাবের কারণে বাঙালি মুসলমান ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। এতে করে নিজেদের চরম ক্ষতি হয়েছিল বটে। এছাড়া অন্য আরও নানা

কারণে পিছিয়ে পড়েছিল বাঙালি মুসলমান। তবে তারা আবার মোটাদাগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। মাথাচাড়া দিয়ে-ওঠা বাঙালি মুসলমানদের চিন্তক-ধারার সবচেয়ে বিকশিত ব্যক্তিত্ব বদরুদ্দীন উমর। বলা যায় তাঁকে বুঝতে পারলে আজকের বাঙালি মুসলমানকে বোঝা যাবে। এরকম দৃঢ়চিত্ত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব বাঙালিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, মানবেন্দ্রনাথ রায়, ভবানী সেন প্রমুখ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।]

হালখাতা

একটা সময় ছিল যখন মহল্লায় গ্রামে-গঞ্জে এমনকি শহরেও মানুষের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের ঐক্য ছিল। কেউ বিপদে পড়লে স্বার্থহীনভাবে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে সহযোগিতা করত। যেমন ঝড়ে কারো ঘর পড়ে গেলে অন্য আর দশ জন মানুষ মিলে তার ঘরটা তুলে দিয়ে আসত। পরোপকারের এই যে ধারাটি এটা কিন্তু এখন আর নেই। শুধু শহরেই নয় গ্রামেও আজ ভীষণভাবে বিচ্ছিন্নতার চিত্র লক্ষণীয়। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে ব্যক্তিসর্বস্বতার যে চরম প্রকাশ আজ আমরা লক্ষ্য করছি, আসলে কী ধরনের মনস্তত্ত্ব থেকে মানুষের এটা হল?

বদরুদ্দীন উমর

এটা তো কালচারের ব্যাপার। প্রত্যেক দেশের একটা কালচার থাকে। কালচার মানে তো আর নাচলাম, গাইলাম, ছবি আঁকলাম, সাহিত্য করলাম, সিনেমা বানালাম, নাটক করলাম শুধু তা নয়। কালচারের সবচেয়ে বড় দিক হল মানুষের প্রতি আচরণ, অন্যের প্রতি বিবেচনা। এটাই হচ্ছে কালচারের মমার্থ বা নির্যাস। যদি কোনো মানুষ ভালো সাহিত্য রচনা করে, ভালো নাচে, গায় আর অন্য মানুষের ক্ষতি করে, অন্যের প্রতি নির্দয় আচরণ করে তাহলে বুঝতে হবে লোকটা লো কালচারের। ফিল্যানথ্রপি তো অনেক দূরের কথা। এই যে তোমরা বললে যে গ্রামেগঞ্জে বা শহরে একটা কিছু ঘটলে অন্যেরা এগিয়ে আসত, আমি নিজেও দেখেছি রাস্তায় কেউ এক্সিডেন্ট করলে অন্যেরা পাগলের মতো এগিয়ে আসত। কেউ বদনায় বা অন্য পাত্রে করে পানি নিয়ে আসত। কেউ সেভলন নিয়ে আসত। কেউ-বা ডাক্তার ডাকতে যেত। এখনো যে সে রকম একেবারে দেখা যায় না, তা নয়। কিন্তু এখনকার মানুষের মধ্যে অন্যের প্রতি বিবেচনাবোধটি আগের মতো কাজ করছে না। এর অর্থ হচ্ছে কালচারালি আমরা পিছিয়ে গেছি। এটা যে শুধু বাংলাদেশেই ঘটছে তা নয়, আজকের দুনিয়ার সব জায়গাতেই এই অধঃপতন নেমে এসেছে।

হালখাতা

তারপরও তো মানুষকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে এবং সেটা মানুষেরই সহযোগিতা নিয়ে। ফলে মানুষের মধ্য থেকে কল্যাণবোধ কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার

সুযোগ নেই। এই কল্যাণবোধ তথা ফিল্যানথ্রপি বা লোকহিতৈষণা বলতে আমরা কী বুঝব?

বদরুদ্দীন উমর

মানুষের মধ্যে যেমন অন্যকে ধ্বংস করার অপশক্তি আছে, একইভাবে এর বিপরীত বিষয়টিও আছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কল্যাণবোধ বা অন্যের জন্য কিছু করার একটা ব্যাপারও আছে। অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই সেটা আছে কিন্তু অনেকটা সুপ্ত অবস্থায়। এটাকে জাগ্রত করা সম্ভব। আর সম্ভব এ কারণে যে, সেটা মানুষের মধ্যে আছে, একে নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে না। কিন্তু জাগ্রত করতে গেলেই যে বাধাগুলো এসে যায় সেগুলোকে মোকাবেলা করা খুব সহজ কাজ নয়। এখন কথা হল এটাকে জাগ্রত করতে হলে কী করতে হবে। মানুষের কালচারকে পরিবর্তন করতে হবে। কালচার তো একদিনে পরিবর্তনের বিষয় নয়। এই অধঃপতিত কালচারের পরিবর্তন আনতে গেলে মানুষের মধ্যে আস্থা, আশাবাদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন এবং সর্বোপরি অন্যের জন্যে বাঁচার আনন্দকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। আর এগুলো তো এমনিতে হয়ে যাবে না। এজন্য মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। কাউকে কাউকে চরম মূল্য দিতে হবে। বড় ধরনের ত্যাগ ছাড়া মানুষের মধ্যকার ফিল্যানথ্রপিক শক্তিকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থে কাজে লাগানো যাবে না।

হালখাতা

একটি রাষ্ট্রের গণমানুষের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ফিল্যানথ্রপির অবদানকে আপনি কীভাবে দেখেন?

বদরুদ্দীন উমর

একটি রাষ্ট্রের জনগণের মৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে ফিল্যানথ্রপির আলোচনা কোনোভাবেই যায় না। জনগণের মৌলিক পরিবর্তনের সম্পূর্ণ দায় একটি রাষ্ট্রের নির্বাহীদের। সরকার যেখানে অনুপস্থিত সেখানেই ফিল্যানথ্রপির মতো বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে। তবে লোকহিতৈষণা বা অন্যের উপকার করার প্রবৃত্তি যেহেতু মানুষের জন্মগত, সে কারণে একটি রাষ্ট্রের পরিচালনার সঙ্গে যারা যুক্ত থাকেন, তাদের একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে প্রস্তুত হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই মানুষের জন্য কাজ করতে সবচেয়ে আগ্রহী লোকেরা নানা পরীক্ষার ভেতর দিয়ে নিজেদের তৈরি করবেন। এবং সেটি হবে একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টা। পক্ষান্তরে ফিল্যানথ্রপি কখনও একক আবার কখনও-বা বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। কাজেই একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ছাড়া মানুষের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব না।

হালখাতা

বাংলাদেশে এনজিও ধারাটি বেশ শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে। প্রশ্ন হল, ফিল্যানথ্রপি আর এনজিও-র কাজ কি এক? এছাড়া যারা এনজিও সেক্টর নিয়ে কাজ করছেন তাদের মধ্যে সবসময়ই একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়, সেটা হল তারা যেন রাজনীতিবিমুখ। রাজনীতি নিয়ে কোনো উৎসাহ যেন তাদের নেই। এর কারণ কী?

বদরুদ্দীন উমর

প্রথমেই বলে নিই, ফিল্যানথ্রপি আর এনজিও-র কর্মকাণ্ড এককথা নয়। আসলে তারা রাজনীতিবিমুখ নয়। বরং এরা প্রচণ্ডভাবে প্রগতিশীল রাজনীতি বিরোধী। এরা এমন ভান করে যেন রাজনীতি নিয়ে এদের কোনোই মাথা-ব্যথা নেই। তোমরা নিজেরাই দেখবে এরা সময়মতো বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তা ও কাজের বিরোধিতা করে। এতে কি বোঝা যায় না যে, তাদের রাজনীতি আছে এবং সেটা আসলে কী? তাছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে রাজনীতির বাইরে থাকা সম্ভব না। এ্যারিস্টটল তো অনেক আগেই বলে গেছেন, Man is a political animal। রাজনীতি মানে তো মানুষ পরিচালনার নীতি, সমাজ পরিচালনার নীতি, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি। রাজনীতি মানে তো অন্য কিছু নয়। তাহলে বাংলাদেশে যারা এনজিও সেক্টর নিয়ে কাজ করছে তারা যে রাজনীতির ব্যাপারে উদাসীন এটা তারা গোপন করতে চাইলেও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি উদাসীন যে বাউল তারও একটা রাজনীতি আছে। কাজেই দেশের মধ্যে মানুষের প্রকৃত বিপদকালীন সময়ে এনজিও'র কর্তাব্যক্তিগণকে যে অধিকাংশ সময়ে চুপচাপ থাকতে দেখা যায়, এরও একটি অর্থ আছে– এটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ইঙ্গিত করে। কাজেই কেউ যদি মুখ ফুটেও বলে যে আমি রাজনীতি করি না, তাহলে প্রথমেই বুঝতে হবে সেই ব্যক্তিটি রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সে তার রাজনৈতিক জায়গা গোপন করতে চাইছে। চাইলে কী হবে থলের বিড়াল ঠিকই এক সময় বেরিয়ে পড়ে, কেননা তারা সুযোগ পেলেই প্রগতিশীল ও বিপ্লবী রাজনীতির বিরোধিতা করে। কাজেই তাদের যে রাজনীতি নেই কথাটা ঠিক না।

হালখাতা

একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে লোকহিতকর, জনকল্যাণকর তথা ফিল্যানথ্রপিক– সব ধরনের কাজের দায়িত্ব তো থাকার কথা রাষ্ট্রের। সেখানে রাষ্ট্রের সকল জনগণ তো নিশ্চয়ই সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে থাকবে না। কিন্তু এ ধরনের রাষ্ট্রে সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে কারো মনে জনহিতকর কাজ করার আগ্রহ বা ইচ্ছা দেখা দিলে তার বাস্তবায়ন সে কীভাবে করবে?

বদরুদ্দীন উমর

যে লোকটি বা যে লোকেরা সমাজতন্ত্রের কথা বলছে– সে বা তারা নিশ্চয়ই আন্দোলন করে, জনমত সৃষ্টি করে একটি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। এটা সম্পূর্ণভাবেই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া।

আর 'ফিল্যানথ্রপি' তো আরো পুরনো ব্যাপার। একজন মানুষের মধ্যে আরেকজন মানুষের জন্যে যে কল্যাণকামিতা– সেটা হাজার হাজার বছর আগে ছিল, এখনও আছে। মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা আছে আবার মানুষ অন্যের জন্য কাজও করতে চায়। অন্যের জন্য যারা কাজ করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ জনকল্যাণ করে তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে, আবার কেউ আছে স্বার্থহীনভাবে মানুষের জন্য কাজ করে। কেউ আছে আবার সন্ন্যাসী হয়ে যায়। যেমন গৌতম বুদ্ধ, নিমাই চন্দ্র। এঁরা ব্যক্তিগত ভোগবিলাসিতা পরিত্যাগ করে মানুষের জন্যে সর্বস্ব দিয়ে কাজ করার জন্যে এ পথ বেছে নিয়েছিলেন। কাজেই লোকহিতৈষণা বা ফিল্যানথ্রপি নানাভাবে, হাজার রকমভাবেই করা যায়। বেশি দূর যেতে হবে না। আমাদের দেশে যারা জমিদার ছিল, এমনকি অন্যদেশের জমিদারদের ক্ষেত্রেও খাটে কিংবা যারা বড়লোক, যারা ব্যবসা-ট্যাবসা করেছে তারাও দেখা গেছে যে বিভিন্ন সময় নানা জায়গায় রাস্তা, পুল, স্কুল, কলেজ তৈরি করে দিয়েছে, পুকুর, খাল, দীঘি কেটে দিয়েছে।

হালখাতা

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন তো সেটা ছিল না। আপনি যে সকল কাজের কথা বললেন– এ সকল কাজের দায়িত্ব তো রাষ্ট্রের। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতর থেকে একজন ব্যক্তি কী করে জনকল্যাণকর বা ফিল্যানথ্রপিক কাজ করতে পারে? কারণ সে ধরনের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের নির্বাহীগণ জনগণের সব ধরনের সমস্যা নিয়ে ভাববেন।

বদরুদ্দীন উমর

(খানিকটা উত্তেজিত হয়ে) তোমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক করছো কেন? বাংলাদেশে তো সমাজতান্ত্রিক কিছু নেই, সমাজতান্ত্রিক কাঠামো নেই। এটাতো আলাদা প্রশ্ন। এটাকে আলাদা করে দেখতে হবে। সেটি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সেটা হতে গেলে মানুষকে শিক্ষিত হতে হবে। একটা সাংস্কৃতিক অর্জন লাগবে। জনগণ সেখানে একটি রাজনৈতিক সচেতনতার মধ্য দিয়ে একটি সামাজিক সচেতনার মধ্য দিয়ে একটি রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু তার বাইরেও তো মানুষ মানুষের জন্যে কাজ করছে। সেরকম রাষ্ট্রকাঠামো যদি না থাকে, তার বাইরেও তো মানুষ এ কাজটা করে। আসলে এর বাইরে থেকে মানুষ এ ধরনের কাজ করে বলেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সমাজতন্ত্র তো হচ্ছে মানুষের চিন্তার একটি উচ্চতম পর্যায়। মানুষ যে স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে অন্যের উপকার

করতে চায় তারই একটি উচ্চতম সাংগঠনিক রূপ হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এবং সেই রূপ প্রতিষ্ঠার জন্যেই আমাদের যত সংগ্রাম।

হালখাতা

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ফিল্যানথ্রপিকে আপনি সম্পূর্ণরূপে অরাজনৈতিকভাবে দেখতে চাচ্ছেন। কিন্তু এর রাজনৈতিক দিকও তো রয়েছে। যদি সেটা না থাকে, এর সঙ্গে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণকে তো অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না?

বদরুদ্দীন উমর

না, আমি বিষয়টিকে অরাজনৈতিকভাবে দেখছি না। কিন্তু সে দিকটাতে পরে আসতে চাই। আমি যে কথা বলছিলাম: সেই আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে 'ফিল্যানথ্রপি' বিষয়টিকে দেখা গেছে। তার মধ্যে আবারও উল্লেখ্য যে জমিদাররা শোষক, যারা প্রজাদের উদ্বৃত্ত নিয়ে চলে– তার মধ্য থেকে আবার একটি অংশ দিয়ে তারা লোকহিতকর কাজ-কর্ম করেছে। যে কারণে দেখা গেছে, জমিদারদের মানুষ অত্যাচারী মনে করেছে, আবার জমিদারদের নিজের মা-বাপও মনে করেছে। আর মা-বাবা তো এমনিতেই বলত না, জমিদাররা জনগণের জন্যে কিছু কাজ করতো বলেই তাদেরকে মা-বাবা মনে করা হত। জনগণ মনে করত যে জমিদার সে তো জমির খাজনা নেবেই, সে ফসলের একটা ভাগ নেবেই, কিন্তু তারপরও যে পুকুর কেটে দিচ্ছে, স্কুল-কলেজ-রাস্তা-সাঁকো তৈরি করে দিচ্ছে, হাসপাতাল করে দিচ্ছে– তখন জনগণ ভাবত এসব কাজ তো জমিদাররা না করলেও পারত। কিন্তু জমিদাররা করেছে। ফলে, কিছু কিছু জমিদারের প্রতি আবার সাধারণ মানুষের কোমল অনুভূতিও ছিল। তবে সকল জমিদারের মধ্যে যে বিষয়টি সমানভাবে ছিল সেটা বলা যাবে না। মূলকথা হচ্ছে জমিদার কেন, সকল মানুষের মধ্যেই পরোপকার করার এ আকাঙ্ক্ষা আছে এবং সে আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব। কেননা মানুষের মধ্যকার পরোপকারের এই চিন্তাধারারই উচ্চতম একটি পর্যায় হচ্ছে সমাজতন্ত্র।

হালখাতা

তাহলে তো আরো একটি প্রশ্ন এসে যায়; যারা জমিদার ছিলেন কিংবা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়– এদের অনেক ধরনের শোষণমূলক কাজ যেমন ছিল আবার পাশাপাশি তারা কিছু জনকল্যাণমূলক কাজও করত। প্রশ্ন হল– এই যে শোষণ-নিপীড়নকারীই আবার ভালো কাজ করছে, এ ধরনের ফিল্যানথ্রপিমূলক কাজকে আমরা কীভাবে গ্রহণ করব?

বদরুদ্দীন উমর

হ্যাঁ সেরকম সমস্যা তো আছেই। সাধারণভাবে জমিদারদের মধ্যে শোষণ-নিপীড়নমূলক কাজের পাশাপাশি কারও কারও জনকল্যাণমূলক কাজও লক্ষ্যণীয়।

ইউরোপ-আমেরিকাতেও অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি রয়েছে যারা জনকল্যাণার্থে বিভিন্ন রকম ফাউন্ডেশন করে দেয়। আজকের দুনিয়াতেও পশ্চিমের অনেকেই কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশের কেউ কেউ আমাদের মতো দরিদ্র দেশে বিভিন্ন ধরনের ফাউন্ডেশন করে দিচ্ছে। দেখা যায় অনেক রকম ফায়দাবাজ আছে, লুটপাটকারী আছে, অনেকভাবে তারা টাকা-পয়সার মালিক হয়েছে– তারা আবার জনসেবামূলক কাজও করছে। যেমন দেখা যায় যে বিল গেটস্ আছেন, পৃথিবীর অনেক বড় ধনী। তিনি পশ্চিমী কায়দায় ফাউন্ডেশন করছেন। এখন কথা হল শোষণ-নিপীড়নের মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ দিয়ে জনসেবা করা হলে সেটা প্রকৃতই 'ফিল্যানথ্রপি' হবে কিনা সেটি একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন।

হালখাতা

জনসেবা বা মানবকল্যাণকে সামনে রেখেই তো বাংলাদেশে বিশাল এনজিও সেক্টর তৈরি হয়েছে। এগুলো প্রধানত বৈদেশিক ডোনেশন-নির্ভর প্রতিষ্ঠান। ডোনেশন এনে চুরি করা বা পয়সা মেরে দেয়ার বিষয়টি যদি বাদও দেই তবুও গৃহীত ডোনেশন দ্বারা আমাদের সমাজে কিছু কিছু জনকল্যাণকর কাজ তো হচ্ছে। ফিল্যানথ্রপিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এনজিও সেক্টরকে আপনি কীভাবে দেখেন?

বদরুদ্দীন উমর

এনজিও ধারা ফিল্যানথ্রপি বা লোকহিতৈষণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয়। এনজিও সেক্টর তৈরি হয়েছে বদমায়েশির জন্য। এনজিও'র জন্মদাতা হচ্ছে রবার্ট ম্যাকনামারার মতো একটা শয়তান যে এখনও বেঁচে আছে। যে ভিয়েতনামে অনেক কাণ্ড করেছে। সেই শয়তানই ১৯৭১ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটি প্রজেক্ট দিয়ে এনজিও সেক্টর শুরু করে।

হালখাতা

কিন্তু আমরা জানতে চাচ্ছি এনজিও সেক্টরের রাজনৈতিক, দার্শনিক জায়গাটা আসলে কী?

বদরুদ্দীন উমর

এনজিও সেক্টরের দার্শনিক মোটিভ হচ্ছে, রাজনীতিকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়া। আবার অন্যভাবে বলা যায়, যে-সকল দেশে রাজনৈতিক পার্টিগুলো অনেকাংশে কার্যকারিতা হারিয়েছে সেখানেই এনজিওগুলো কিছু কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ড করছে। যেমন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হল, কিন্তু পরে দেখা গেল আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য কাজ করলো না। এর পাশাপাশি বিশাল এনজিও সেক্টর তৈরি হল; কিছু কিছু অর্গানাইজেশন দাঁড়িয়ে গেল যারা ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এসব আন্দোলনের চেতনাকে নিজের

স্বার্থে ব্যবহার করতে লাগল, যে কারণে মুক্তিযুদ্ধ হল, দেশ স্বাধীন হল কিন্তু মানুষের মুক্তি আসল না। বাংলাদেশে বর্তমানে যেমন রাজনৈতিক দলগুলো অনেকাংশে আকার্যকর অবস্থায় আছে, একইসঙ্গে অনেক এনজিও রাজনৈতিক দলগুলোর বিকল্প হিসাবে, সাবসটিটিউট হিসাবেও কিছু কিছু রাজনৈতিক কাজ করে যাচ্ছে। কাজেই এনজিও'র দর্শন হল দলীয় রাজনীতিকে উৎখাত করা। তার জায়গায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করা এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্বের বিশেষ করে গরীব দেশগুলোর জনগণকে বিভ্রান্ত করা এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ হাসিল করা।

হালখাতা

এনজিও সেক্টরের এসব কাজের কি তাহলে কোনোই ভালো দিক নেই?

বদরুদ্দীন উমর

না নেই। কারণ রাজনীতি বাদ দিয়ে মানুষের মুক্তি আনা সম্ভব না। এনজিও হচ্ছে রাজনীতি-বিরুদ্ধ একটি প্রক্রিয়া। রাজনীতিকে হত্যা করার জন্যই এরা মাঠে নেমেছে। তবে হ্যাঁ রাজনীতির বাইরে তো কিছু নেই, কাজেই এদেরও এক ধরনের রাজনীতি আছে যা আগে একবার বলেছি।

হালখাতা

বাংলাদেশে এনজিও সেক্টরের রাজনীতিটা তাহলে কী ধরনের?

বদরুদ্দীন উমর

এমনিতে মনে হবে এদের কোনো রাজনীতি নেই। মুখে বলবে রাজনৈতিক আলাপ, লেখা-লেখি থেকে এরা দূরে। কিন্তু কেউ আলাপ তুললে দেখা যাবে ঠিক জায়গাটিতেই এরা বিরোধিতা করছে। এদের রাজনীতিটা কী, সেটা এদের বিরোধিতা করার জায়গাটা বুঝতে পারলেই পুরো জিনিসটা বোঝা যাবে।

হালখাতা

এনজিও সেক্টরের কাজের কারণে সাধারণ মানুষের স্বার্থের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে বলে আপনি মনে করেন?

বদরুদ্দীন উমর

একটা বিষয় দেখবে যে, এরা কিন্তু সবসময় গ্রাম-গঞ্জে কাজ করছে। সেখানে কাজ করার সময় রাজনীতি-বিরোধী কথাবার্তা বলছে। হয়ত তারা দারিদ্র্য দূর করার নামে ক্ষুদ্র ঋণ দিচ্ছে বা নিরক্ষরতা দূর করার নামে স্কুল করে দিচ্ছে– কিন্তু সবসময় রাজনীতির বিরোধিতা করছে বিশেষ করে কমিউনিজম কিংবা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে

প্রচার চালাচ্ছে। এবং মানুষকে মৌলিকভাবে মুক্ত হওয়ার পথকে বন্ধ করে দিচ্ছে। মানুষ যাতে সংগঠিতভাবে আন্দোলনে না নামে সে জন্য তাৎক্ষণিক হয়তো একটু সুবিধাও তারা দিয়ে দিচ্ছে।

হালখাতা

কিন্তু প্রশ্ন হল প্রজার উদ্বৃত্তভোগী জমিদারদের সেবামূলক কাজ যদি ফিল্যানথ্রপি হয় কিংবা মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীদের সেবাধর্মী কাজ যদি ফিল্যানথ্রপি হয় তাহলে এনজিও গুলোর কল্যাণমূলক কাজ ফিল্যানথ্রপি হবে না কেন?

বদরুদ্দীন উমর

এনজিও-কে জমিদারদের বা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। এনজিও হল সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদী; একশ ভাগ সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা। সাম্রাজ্যবাদীদের টাকা দিয়ে এসব অর্গানাইজেশন চলে। এদের একটি ভিন্ন মতলব আছে। সেটা হল রাজনীতি-বিরুদ্ধতা। প্রকারান্তরে সেটা জনস্বার্থ-বিরুদ্ধ পরিকল্পনা বলে এটাকে ফিল্যানথ্রপি বা এরকম কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না।

হালখাতা

বিদেশী ডোনেশন-নির্ভর বহু প্রতিষ্ঠান আমাদের চরমভাবে পরনির্ভরশীল করে তুলছে ;কথা হল, দেশীয় সহযোগিতায় যদি আমরা অর্গানাইজেশন দাঁড় করাতে পারতাম সেটার নিশ্চয়ই স্বনির্ভরতার দিক থেকে মূল্য থাকত?

বদরুদ্দীন উমর

বিদেশী কী? বিদেশী বললে হবে না। এই বিদেশ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী সরকার ও সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন বড় বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান, যারা সাম্রাজ্যবাদের এক একটা খুঁটি, এরাই এন.জি.ও-দের Funding করে থাকে। শুধু বিদেশ বললে সঠিক হবে না এ কারণে যে বিদেশে তো প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র রয়েছে। তারা তো এসব এন.জি.ও-কে সহায়তা কখনও দেবে না। আরও দেখা যায় ধর্মের নামে ভণ্ডামী করার জন্য কিছু ইসলামী ঘএঙ তৈরি হয়েছে। এরাও ধর্মকে সাম্রাজ্যবাদী ভণ্ডামীর কাজে ব্যবহার করছে। যারা Funding করে তাদের আবার বিভিন্ন জায়গায় সেন্টার রয়েছে। যেমন ইউরোপে রয়েছে, আমেরিকায় রয়েছে, আরও নানা জায়গায় রয়েছে। কাজেই বিষয়টি তো সুনির্দিষ্ট যে কারা Funding করছে, এখানে শুধু বিদেশী ডোনেশন বললে ভুল হবে ।

হালখাতা

যারা আমাদের মতো দেশে ডোনেশন দেয়, তাদের আসলে স্বার্থটা কী?

বদরুদ্দীন উমর

NGO সেক্টরটিই হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বাইরের ব্যাপার। তাদের শক্তি এবং আধিপত্য বিস্তারের স্বার্থেই তারা এখানে এসব করে। নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে টাকাপয়সা দিয়ে তাদের পছন্দের লোক দ্বারা এসব ঘএঙ খাড়া করে, সেখানে আমাদের স্বার্থের নাম করে মূলত তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নই মূল লক্ষ্য থাকে। যে কথাটা আমি বলছি, এমনকি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি, সেটা এখন তো পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন সিভিল সোসাইটির নামে এন.জি.ও গুলো নেমে পড়েছে রাজনীতি করার জন্য। ধরা যাক ইউনুস-টিউনুস, এরা হয়তো বলবে আমাদেরটা সে রকম কোনো এনজিও না, কিন্তু সেটাও ব্যাংকিং সেক্টরের এনজিও এবং খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। ফজলে হাসান আবেদ– একবার আমাকে বলেছিলেন, স্কুল-টিস্কুল করছি, আমি বেশ কিছু ভালো কাজ তো করছি। জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ কিছু কিছু ছোট-খাট ভালো কাজ না করলে বড় বড় খারাপ কাজ কীভাবে করবেন। আবেদ আজ শত শত কোটি টাকা এনে এটা সেটা করছেন– বলা যায় তিনি নিজেই এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবেদের এনজিও বাংলাদেশের তো বটেই, বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও।

হালখাতা

ব্রাক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এনজিও?

বদরুদ্দীন উমর

বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও তো হবেই! ইংল্যান্ড আমেরিকা বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে তো এনজিও-গিরি চলে না। এনজিও-গিরি চলে আমাদের মতো দেশে। কাজেই তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে গড়ে-ওঠা এনজিও-গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে আবেদের ব্রাক।

হালখাতা

কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে যাওয়ার অর্থাৎ এই অধঃপতনের কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

বদরুদ্দীন উমর

এই অধঃপতনের মূলে যেটা রয়েছে সেটা হল নষ্ট হয়ে-যাওয়া পরিবেশ। যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেটা এখন আর নেই। সেটা না থাকার পেছনে রাজনৈতিক কারণ সবচেয়ে বেশি দায়ী। কেননা আমাদের রাজনীতিতেও সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই। এই যে আওয়ামী লীগ, বি.এন.পি, ধর্মীয় ইসলামী দলগুলো, জামাত-টামাত এমনকি কথিত বামদলগুলো এদের কারোরই সুগঠিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি নেই। এরা সবাই সুযোগের

অপেক্ষায় থাকে। যারা ক্ষমতায় থেকেছে তারা চুরি করেছে আর যারা ক্ষমতায় থাকেনি তারাও নানাভাবে সুবিধা নিয়েছে। এমনকি আমাদের এখানকার বাম দলগুলো– এদের তো এমন অবস্থা হত না তারা যদি প্রগতিশীল সংস্কৃতিটা ধরে রাখতে পারত। এক সময় জমিদার পরিবার থেকে কিংবা উঁচু সংস্কৃতিবান পরিবার থেকে অনেক লোকজন কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছে, তাদের মানবিক গুণ অনেক বেশি ছিল, সাংগঠনিক জায়গায় তাদের সততা অনেক বেশি ছিল। তাদের ত্যাগ অনেক বেশি ছিল। এখন যেটা হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বা অন্যান্য রাজনৈতিক বড় দলের মধ্যে বড় বড় নেতাদের সেই সততা, নিষ্ঠা, বা ত্যাগ কোনোটিই নেই। তারা যেমন চুরি করে, সুবিধা ভোগ করে, তাদের সঙ্গে যারা কাজ করে, তাদেরও চুরি করতে শেখায় এবং সুযোগমতো সুবিধা নিতে শেখায়। দেখা যাবে তাদের মিছিল মিটিং-এ যে লোকজন আসে সেটাও টাকার বিনিময়ে আসে। সে কারণে আমাদের যে সামগ্রিক চরিত্র সেটাই আজ নষ্ট হয়ে গেছে।

১/১১ এর পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এলো পরিবর্তন। একটি অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় বসল। তখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান মনজুরুল আহসান খান বল্লেন এ সরকার যদি ব্যর্থ হয় তবে সেটা হবে জনগণেরই ব্যর্থতা। কথা হল এ সরকারের সাথে মনজরুল আহসান খানদের যোগাযোগ না থাকলে তাঁরা এরকম কথা বলতে পারতেন না। আর এটা কোনো কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য হতে পারে? কমিউনিস্ট পার্টির লোক হয়েও তাঁরা বলতে চাইলেন যে, এই অনির্বাচিত সরকারই হল জনগণের আসল প্রতিনিধি। এর আগে যারা যারা ক্ষমতায় ছিল তারা আর যাই হোক, অন্তত নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির মতে তারা কোনো প্রতিনিধিই না; অনির্বাচিতরাই হল আসল প্রতিনিধি। আরেকটি বিষয় হল দেশে এখন সবাই যেন মিথ্যা ছাড়া কথাই বলতে পারে না। দেশের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এক ধরনের হিসেব করে বলি, একশ জনের মধ্যে নব্বই জনই মিথ্যা কথা বলে। এই নব্বই ভাগ সবসময় মিথ্যা কথা বলে। বাকী দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ মাঝে-মধ্যে মিথ্যা কথা বলে। থাকল আর এক ভাগ। এই এক ভাগের মধ্যে .৯ ভাগ কদাচিৎ মিথ্যা কথা বলে। আর হয়তো .১ ভাগ মিথ্যা বলে না। এই অবস্থা যে দেশের সে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি শঙ্কিত। কেননা যে লোক মিথ্যা কথা বলে তার সঙ্গে ডিল করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। কারণ আপনি জানেন না যে সে কী করতে চাইছে। সবচাইতে বিভ্রান্তিকারী হচ্ছে মিথ্যাবাদী। আমি একবার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে মিথ্যেবাদী বলেছিলাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেক শিক্ষক আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল, সে বলল, মিথ্যা কথা বললে হয়েছে কী? এতে তো আমি সমস্যার কিছু দেখি না! তার কথা শুনে তো আমি অবাক! একজন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক এবং একটি রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং তাও আবার কমিউনিস্ট পার্টির। এখানে লক্ষণীয় যে, শুধু মিথ্যা কথা যে বলছে তা-ই নয় মিথ্যা কথা বলা যে খারাপ এটা বোঝার ক্ষমতাও তার নেই। এই হল বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা। সংস্কৃতির এই

যে অবক্ষয় এর ওপরে আমি প্রচুর কাজ করেছি। কিন্তু এর প্রয়োগ কোথায়? মূল কথা হল সংস্কৃতি একটি চর্চার বিষয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হাত ধরাধরি করে চলে। কাজেই রাজনীতির পরিবর্তন না হলে, আমি বলব আমূল পরিবর্তন না হলে এই ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্ভব নয়।

হালখাতা

কিন্তু একই ব্যক্তি তার এক জীবনে কিছুকাল হয়তো সততা, নিষ্ঠা, সুস্থ সংস্কৃতি, মানবতা এসব পথে কাটাল আবার সেই জীবনেরই কিছুকাল হয়তো অসততা, মিথ্যা, আঁতাত– এসবের মধ্য দিয়ে কাটাল। প্রশ্ন হল একজন মানুষের পুরো জীবনটা তো একভাবে কাটানো সম্ভব হয় না। যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায় উনি হাংরি আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের একজন ছিলেন, সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই একসময় তার সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মামলায় রাজসাক্ষী হলেন। ব্যক্তি জীবনের এই দ্বান্দ্বিক জায়গাগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

বদরুদ্দীন উমর

সেই সমস্যা তো আছেই। 'মানুষ মানুষের জন্য' গানটি যে লোকটা গাইল, কী যেন নাম?

হালখাতা

ভূপেন হাজারিকা।

বদরুদ্দীন উমর

এই ভূপেন হাজারিকা মানুষের জন্য গান গাইল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গান গাইল। সেই হাজারিকা টাকা খেয়ে বিজেপির মতো একটি সাম্প্রদায়িক দলে যোগ দিল। এ ব্যাপারে আমরা কী বলতে পারি? প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে কতগুলো চ্যালেঞ্জিং সময় আসে, সে সময়গুলোতে একটু শক্ত করে হালটা ধরতে হয়। সেটা করতে ব্যর্থ হলেই ভূপেন হাজারিকার মতো অবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা কী জান? একজন সাধারণ মানুষ অসৎ হলে সমাজে যে প্রভাব পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব পড়ে ভূপেন হাজারিকাদের মতো ব্যক্তিরা যখন অসৎ হয়ে যায়। এতে সমাজে বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়।

হালখাতা

ব্যক্তির জীবনের এই যে একেকটা অধ্যায় আলাদা আলাদা রূপ নেয়; অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি একই জীবনে চরম সততা– আবার সেই জীবনেই অসততা চলে আসে–

এটাতো অনেক সময় এমনও হয় সেই অসততার ওপর তার হাত থাকে না। পারিপার্শ্বিক কারণে সে ওরকম হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

বদরুদ্দীন উমর

মানুষের জীবনে এরকম হয়। কিন্তু সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব তো নিজের। আমরা তো অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণে রাখি এবং রাখি বলেই তো কিছুটা হলেও আমাদের সমাজে এখনও কিছু ভালোত্ব আছে। কাজেই একজন চরম সৎ মানুষ, আমি চরম না বলে প্রকৃত সৎ বলতে চাই, তো প্রকৃত সৎ মানুষ কখনও হঠাৎ করে অসৎ হয়ে যেতে পারে না। আর সে যদি অসৎ হয়-ই তাহলে বুঝতে হবে তার সততার মধ্যে অসততা ছিল।

হালখাতা

আমরা যতদিন পড়াশুনার মধ্যে থাকি ততদিন অর্থনৈতিকভাবে সাধারণত বাবা-মা'র ওপর নির্ভরশীল থাকি। পড়াশুনা শেষ করে আমরা কী করব? বাবা-মায়ের স্বপ্ন থাকে আমরা যাতে একটা চাকরি নেই এবং এমন একটা পর্যায়ে এসে আমাদের ওপর এক ধরনের আর্থিক চাপ তৈরি হয়। অথচ আমাদের অনেকের মধ্যে তখন হয়তো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুক্তির ভাবনা তথা রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে ভাবনা কাজ করে। অথচ একটি চাকরিতে ঢোকা মানে আমার পুরো সময়টা বিক্রি করে দেয়া। জীবনের এরকম একটা টার্নিং পয়েন্টে এসে যুবসমাজ কিন্তু তার প্রকৃত চিন্তা ও ইচ্ছার জায়গায় থাকতে পারে না। সে বাধ্য হয়ে চাকরির মতো একটি পরাধীন বিষয়ের ভেতরে ঢোকে। এভাবে একটা পর্যায়ে এসে আমি আর আমাকে খুঁজে পাই না। আমি হয়ে যাই তেজহীন গো-বেচারা। যার মাথায় রাষ্ট্র, রাজনীতি, গণমানুষ এসব আর কাজ করে না। এরকম একটা বিষয়কে বুঝবার জন্যে আমাদের হয়তো এক ধরনের মেচ্যুরিটি আছে। কিন্তু আপনার চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বিষয়টিকে যদি কিছুটা ব্যাখ্যা করেন—

বদরুদ্দীন উমর

এক্ষেত্রে বিষয়টি নির্ভর করছে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। হ্যাঁ, জীবনের এরকম একটি সময়ে এসে আমাদের অনেককেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যেটা হয়তো তার মনের প্রকৃত চাওয়া নয়। তবে চাকরি-বাকরি করলে যে একটা মানুষ পুরোপুরি পরাধীন হয়ে গেল আমি সেটা মনে করি না। স্বাধীনতা হচ্ছে এমন একটি ব্যাপার যা কেবল চাইলেই পাওয়া যায় না, আদায়ও করে নিতে হয়। চাকরি হোক, ব্যবসা হোক, যে কোনো কাজের মধ্যে থেকেও সৎভাবে উপার্জন করা সম্ভব। এবং সেখানে থেকে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া সম্ভব। সমস্যা হয় যেখানে এজন্যে মূল্য দিতে হয়, শ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠা দিতে হয়, আমরা সেটা দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকি না। এই যে নিজে

কষ্ট করতে চাই না, সৎ পথে না চলে অসৎ পথে চলি এজন্য নিজেকেই দায়ী করা উচিত।

আর মানুষের মুক্তির ভাবনা– এটা তো সহজ বিষয় নয়। এটা করতে গেলে ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রয়োজন। ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া কখনই এটা অর্জন করা সম্ভব না।

হালখাতা

কিন্তু আমরা এরকমও দেখেছি, কারও মন চাইছে সে হয়তো কবিতা লিখবে, রাজনীতি করবে কিংবা হয়তো অন্য কোনো উপায়ে গণমানুষের মুক্তির জন্য সে কাজ করবে। কিন্তু তার সামনে এমন বাস্তবতা এসে হাজির হয় যে বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ না করলে তার ব্যক্তিগত ও পরিবারের ন্যূনতম চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব না, অন্যদিকে এই বাস্তবতার কারণে গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে না পেরে সে আত্মহত্যাও করে বসে। এমন আত্মহত্যার ঘটনা আমাদের পরিচিতদের মধ্যেও ঘটেছে।

বদরুদ্দীন উমর

এই আত্মহত্যা কিন্তু একসময় ছিল না। আগেকার দিনে বড়জোর সন্ন্যাসী হয়ে জঙ্গলে চলে যেত। এখন কথা হল আত্মহত্যাই করুক, আর সন্ন্যাসীই হোক, এর মূল কারণ হল সে তার পরিস্থিতির সঙ্গে নিজে খাপ খাওয়াতে পারছে না। কয়েক দিন আগে আমি লালনের আখড়া থেকে ঘুরে আসলাম; সেখানেও দেখলাম অনেক লোক এমনিতে সময় কাটাচ্ছে গাঁজা খেয়ে। এরাও সমাজ থেকে একধরনের পলায়নপর কাজই করছে। কাজেই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে হবে। সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিকে এড়িয়ে এর সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। আমি মানুষের জন্য কাজ করতে চাইলে, রাজনীতি করতে চাইলে আমাকে অবশ্যই একটি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এগুতে হবে। এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমাকে টিকে থাকতে হবে, আমার পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এবং পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা সম্ভব না।

হালখাতা

বাংলাদেশে ফিল্যানথ্রপিক ধারায় অনুদান নিয়ে কাজ করলেও কেউ কেউ আছেন যারা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক দিক থেকে সৎ। এরা অনুদান গ্রহণ করে সেটাকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার না করে সমাজ ও রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থেই ব্যয় করছেন। এদের আর্থিক দিক থেকে ব্যক্তিগত এই সততাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

বদরুদ্দীন উমর

এই যুগে সৎ লোক বলতে বোঝায়, ফিন্যানশিয়ালি যে চোর নয়। কিন্তু এটা হচ্ছে লোয়েস্ট কাইন্ড অব অনেস্টি। আর্থিকভাবে সে অনেস্ট হয়েও অন্যদিক থেকে ডিজঅনেস্ট হতে পারে। যেমন একজন মানুষ খুব বেশি প্রচারকামী হতে পারে। কাজেই প্রচারের জন্য সে ডিজঅনেস্ট হতে পারে। আবার প্রচারের মাধ্যমে সমাজে সে যে স্টার হয়ে ওঠে তার ঐ স্বরূপটি অর্থমূল্যে কিন্তু বিক্রিও করতে পারে। মূল কথা হল খ্যাতি যশ, ক্ষমতা– এসবের জন্যও মানুষ অসৎ হতে পারে। কাজেই ফিল্যানথ্রপি করতে গিয়ে আমাদের এখানে সবাই ব্যবসা পেতে বসেছে। আমার দেখা প্রায় সকলেরই সততা শূন্যের কোঠায়। শুধু তাই নয়, দেশের মধ্যে বড় ধরনের দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার সময় এরা যে চুপ করে থাকে– এই চুপ করে থাকাটা হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় অসততা। সুতরাং শুধু ব্যক্তিগত আর্থিক সততা দিয়ে সবকিছুকে বিচার করা যাবে না। আর সেই ব্যক্তিগত আর্থিক সততারই-বা নিশ্চয়তা কতটুকু? আমি তো দেখি এরা অনেকেই প্রায় শূন্য থেকে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে কিন্তু এরা যাদের কল্যাণের কথা বলে সেই সাধারণ মানুষের তো কোনো উন্নতি হয়নি। দেশে আজ দুর্ভিক্ষ অবস্থা চলছে। মানুষের ন্যূনতম স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। কথিত সমাজসেবীরা এ নিয়ে তো কোনো কথা বলছে না! বরং সুশীল সমাজের নাম করে তারা বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠেও নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে।

হালখাতা

আপনি যে ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বলে থাকেন, সেই সমাজবাদী রাষ্ট্রপ্রক্রিয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

বদরুদ্দীন উমর

আমি যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কথা বলেছি তার সম্ভাব্যতা নিয়ে বলতে গেলে আসলে অনেক কিছু বলতে হয়। এখানে অনেক ছেলেমেয়ে আসে কিন্তু এদের সংখ্যা খুব কম। আগেকার দিনে অনেক বেশিসংখ্যক ছেলেমেয়ে নানা ধরনের পরিবার, এমনকি জমিদার পরিবার থেকে আসত। বর্তমান বিশ্বে এই ধারাটা এখন আর আগের মতো নেই। বাংলাদেশে এখন যেসব ছেলে-মেয়ে আসে তারা খুবই অভাব-অনটনের মধ্যে থাকে। এই অভাব-অনটনটাও বড় কোনো সমস্যা না। বড় সমস্যা যেটা, এরা আসার পরে কিছুদিন বাদে, এদের যখন ডানা গজায়, চোখ ফোটে তখন তারা নানা রকম ভ্রান্ত পথে চলে যায়। ফলে যে সংখ্যক আসে সে পরিমাণ ছেলেমেয়েকে পরে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি সামষ্টিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে গেলে সেখানে তো কষ্টের ব্যাপার আছে। এই কষ্টের পথ সেভাবে আর কেউ বেছে নিতে চাচ্ছে না।

হালখাতা
কিন্তু এই অবস্থা কি হতাশাব্যঞ্জক নয়?

বদরুদ্দীন উমর
হতাশাব্যঞ্জক তো বটেই। এলোমেলো কাজ করে কোনো লাভ নেই। একটা ফরমেশনের ভেতরে থেকেই কাজ করতে হয়। তা না হলে অনেক ভালো কিছুও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

হালখাতা
ফরমেশন বলতে আসলে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন?

বদরুদ্দীন উমর
ফরমেশন হল একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম। একটা পদ্ধতিগত উপায়ে মেধা-মনন ও পরিশ্রমকে একটা লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। এবং সেটা নিঃসন্দেহে সামষ্টিক হতে হবে।

হালখাতা
আপনি যে প্লাটফর্ম ও সামষ্টিক প্রয়াসের কথা বলছেন, সে ক্ষেত্রে আপনার অবস্থানও কি নড়বড়ে নয়? আপনিও কি খুব বেশি একা নন?

বদরুদ্দীন উমর
অনেকখানি একা হতে পারি, কিন্তু নড়বড়ে তো নয়। আমি তো নানা জায়গায় দৌড়াইনি। আমি তো আমার কমিটমেন্ট থেকে সরে দাঁড়াইনি। আমার সঙ্গের অন্য অনেকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে যদি নানা দিকে ছোটাছুটির মধ্যে থাকে সেখানে আমি কী করতে পারি? কিন্তু কেউ কি বলতে পারবে, আমি যে জায়গা থেকে শুরু করেছিলাম, যে কমিটমেন্টের জায়গা থেকে শুরু করেছিলাম, সেখান থেকে একচুলও আমি নড়েছি?

আমি তো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে এসেছিলাম কাজ করার জন্য। আমি তখন যেখানে ছিলাম এখনো তো সেখানেই আছি। কিন্তু আমাদের অর্গানাইজেশনের কথাই যদি বলি যে, এখন যেসব ছেলে-মেয়েরা আসে তারা সাধারণত গরীব পরিবার থেকে আসে। এরপর কিছুদিন গেলে, একটু পরিচিত হলে, সেটাকে ক্যাশ করে অনেকেই অন্যত্র বিক্রি হয়ে যায়।

হালখাতা

আমাদের প্রসঙ্গ যদিও ফিল্যানথ্রপি, তবু আপনার কাছ থেকে একটি বিষয়ে জানতে চাই, সেটা হল, আমাদের সামষ্টিক যে প্রয়াসের কথা আপনি বললেন, সমষ্টির এই যে লড়াই– এর ইতিহাস তো শুধু ভাঙার ইতিহাস। আপনার সঙ্গে যাদের দূরত্ব তৈরি হয়েছে শুধু সেটাই নয় বরং সামগ্রিক জায়গা থেকে বলবেন কি ক্রমাগত এই ভাঙনের মনস্তাত্ত্বিক কারণটা আসলে কী?

বদরুদ্দীন উমর

আগের দিনে আবস্থাপন্ন পরিবার থেকে কিছু কিছু ছেলে-মেয়ে রাজনীতিতে আসত। পরিবারের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও, পরিবার থেকে অনেক ভালো কিছুর শিক্ষাও তারা পেত। অন্য যারা আসতো তাদের মধ্যেও আজকের দিনের মতো সুশিক্ষার অভাব থাকতো না। সে কারণে তাদের মধ্যে এক ধরনের নীতি বা নৈতিকতা থাকত, লেগে থাকার ও পরিশ্রম করবার মানসিকতা থাকত। কিন্তু এ যুগের ছেলে-মেয়েরা বেশিদিন থাকে না। এরা যখন আসে তখন হয়তো নানা রকম সংকটের মধ্যে থাকে। তার মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট অন্যতম বিষয়। কিছুদিন পরে যখন চোখ ফোটে, দু'একটা কথা বলতে পারে, দু'একটা জায়গা চেনে, দু'একজন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটে, ডানা গজায় তখন তারা এ ধরনের রাজনীতির সঙ্গে আর থাকতে চায় না।

হালখাতা

কিন্তু আপনি কি তাদের হয়ে কখনও ভেবে দেখেছেন, তারা যে আবেগ নিয়ে আসে, যে স্বপ্ন নিয়ে আসে, সে আবেগ আর স্বপ্ন কী কারণে নষ্ট হয়ে যায় এবং এই স্বপ্ন তাদের দুঃস্বপ্নে পরিণত হয় কি-না এবং তারা যখন চলে যায় তাদের মধ্যেও প্রচণ্ড কষ্ট আর ক্ষরণ হয় কি-না?

বদরুদ্দীন উমর

সেদিকগুলো আমি নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছি। আসলে এ ধরনের কর্মীরা যখন আসে তখনই তারা নগদে এবং অল্প পরিশ্রমে কিছু পাওয়ার জন্য আসে। ত্যাগ-তিতিক্ষার মানসিকতা নিয়ে আসে না। কিন্তু বাস্তব তো আর সেরকম নয়। বাস্তব অনেক কঠিন। সেই কঠিনকে ফেস করা তো সহজ কাজ নয়।

হালখাতা

সেই কঠিন বাস্তবতা ফেস করতে না পারার প্রধান কী কারণ বলে আপনি মনে করেন?

বদরুদ্দীন উমর

প্রধান কারণের কথা যদি বলতেই হয়, আমি বলব সেটা হল আমার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড কী হবে সেটা নির্ধারণ করতে হবে সবার আগে। জীবনযাপনের মান সীমিত ব্যয়ের মধ্যে রাখতে পারলে সেই কঠিন বাস্তবতা ফেস করা অনেক সহজ হয়। কিন্তু এখনকার ছেলে-মেয়েদের ভেতরে তার উল্টোটা লক্ষ্য করা যায়। মানুষ তো এখন ভোগ ছাড়া অন্যকিছু বোঝে না। ভোগের চরম অবস্থা বিরাজ করছে প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে। এই ভোগের জন্য মানুষ মিথ্যা কথা বলে, লম্পট-দুশ্চরিত্র হয়। তখন নিজের বাবার সাথেও প্রতারণা করতে দ্বিধাবোধ করে না।

দৈনিকে চাকরি করে এক সাংবাদিক ১০/১২ হাজার টাকা বেতন পায়। সে তার বাসাভাড়াই দেয় ১০ হাজার টাকা। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম তুমি অন্য খরচ কীভাবে জোগাড় কর? সে বলল, এই জোগাড় হয়ে যায় আর কি। এখন কথা হল অতিরিক্ত ডিমান্ড তৈরি করলেই কিন্তু এটা-সেটা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কাজেই লিভিং স্টান্ডার্ড ফিক্স করা একটি অত্যন্ত বড় বিষয়।

এটা প্রচলিত একটা স্রোত। কিন্তু পরিবর্তনের স্বপ্ন যার ভেতরে থাকবে তাকে তো স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। যে কারণে আমার জীবনযাপনের ব্যয় সীমিত পর্যায়ে রাখতে পারলে আমার আর ওসব করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এ যুগের ছেলে-মেয়েরা নানা রকম লোভের বশবর্তী হয়ে শুঁয়োপোকার ন্যায় পাখা গজালেই প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।

হালখাতা

কিন্তু আপনি আমাদের বলেন, যে ছেলে বা মেয়েটি বিজ্ঞাপন ফার্মে সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯ টা অবধি কাজ করছে কিংবা ঔষধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ যার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টারই চাকরি, সে কী করে সমাজ পরিবর্তন বা রাজনীতির মতো একটি বিষয় নিয়ে ভাববে। শুধু তা-ই নয় আমাদের বন্ধুদের দেখেছি যারা সরকারী কলেজে মাস্টারির কাজ নিয়েছে তাদের মতন শিক্ষিতজনও চাকরির বাইরে সময় করে উঠতে পারে না এমনকি তারা কিছু বলতে বা করতে ভয় পায়। আমরা দেখেছি জাতীয় কোনো ইস্যুতে স্টেটমেন্ট স্বাক্ষর করতেও এরা ভয় পায়। তাহলে দাস তৈরির এই বাস্তবতাকে একটি নতুন ছেলে বা মেয়ে কীভাবে অতিক্রম করবে?

বদরুদ্দীন উমর

যে বাস্তবতার বিরুদ্ধে লড়াইটা, সেই বাস্তবতার অজুহাত দেখিয়ে তো লাভ নেই। চাকরি কোনো সমস্যা নয়। বিজ্ঞাপন ফার্ম, ঔষধ কোম্পানি কিংবা সময়ের দোহাই দিয়েও লাভ নেই। বরং আমি মনে করি যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো জায়গায় চাকরি নিয়ে, যে কোনো টাইম ফ্রেমের ভেতরে থেকেও সমাজের জন্যে, দলের জন্যে কাজ করতে পারে। সবাইকে তো সবসময় দলের জন্য কাজ করতে হবে এমন নয়। চাকরি

বা অন্য কোনো আয় রোজগারের মধ্যে থেকেও যেটুকু সময় পাওয়া যায় তার একটা অংশ-সময়ে কাজ করলেও তো অনেক। আর আগেও বলেছি মানুষের স্বাধীনতা এমন একটি ব্যাপার যা আদায় করে নিতে হয়। অধিকার যে আদায় করতে পারে না, তাকে যত অনুকূল অবস্থাই দেয়া হোক না কেন সে কখনোই সেটা আদায় করতে পারবে না। সে চাকরি করছে, সে তো বদমাইশি করছে না! আর তোমাদের বন্ধুরা সরকারী চাকরি করছে বলে ভয়ে প্রয়োজনীয় কথা বলা বা লেখা থেকে বিরত থাকছে একটি অহেতুক ভয় থেকে। কাজেই স্বাক্ষর না দিতে পারার কী আছে! আমি যে লেখাগুলো দৈনিকে লিখছি, সেগুলো ছাপতে গিয়ে ওরা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। ওরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে বোঝে কে-কত বিজ্ঞাপন পেল সেটাকে, কিংবা পত্রিকায় যারা চাকরি করে তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ হল কি-না সেটাকে। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তো সেটা নয়। আমি কতটা সত্য কথা, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন সংবাদপত্রে ছাপতে পারলাম সেটাই স্বাধীনতা। কিন্তু আমরা কি সেই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারছি? আবার হয়তো কেউ কেউ তারও ভেতর দিয়ে অনেকটা স্বাধীনতা আদায় করে নিচ্ছে। এটা যার যার ব্যক্তিত্বের ওপর এবং আমি স্বাধীন হতে চাই কি-না সেই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

হালখাতা

প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন করি; অনুরোধ থাকবে আপনি আমাদের ওপর বিরূপ হবেন না। যতীন সরকারকে এই প্রশ্নটি করায় উনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন, অবশ্য সেটা সাক্ষাৎকার ছিল না, একটি ঘরোয়া আলোচনায় তাঁর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, সেটা হল উনি দৈনিকে লেখেন কেন? এবং প্রথম আলোর মতো পত্রিকার পুরস্কার উনি কী চিন্তা থেকে গ্রহণ করলেন। এতে উনি ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের পত্রিকায় আমি লিখি সত্য কিন্তু তারা কি আমাকে দিয়ে তাদের পক্ষের একটি অক্ষরও লিখিয়ে নিতে পেরেছে? পারেনি। আমি তো আমার কথাই লিখছি। আর না লিখলে ওদের তো কোনো ক্ষতি হত না! বরং আমি লেখার কারণে লক্ষ মানুষের কাছে আমার চিন্তাকে পৌঁছে দিতে পেরেছি– এটাই-বা কম কিসের?

যতীন সরকার একভাবে বললেন, কিন্তু আপনি তো কোনো পুরস্কার গ্রহণ করেন না। কোনো কোনো পুরস্কার প্রত্যাখ্যানও করেছেন। কিন্তু আপনি বা আপনারা যাদের বিরুদ্ধে লিখছেন সেই ধারারই সংবাদপত্রে লিখছেন; প্রথম প্রশ্ন হল, এটা আপনার কৌশল কি-না এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হল আপনাদের হাত দিয়েই-বা একটি শক্তিশালী সংবাদপত্র তৈরি হল না কেন?

বদরুদ্দীন উমর

আমার বিরুদ্ধে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আমি খুব রাগ করি। সে কারণে কেউ কেউ নাকি আমাকে ভয়ও পায়। একথা আমি একাধিকবার একাধিক লোকের কাছ থেকে শুনেছি। কিন্তু মানুষ একথা কেন বলে সেটা আমার বোধগম্য নয়। আর তোমরা

যে বললে দৈনিকে কেন লিখি– আমার কথা হল কেন লিখব না? আমি তো অন্তত আমার কথাটি পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারছি! আর আমাদের চিন্তাধারার তোমরা যে সংবাদপত্রের কথা বললে, সেটা হওয়া দরকার ছিল– কিন্তু সেটা করতে গেলে তো ঋঁহফ প্রয়োজন। এই ঋঁহফ মোবিলাইজ কে করবে? সেটি একটি দুরূহ কাজ। তবে সেটি যে ভবিষ্যতে হবে না সেটাও তো বলা যাচ্ছে না। আমরা তো 'সংস্কৃতি' পত্রিকাটি বের করি, 'জনযুগ' বের করি! সাম্রাজ্যবাদীদের পত্রিকার পাঠক তো আর সবাই সাম্রাজ্যবাদী নন! দৈনিকে আমার লেখা অন্তত পাঁচ লক্ষ লোকে পড়ে; আমি যদি এ ধরনের পত্রিকায় না লিখতাম তাহলে তো এই বড়সংখ্যক পাঠক আমার লেখা থেকে বঞ্চিত তো। কাজেই এ ধরনের দৈনিকে আমি কেন লিখছি তার একটি সরল জবাব হল, একটি বৃহৎসংখ্যক পাঠকের কাছে আমার লেখাকে পৌঁছে দেয়ার জন্যই লিখছি। তাছাড়া আমি তো পত্রিকার লোকদের বলেই দিই, আমার লেখায় কোনো ঊফরঃ করা চলবে না। কার্ল মার্কস যে 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকায় লিখতেন, সেটাও তো কমিউনিস্টদের পত্রিকা ছিল না। তাহলে তিনি সেখানে কেন লিখতেন?

হালখাতা
তাহলে কি এটা বলা যায়, এটা একটা কৌশল?

বদরুদ্দীন উমর
না, এটাকে ঠিক কৌশল বলা যাবে না। এটা একটা সুযোগ। বলা যায় এটা সুযোগের ব্যবহার। কার্ল মার্কস তো 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন'এ লিখতেন অন্য কারণ ছাড়া টাকার জন্য। মার্কস তিনটি লেখা পাঠালে পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ দুটি লেখাই ফেলে দিত। তারপরও তো মার্কস সেখানে লিখতেন। এটাকে ঠিক কৌশল বলা যাবে না।

হালখাতা
কিন্তু আপনি কী জন্য লেখেন? আপনি কি টাকার জন্য লেখেন?

বদরুদ্দীন উমর
কার্ল মার্কসের কথাটি প্রসঙ্গক্রমে বললাম যে তিনি টাকার জন্য লিখতেন। তাঁর সেই কারণের সঙ্গে আমি কেন লিখি তার কোনো যোগসূত্র দেখানোর জন্য কথাটি বলিনি। আমি লিখি প্রথমত: পাঠকের কাছে আমার লেখা পৌঁছে দেয়ার জন্য। শুধু টাকার জন্যে নয়। তবে হ্যাঁ টাকার তো জীবনে দরকারও রয়েছে। বাণিজ্যিক পত্রিকায় আমি লিখে টাকা নিই, কিন্তু টাকার জন্য লিখি না।

হালখাতা
কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে পত্রিকার কাটতি ধরে রাখার জন্য একদিন হয়তো তারা

আপনার লেখা ছাপছে তার পরের দিনই হয়তো ইসলামী ব্যাংকের ম্যানিজিং ডিরেক্টরের সাক্ষাৎকার ছাপছে। এভাবে তারা ইধষধহপব করে পত্রিকার ব্যবসাটা ঠিক রাখছে। এখানে দেখা যাচ্ছে আপনাকে কিন্তু তারা বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করে ফেলল, বিষয়টিকে আপনি কী ভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

বদরুদ্দীন উমর

তারা ব্যবসায়ী, তারা ব্যালেন্স করে করুক। আমি তো আর ব্যালেন্স করছি না। আমি তো আমার লেখাতে ব্যালেন্স করছি না, কম্প্রোমাইজ বা বাণিজ্যও করছি না। তারা কী করছে সেটা তাদের ব্যাপার। আর সবাই যে ইসলামী ব্যাংকের ডিরেক্টরের সাক্ষাৎকার পড়ে ব্যালেন্সড হয়ে যাবে আমি তা মনে করি না। বরং আমার চিন্তা এতগুলো মানুষের মধ্যে ট্রান্সফার করতে পারছি, সেটা অবশ্যই একটি সুযোগ। আমি সে সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করছি। এর মাধ্যমে আমি একজন পাঠকের মনে উস্‌কানি দিচ্ছি, তার একটি চিন্তাকে জাগ্রত করছি; কিন্তু এটা না করলে কী হত? আমাদের বিরুদ্ধে যে অপশক্তি তারাই যদি সবসময় লিখতে থাকে আর আমরা যদি আমাদের কথা না বলি তা হলেই কী ভালো হবে দুনিয়ার? আমাদের সমাজের জন্যই কি সেটা মঙ্গলজনক হবে?

হালখাতা

এবার একটা ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করব– আমরা যে শিল্প করি, সেটা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, নাটক যাই হোক না কেন– এই শিল্পের দর্শন নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তি রয়েছে। যেমন কবিতার মধ্যে যদি রাজনীতি থাকে, গণমানুষের কথা থাকে তাহলে বলা হচ্ছে যে এটা কবিতা হবে না, এটা শ্লোগান। এ বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন।

বদরুদ্দীন উমর

এটা তো বহু পুরনো ভণ্ডামী; বলা হয়ে থাকে যে শিল্পের জন্য শিল্প। এটি একটি বাজে কথা। অনেকে বলে থাকেন যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট হওয়ার আগে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' লিখেছিলেন বলে সেটা অনেক শিল্পসমৃদ্ধ আর কমিউনিস্ট হওয়ার পরে যা কিছু লিখেছিলেন সেগুলো নাকি শিল্পসমৃদ্ধ হয়নি। এসব কথা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিপ্লবের পক্ষে যাদের অবস্থান তাদের বিরোধিতা করাই এ ধরনের কথার উদ্দেশ্য। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যারা বিরোধী তারাই এ ধরনের কথা কপচায়। কথা হচ্ছে কারো যদি শক্তি থাকে, সামর্থ্য থাকে তাহলে শিল্পগুণ রক্ষা করেও রাজনৈতিক চিন্তাসমৃদ্ধ উঁচুমানসম্পন্ন শিল্প সৃষ্টি করতে পারে। গোর্কী বা আস্ত্রভস্কি তো সেটা করে দেখিয়েছেন। আমাদের এখানে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উল্লেখ করা যেতে পারে। ক'জন বুর্জোয়া শিল্পী হিসেবে গোর্কী বা আস্ত্রভস্কিদেরকে অতিক্রম করতে

পেরেছেন? তারপরও সবচেয়ে বড় কথাটি হল, ওদের যে সংস্কৃতি বা ওদের শিল্প, তার ইতিহাস তো অনেক দিনের। সেই হাজার হাজার বছর ধরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াদের শিল্প একটি পরিপক্ক মানে এসে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বয়স সে অর্থে খুবই কম। এই অল্প সময়ে এই ধারার শিল্প অতটা পরিপক্ক জায়গায় পৌঁছবে না এটাই স্বাভাবিক। তবে এখানে লেনিনের একটি কথা খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন শিল্প সৃষ্টির জন্যে একটি গুণগতমান তো অবশ্যই থাকতে হবে, কিন্তু শিল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্পগুণ যদি কিছুটা কমও থাকে আর সে শিল্প যদি শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলে কিংবা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার হয় তাহলে সেই শিল্প অবশ্যই চর্চা করা দরকার।

হালখাতা

বৃটিশরা এখানে প্রায় দু'শ বছর শাসন-শোষণ করেছে। আমরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি এবং একসময় তারা এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। সেই বৃটিশদের মধ্য থেকেও লর্ড কার্জন, উইলিয়াম কেরী এ ধরনের আরো অনেকেই আমাদের এখানে জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। কথা হল এই যে যাদের বিরুদ্ধে আমাদের এত ক্ষোভ, ঘৃণা এবং প্রতিবাদ তাদেরই কেউ কেউ আমাদের এখানে ভালো ভালো অনেক কাজ করেছেন, যেমন স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি করেছেন। এদের কি আমরা ফিল্যানথ্রপিস্ট বলতে পারি?

বদরুদ্দীন উমর

লর্ড কার্জন আমাদের দেশে কোন জনকল্যাণমূলক কাজ করেননি। তিনি একজন কট্টর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। কথা ,হলো সকল খারাপের মধ্যেও দু-একটা আবার ভালো থাকে। উইলিয়াম কেরী, ডেভিড হেয়ার, বেথুন এরকম অনেকেরই নাম করা যাবে যারা এখানে ভালো কিছু কাজ করেছেন। এটা হয় এ কারণে যে, মানুষ তো আর নিজের সবটুকু বেচে দেয় না বা নিজের সবটুকু তো আর সবসময় নষ্ট করে ফেলে না? সে কারণে বৃটিশদের মধ্যেও যারা ব্যক্তিগতভাবে ভালো এবং উদ্যমী ছিলেন তারা কিছু কিছু ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল ব্রিটিশরা যে দু-শ বছর ধরে অপকর্ম করেছে, সেটা তো আর অল্প কয়েকজনের ভালো কাজ দিয়ে ঢেকে ফেলা যাবে না। তাদের মধ্য থেকে যারা ভালো কাজ করেছেন তারা অবশ্যই ইতিহাসে সেভাবে বেঁচে থাকবেন।

হালখাতা
আপনার কাছে সর্বশেষ একটি প্রশ্ন রাখছি, যেটি ঠিক আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব হবে না, সেটি হবে আপনারই একান্ত ভাষণ, এমন একটি কথা বলুন যেটি দিয়ে সাক্ষাৎকার পর্বটি সমাপ্ত হতে পারে ।

বদরুদ্দীন উমর
সেটা হল আমরা যাই করি না কেন, এই আপনারাই যা করছেন, এ রকম যে কোনো উদ্যোগ, একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে না গেলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে ।

প্র ব ন্ধ

জনহিতৈষণা ভাবনা

ব দি উ র র হ মা ন

মানুষের প্রতি মানুষের মায়া-মমতা তথা মমত্ববোধ তার সহজাত প্রবৃত্তি । এই প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে অপরের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানো; সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়ানোর মধ্য দিয়ে । ‘মানুষ মানুষের জন্য’ এমন ভাবনা নিয়ে অপরকে সাহায্যের এই যে প্রবণতা একেই সামগ্রিক অর্থে ফিল্যানথ্রপি বা জনহিতৈষণা বলা যায় ।

কাছের মানুষ বা আপনজনদের প্রতি দায়বোধ থেকে ‘দান’-এর প্রবণতা সৃষ্টি হলেও মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের কারণে যে দান সেটা একসময় রূপ নেয় ব্যাপক সামাজিক কর্মকাণ্ডে । সামাজিক এই কর্মকাণ্ডই মূলত ফিল্যানথ্রপি বা জনহিতৈষণা নামে পরিচিত । ব্যক্তিক দান হতে সামাজিক দান-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন । ব্যক্তির প্রয়োজনে, অভাবে, অনটনে তাকে দান-এর সীমা সংকীর্ণ এবং তেমন

সীমাবদ্ধ। এই দানই যখন কোনো জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে হয় তখন এর চরিত্র যায় পাল্টে।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই দানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তখনকার এই দানের সূচনা মূলত ধর্মীয় ভাবনা বা মূল্যবোধ থেকে; অথবা বলা যায় ধর্মীয় বিধান থেকে। সকল ধর্মেই সৎকাজের উপদেশ-নির্দেশের মধ্যে দানের প্রসঙ্গটি দেখতে পাওয়া যায়। সনাতন ধর্মে 'পরস্পর ভাবনা' আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় বিধান। জীবনকে পরিশুদ্ধ করা সনাতন ধর্মে দানের মূল উদ্দেশ্য। সেখানে দানকে দেখা হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উল্লেখ আছে;

'বিশ্বাসসহ দান কর, অবিশ্বাস নিয়ে দান কর না,
সংবেদনশীলতা নিয়ে দান কর, প্রাচুর্যের অনুভব নিয়ে দান কর না
অপরকে যা কিছুই দাও উপলব্ধি সহযোগে দাও।'

দানের এই নির্দেশের মধ্যে দানের মানসিকতা, দানের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাভারতে এবং ভাগবত গীতায়ও দানের উল্লেখ আছে বেশ গুরুত্বসহকারে।

বৌদ্ধ ধর্মে বস্তুগত দানের গুরুত্ব কম ভিন্নভাবে রয়েছে; এতে ভাগবত দানের গুরুত্ব থেকে ক্রমে সামষ্টিক দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক সময় করুণা এবং নিঃস্বার্থপরতাকেই দান বলে বিবেচনা করা হত; পরে তা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় সংঘ গোষ্ঠীর স্থলে।

ইসলাম ধর্মে পাঁচটি আবশ্যিকভাবে পালনীয় বিষয়ের মধ্যে 'যাকাত' বা দান অন্যতম। যাকাত বা দান বিত্তবান মুসলমানদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক বিধান। সেক্ষেত্রে নিজের সম্পদের যথার্থ বা সঠিক হিসাবের একটা অংশ অবশ্যই গরিব-দুঃখীদের মধ্যে দান করার বিধান রয়েছে। দানের এই ধর্মীয় নির্দেশনা বা বাধ্যবাধকতার মূল চেতনা এসেছে নিজকে এবং নিজের অর্জিত সম্পদকে শুদ্ধ করে পুণ্য সঞ্চয়ের ধারণা থেকে। ধর্মীয় এই দান উদ্দেশ্যহীন নয়।

ইহজাগতিক ভোগ-বিলাসকে নিয়ন্ত্রণ করে পারলৌকিক মোক্ষ লাভই এই দানের মূল উদ্দেশ্য। প্রথম দিকে কেবল ব্যক্তি-স্বার্থে ব্যক্তির মধ্যেই এই দান সীমাবদ্ধ ছিল। পরে এই দানের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং আধিপত্য সংরক্ষণ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে দানের ক্ষেত্র 'ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান' অর্থে এগোতে থাকে। ধর্মের বাইরের চিন্তা ও ভাবজগতেও এই দানের উল্লেখ পাওয়া যায় নানাভাবে। কবি-সাধকদের বাণীতেও দানের কথা উঠে এসেছে স্পষ্টভাবে। মধ্যযুগের মরমী কবি সাধক কবীর দানকে উৎসাহিত করতে অমর বাণী উচ্চারণ করেন, 'মুট্টি বান্ধে আয়ে জগতমে, হাত পসারে যাওগে ভাই' অর্থাৎ 'মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে এই জগতে এসেছিলে সেই হাত প্রসারিত করেই তোমাকে যেতে হবে'।

আধুনিককালে বিষয়টিকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক এক গবেষণা দলিলে 'ফিল্যানথ্রপি' বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে

জীবন চলার পথে একে অপরকে কিছু না কিছু উপকার করেই থাকে। কখনও পরিকল্পিতভাবে আবার কখনও তাৎক্ষণিকভাবে। এই যে উপকার করার অভ্যাস একেই আমরা ফিল্যানথ্রপি বলতে পারি।

এবার দেখা যাক এর আভিধানিক অর্থ কী? ইংরেজি অভিধানে ফিল্যানথ্রপি (philanthropy) শব্দের কয়েকটি অর্থ দেয়া আছে, যেমন: Love, practical benevolence, mankind । যার অর্থ হচ্ছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি বা সহযোগিতা। ফিল্যানথ্রপি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে জনহিতৈষণা বা লোকহিতৈষণা। আর ইংরেজি ও বাংলায় ব্যবহৃত শব্দ থেকে বিষয়টির তাৎপর্য যা বোঝা যায় তা হল, বিনিময়ে বস্তুগত কোনও কিছু পাওয়ার আশা ছাড়াই মানুষের কল্যাণে যা কিছু করা হয় তা-ই ফিল্যানথ্রপি।

আমরা সহজভাবে বুঝি 'মানুষ মানুষের জন্য' এই ইহজাগতিক ভাবনাই লোকহিতৈষণার মূল উৎস। ধর্মীয় নির্দেশে বাধ্যবাধকতামূলক যে দান তাকেও লোকহিতৈষণার বাইরে রাখা যায় না। কারণ ধর্মের নির্দেশেও মূলত কোনো কিছু প্রাপ্তির বাইরে থেকে মানুষের কল্যাণে দানকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে ধর্মের এই নির্দেশের মূল লক্ষ্য দাতা বা দানকারী। ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে একজন ধর্মপালনকারীর জন্য যত গুণবৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য, 'দান' তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বলে স্বীকৃত। বলা যায়, এই দানের লক্ষ্য যতটা না হতদরিদ্র মানুষ তার চেয়ে বেশি ধর্মপালনকারী ধনী দাতা হিসাবে কৃতিত্ব লাভ। দান করলে যেমন দানকারী ভালোমানুষটি হয়ে উঠবে তেমনি পরকালেও তার শান্তি বা সুখভোগের পথ সুপ্রশস্ত হবে; এককথায় বলা যায়, ধর্মীয় প্রণোদনা থেকে যে দান, তার পেছনে থাকে পুণ্যসঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা। যে ভাবেই হোক, দান বা জনহিতৈষণা–ক্রমে সেটা ব্যক্তির গণ্ডি থেকে সামাজিক ব্যাপকতায় রূপ লাভ করেছে। আধুনিককালে মানুষ যত না ব্যক্তিকল্যাণের দানে আগ্রহী, তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী সামাজিক দানে। অর্থাৎ যে দানে ব্যাপক অর্থে সমাজ বা সামাজিক কোনো জনগোষ্ঠি বেশি উপকৃত বা লাভবান হবে। এমন দানের মধ্যে শিক্ষা এবং চিকিৎসা সহায়তার প্রবণতাই বেশি। অনেকে এমন দানের সঙ্গে দানকারীর স্বার্থসংশ্লিষ্টতার সন্ধান করে থাকেন। তাদের মতে সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ বা সমাজের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই এমন দানের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে দানের যে ইতিহাস, তাতে দান এবং দক্ষিণার অধিকারী ছিল পুরোহিত-ব্রাহ্মণরা। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, পরকালের প্রাপ্তির প্রত্যাশায়ই এই দান-দক্ষিণা। দান-দক্ষিণার সাহায্যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের মাধ্যমে স্বর্গারোহণ ছিল বোধ করি এই দানের মাহাত্ম্য। প্রাচীন ভারতে 'দান' এবং 'দক্ষিণা' সমার্থক ছিল না। কোনো উপহার, অনুদান বা উপাধি দান করা হত। আর দক্ষিণার অর্থ-তাৎপর্য ছিল ভিন্ন। বিশেষ স্থানে শ্রদ্ধাভরে বিশেষ শুদ্ধতায় দক্ষিণা প্রদান করা হ'ত। কেবল পুরোহিতরাই এই দক্ষিণা পেতেন। সাধারণত কোনো যজ্ঞকর্মের বিনিময়ে পুরোহিতদের 'দক্ষিণা' দেয়া হ'ত। এভাবে দাতারাও সমাজে বিশেষ

সম্মানের অধিকারী হতেন। পুরোহিতদের নিয়ে স্তুতি-গীতি রচনা ও গীত হবার প্রমাণও পাওয়া যায়। স্তুতি রচয়িতারাও বিনিময়ে প্রশংসিত এবং দক্ষিণাপ্রাপ্ত হতেন।

বৌদ্ধ ধর্মেও একসময় এমন দান-দক্ষিণার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। দানের বিনিময়ে ভিক্ষুরা দাতাকে পুণ্য প্রদান করতেন। ধারণা ছিল ভিক্ষুরাই দাতাকে পরকালের কল্যাণ দানের অধিকারী ছিলেন।

ইসলাম ধর্মে দানের ব্যাপক ও বিস্তৃত অনুমতি তো সবারই জানা। পাশ্চাত্যেও দানের নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এব্যাপারে সবাই একমত নন। 'দান' দর্শন নিয়ে তাই নানা বিতর্কের সন্ধান পাওয়া যায়। নীৎশে দানকে দেখেছেন দুর্বল কর্তৃক সবলের শোষণ হিসেবে। দুর্বলরা কোনো কাজ না করে ধর্ম বা পরকালের মোক্ষ দানের লোভ দেখিয়ে সবল অর্থে ধনী লোকদের শোষণ করে অর্থ হাতিয়ে নেয়। এই কারণ দেখিয়ে নীৎশে দানের বিষয়টি একেবারেই অনুমোদন করেননি। কান্ট দানের চেয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মার্কস্ ও এঙ্গেলস দানের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন 'একশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদীগোষ্ঠি নিজেদের অবস্থান রক্ষার জন্যই সামাজিক দুর্দশা লাঘবে আকাঙ্ক্ষী। এদের মধ্যে আছে অর্থনীতিক, লোকহিতৈষী এবং মানবতাবাদী'...

হেনরী ফোর্ডের এ প্রসঙ্গে বক্তব্য হচ্ছেঃ 'আমি হতদরিদ্রকে কিছু দেয়ার পক্ষপাতী নই। আমি চাই তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনুক।'

জনহিতৈষণা বা দান নিয়ে এমন হাজারো যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক থাকলেও একথা ঠিক যে যুগযুগ ধরে মানবসমাজে এই দান বা জনহিতৈষণার চর্চা চলে আসছে। এই দান বা জনহিতৈষণা ক্রমে সামাজিক রীতি, লিখিত বিধি, এবং সিদ্ধ আইনে পরিণত হয়েছে। মোঘল শাসনামলে এমন জনহিতৈষণার উল্লেখ পাওয়া যায় সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাস সন্ধানী লেখায়ঃ 'মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় জনহিতকর কাজের জন্য নিষ্কর ভূমি নির্দিষ্ট করে রাখা হত। এগুলোকে বলে ওয়াক্‌ফ (Wakf)। রাষ্ট্র থেকে এরকম দান পেত প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যক্তি বা পরিবার নয়। রাষ্ট্র থেকে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, দরগাহ প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করা হত। এরকম জমির আয় থেকে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা হত। হিন্দুদের মন্দির, দেবালয়, সর্বজনীন পুজো, যেমন শিবের গাজন প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, বিষ্ণোর, শিবোত্তর ইত্যাদি নিষ্কর জমি বন্দোবস্তের নজির আছে। বাংলার নবাবরা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, উচ্চবংশজাত ব্যক্তি, হেকিম-কবিরাজ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য নানা ধরনের জাগীর বা নিষ্কর জমি দিতেন। এ-যুগে এগুলোর নাম 'আইমা' 'মাদাদিমাস'। আইমা ও মাদাদিমাস জাগীর প্রথমে ব্যক্তিবিশেষকে সারাজীবনের জন্য দেওয়া হত। পরবর্তীকালে ঐ ব্যক্তির পরিবার পুরুষানুক্রমে তা ভোগ করত। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব এক ফরমান জারি করে 'মাদাদিমাস' জাগীর পুরুষানুক্রমে ভোগ করার অধিকার দেন। এ ধরনের জাগীরগুলো অধিকারীরা নিঃশর্তে ভোগদখল করত। এছাড়া কৃতী রাজপুরুষদের ভোগ করার জন্য জাগীর দেয়া হত। এ ধরনের জাগীরগুলোকে

তিনভাগে ভাগ করা যায়। ইনাম-ই আলতামঘা বা পুরুষানুক্রমে ভোগ করার জাগীর, জাবতি বা সারাজীবন ভোগ করার জাগীর এবং মাসরুৎ বা শর্তাধীন জাগীর। কর্মচারী চাকরিতে ইস্তফা দিলে বা অবসর গ্রহণ করলে এ ধরনের জাগীর রাষ্ট্র ফিরে পেত। তাছাড়া পান্থশালা, ফকির, মুসাফির প্রভৃতির জন্য জাগীর বরাদ্দ হত।

সে-যুগে বাংলার নবাবরা আর্ত মানুষ, গরিব-দুঃখীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। গোলাম হোসেনের বিবরণী-থেকে জানা যায় আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেশ মোহাম্মদ খাঁ মুর্শিদাবাদের দুঃস্থ বিধবা ও বৃদ্ধদের গোপনে সাহায্য করার জন্য মাসে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করতেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, সে-যুগে অনেকেই রাজ্যের কোষাগার থেকে পেন্‌সন পেত। আর্ত ও দুঃখীরা দেওয়ানী রেজিষ্ট্রারে তাদের নাম লেখাত এবং রাজকোষ থেকে পেন্‌সন পেত। মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করতেন। রাষ্ট্র থেকে এদের জীবিকার ব্যবস্থা করা হত। মুর্শিদকুলী রাজধানীর গরিবদের নিয়মিত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ভবঘুরে, দুঃখী, আর্ত, অনাথ মানুষরা তার সময়ে রাজধানীতে নিয়মিত আহার পেত। ... সুজাউদ্দিন প্রতিবছর বিরাট রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করতেন। সেখানে দেশের বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হতেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন খুবই উদারপ্রকৃতির মানুষ। রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে নিয়মিতভাবে তিনি তাঁর কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্য দিতেন। মাঝে মাঝে অযাচিতভাবে উপহার পাঠাতেন। সমসাময়িক ব্যক্তিদের বিবরণে জানা যায়, তিনি দরিদ্র ব্যক্তিদের অকাতরে টাকা বিলাতেন।' {সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ প্রাক্-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন ১৭০০-১৭৫৭)−১৯৮২, কে পি বাগচী কলকাতা: হ: ৮১-৮২}

এ থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, সুপ্রাচীনকাল থেকেই এদেশে জনহিতৈষণার চর্চা গড়ে উঠছিল। অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র এই প্রবণতার প্রচলন ছিল। এদেশে প্রথম জনহিতৈষণা সম্পর্কিত যে আইন হয় তার মূলেও ছিল ধর্মীয় ভাবনা। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে পাস হওয়া 'রিলিজিয়াস চেরিটেবল এনডাউমেন্ট রেজুলেশন এ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে প্রথম সকল দেবত্র বা ধর্মীয় কারণে উৎসর্গীকৃত প্রতিষ্ঠান বা সম্পদ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। এর অর্ধ শতাব্দীরও কিছু বেশি সময় পর ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই আইনটি পরিবর্তন করে করা হয় 'রিলিজিয়াস চেরিটেবল এনডাউমেন্ট এ্যাক্ট।' এরপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আইনটির আরেক দফা পরিবর্তন করে করা হয় 'রিলিজিয়াস ট্রাস্ট এ্যাক্ট।'

অন্যদিকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে এদেশে প্রথম চালু হয় 'ওয়াক্ত ভেরিফিকেশন এ্যাক্ট।' এই এ্যাক্ট বা আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়াক্ত বা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ। এবং পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এই আইন পরিচিত হয় ওয়াক্ত অর্ডিন্যান্স হিসেবে। ওয়াক্‌ফ বা ওয়াক্ত আবার দুই ভাগে বিভক্ত: 'ওয়াক্‌ফ আওলাদ

এবং ওয়াক্ফ লিল্লাহ । ওয়াক্ফ আওলাদ কেবলমাত্র দাতার আওলাদ বা উত্তরসূরিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর ওয়াক্ফ লিল্লাহ সবার জন্য উন্মুক্ত ।

দেখা যায় জনহিতৈষণার আইনও প্রণীত হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। অর্থাৎ মুসলমানের এক আইন আর হিন্দুদের জন্য ভিন্ন আইন। বলে রাখা ভালো আমাদের অঞ্চলে বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক কোনো আইন বা বিধান নেই। তাদের জনহিতৈষণামূলক কাজ-কর্ম পরিচালিত হয় হিন্দু আইনের দ্বারা। এর পর ইংরেজ সরকার এদেশের জনহিতৈষণা কার্যক্রমকে সার্বজনীন করার উদ্যোগ নেয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত ও গৃহীত হয় 'ট্রাস্ট এ্যাক্ট' । এখনও আমাদের দেশে এই 'ট্রাস্ট এ্যাক্ট'-এর বিধান প্রচলিত আছে ।

এই আইন বা বিধি-বিধানের মধ্যে যেমন বড় আকারের দান বা জনহিতৈষণা কর্মকাণ্ড চলে আসছে, তেমনি আছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্ষুদ্র হিতৈষণার কর্মকাণ্ড। দান বা জনহিতৈষণা গর্বের বিষয় বলেই সমাজ তথা সমাজের মানুষের কাছে বিবেচিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। জনহিতৈষণার ওপর নির্ভর করে আমাদের সমাজে গড়ে উঠেছে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আরও অনেক জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই জনদরদী মানুষদের জনহিতৈষণার ফসল। উদাহরণ হিসেবে বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ, সিলেটের এম সি কলেজ, খুলনার ব্রজলাল কলেজ, বাগেরহাটের প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত আছে খুলনা শিশু-ফাউন্ডেশন, বরিশালের ডা. জিনাত মেমোরিয়াল হাসপাতাল, সিলেটের লায়ন্স শিশু হাসপাতাল, রাজশাহীর পঙ্গু শিশু নিকেতন ও ঢাকার বারডেমসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে অসংখ্য জনহিতৈষণামূলক প্রতিষ্ঠান। সেক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে লাইব্রেরি বা পাঠাগার বা জাদুঘর। রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার, খুলনার উমেশচন্দ্র পাঠাগার, রতন সেন পাবলিক লাইব্রেরি, সিলেটের মুসলিম সাহিত্য সংসদ ইত্যাদি। এছাড়া ভিন্নধর্মী বা বিচিত্রধর্মী জনহিতৈষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখ করা যায়, বরিশালের মনোরমা বসু মাসীমা স্মৃতি ট্রাস্ট, আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরি, সিলেটের রাগীব আলী ফাউন্ডেশন, খুলনায় মাটি-মা মনীন্দ্র-সাবিত্রী কল্যাণ ট্রাস্ট, হাজী মুহম্মদ মুহসিন ফান্ড, রাজশাহীর রাজশাহী এসোসিয়েশন, মুন্সি হাসরতউল্যাহ ওয়াক্ফ এস্টেট, চট্টগ্রামের প্রবর্তক সংঘ, যোগেশচন্দ্র রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম ইত্যাদি। দান, জনকল্যাণ, জনহিতৈষণা বা জনসেবা একটি গর্বের বিষয়, অহঙ্কারের কাজ। মানুষ তথা মানবতার কল্যাণে দানকে সমাজে দেখা হয় বিশেষ দৃষ্টিতে। আমাদের এই সমাজে এমন অনেক মহৎ ব্যক্তি ছিলেন বা এখনো আছেন যারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় জনকল্যাণে বিলিয়ে দিয়ে গর্ববোধ করতেন। আবার তাদের নিয়েও সমাজ গর্বিত হতো। সমাজ

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ অনেকেই এমন দানের কাজকে বাঁকা চোখে দেখেন। এর পেছনে অবশ্য যুক্তিযুক্ত কারণও আছে। দেশে অনেক পুরনো দেবত্র বা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি চলে গেছে এবং যাচ্ছে দুষ্টচক্রের হাতে। দখল হয়ে গেছে অনেক দেবত্র সম্পত্তি আর ওয়াক্‌ফ এস্টেট 'মোতমাল্লি' নামের স্বার্থান্বেষীদের দখলে। ফলে এইসব প্রতিষ্ঠান তার সেবার চরিত্র হারিয়ে কেবল হয়ে উঠেছে ব্যবসার প্রতিষ্ঠান।

আর ব্যক্তি দানতো এখন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। কে, কেন, কোন উদ্দেশ্যে দান করে তা এখন আর কেউ-ই সাদা চোখে দেখে না। দেখতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই এখন দান করা হয় কেবল কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। আগে যেখানে ছিল পারলৌকিক শান্তির প্রত্যাশা, এখন সে স্থান দখল করেছে ইহজাগতিক এবং সমূহ প্রাপ্তির লালসা। এই প্রাপ্তির তালিকায় এখন উঠে এসেছে 'সকল ক্ষমতার উৎস' জনতা অর্থাৎ ভোট। বলা যায় বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে দানের মধ্যে 'পলিটিক্স' ঢুকে পড়েছে। জানা নেই শোনা নেই হঠাৎ করে কোনো মহৎ (!) ব্যক্তি কোনো এলাকায় গিয়ে দেদারছে দান শুরু করে দিলেন কিংবা গড়ে তুলতে থাকেন প্রতিষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠান। এমনসব কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবেই জনমনে প্রশ্নের জন্ম দেয়। এবং এই দান বা বদান্যতাকে কেউ-ই সোজা চোখে দেখতে পারেন না।

অন্যদিকে কোনো কোনো এনজিও-র কিছু কর্মকাণ্ডও আজ প্রশ্নের মুখোমুখি। কোনো বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ পশ্চাদপদতাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দাতাদের কাছে উপস্থাপন করে তাকে দূর করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে তা দিয়ে নিজেদের জীবনযাপনের মান উচ্চহারে তুলে সাহায্যের নামে কিছু বেতনভুক্ত কর্মচারি রেখে যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তা নিয়েও নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে জনমনে। এদের 'সমাজ সেবা'র দাপটে স্থানীয়ভাবে ছোট কোনো উদ্যোগ দাঁড়াতেই পারে না। অন্য দিকে এদের এই বেতনভুক্ত কর্মচারিদের আচার-আচরণ সমাজের স্বেচ্ছাশ্রমে জনসেবা'র ধারণাকেই পাল্টে দিচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের অনেক কথিত জনহিতৈষণা উদ্যোগ আজ দেশের বৃহত্তম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। লবণ থেকে ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল ব্যবসাই এখন এনজিও-র কবলে। অর্থাৎ এইসব প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে নিবন্ধনসূত্রে সমাজ, দেশ তথা জনকল্যাণে নিয়োজিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

অন্যদিকে অনেক দেশীয় এবং বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশন বা ট্রাস্ট গঠন করে সমাজসেবা তথা জনহিতৈষণায় এগিয়ে আসছে। এদের কর্মকাণ্ডকেও অনেকে সোজা চোখে দেখতে পারছেন না। জনকল্যাণ বা দানের নামে এই অর্থ সরকারি ট্যাক্সের আওতার বাইরে রেখে প্রকারান্তরে এরা এদের পণ্যেরই প্রচার করেছেন। এ যেন বিজ্ঞাপনের এক ভিন্ন রূপ। এর বাইরে বাংলাদেশের অনেক 'মিডিয়া' (মুদ্রণ বা আকাশ) নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন সহায়ক তহবিল গড়ে তুলছে। উদ্দেশ্য কখনো কোনো সামাজিক পরিস্থিতির শিকার অসহায় কোনো জনগোষ্ঠি আবার কখনও কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগোত্তর জনগোষ্ঠির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো।

স্বচ্ছতা দেখানোর উদ্দেশ্যে এদের অনেকে প্রতিদিনের প্রাপ্তির (চাঁদা বা দান) যথাযথ হিসাবটি পর্যন্ত প্রচার করেন প্রতিদিন। সেই সঙ্গে চলে জনহিতৈষণা কর্মকাণ্ডের আকাশচুম্বি প্রচার। কিন্তু কত আয়ের কতটা কীভাবে ব্যয় হল তা থেকে যাচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। ফলে এমন জনহিতৈষণামূলক কর্মকাণ্ডও আজ মানুষ বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করেছে।

এই সব কিছুর মূলে আছে স্বচ্ছতার অভাব। এ স্বচ্ছতা অর্থের উৎসের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও। অনেক বড় বড় দানের ক্ষেত্রে আয়ের উৎস সম্বন্ধেও এখন অনেকে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ দেশ থেকে পাওয়া অঢেল অর্থ ব্যয় হচ্ছে বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থ হাসিলের জন্য। কোনো কিছুই আজ আর লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পারছে না।

সবার উপরে আছে সেবা প্রদান ও জনহিতৈষণার সঠিক দিকনির্দেশনা এবং জবাবদিহিতার অভাব। যার ফলে প্রচলিত জনহিতৈষণা কখনও দিকভ্রান্ত হয়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে গেছে।

এত প্রতিকূলতার পরও শ্রেণীবৈষম্যের সমাজে জনহিতৈষণা বা দানের প্রয়োজনীয়তা কখনও শেষ হয়ে যাবে না। কেবল বেঁচে থাকার জন্য আর্থিক সাহায্য-সহায়তা নয়, সুষ্ঠ জাতিগঠনেও এমন প্রতিষ্ঠান দিকনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করতে পারে। বাঙালির সবচেয়ে বড় ত্যাগ আর অর্জনের ঐতিহ্যবাহী ঘটনার স্মারক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মতো সংগঠন সে পথে গভীর প্রত্যয় নিয়ে দাঁড়াতে পারে।

এমনিভাবে গড়ে-ওঠা জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর, ভাষা আন্দোলন জাদুঘর কিংবা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর যুগ যুগ ধরে বাঙালিকে তার ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। জনহিতৈষণা, বদান্যতা বা দান যথার্থ অর্থে মানুষ আর মানবতার সেবায় টিকে থাকুক বিকশিত হোক এমন প্রত্যাশাই সবার।

ফিল্যানথ্রপি: সাহিত্যে ও পুরাণে

শো য়ে ব শা হ রি য়া র

ইদানিং 'ফিল্যানথ্রপি' একটি বিশিষ্ট বিষয় হিসেবে গুরুত্ব সহকারে উঠে আসছে। 'ফিল্যানথ্রপি'র অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ নতুন নয়, কিন্তু এ-ভাবে বিষয়সমূহ বিশেষ শিরোনামের অধীনে বিশিষ্টার্থে সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে দার্শনিক ভিত্তি পাওয়া সাম্প্রতিক সময়ের ব্যাপার। বিশ্বঅর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-নীতি তথা মানব-সমাজের অস্তিত্ব, গতিমানতা, প্রসার ইত্যাকার বিষয়গুলো, বৃহদর্থে, ফিল্যানথ্রপির অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমে যশস্বী তাত্ত্বিকের কাছ থেকে ফিল্যানথ্রপির অবয়ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু ধারণা নিই:

Philanthropy is the act of donating money, goods, time or effort to support a charitable cause, usually over and extended period of time and in regard to a defined objective, In a more fundamental sense, philanthropy may encompass any altruistic activity which is intended to promote good or improve human quality of life.

আর একজন তাত্ত্বিক স্টিভেন ই.মেইয়ার সংজ্ঞায়িত করেন এ-ভাবে: Most broadly, Philanthropy is the giving of one's time, talent and treasure to create improvement to the vitality of society.

বিভিন্ন সূত্র ও উৎস থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করে জনহিতৈষণার জন্য নিবেদিত হওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগতভাবে, সাংগঠনিকভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতার মাধ্যমে, রাজনৈতিকভাবে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, যৌথ প্রযোজিত স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে দুঃস্থ-মানবতা তথা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর পাশে সাহসী হিসেবে দাঁড়ানো যায়। আত্মসুখ-প্রত্যাশী মানুষ স্বভাব সিদ্ধভাবেই স্বার্থমগ্ন, আত্মকেন্দ্রিক হলেও প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে কিছুটা কোমল জায়গা থাকে, থেকে যায়, কিছু সবুজ তাজা ঘাস রয়েছে, কিছু না-কিছু স্নিগ্ধ রোদ আছে, শিশির-সিক্ত প্রাণ-কাতর সকাল আছে, তারা মানুষের কান্নার অংশী হতে চায়, ক্ষুধার অন্ন হতে চায়, স্বল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিরাময় হতে চায়, স্বপ্ন হতে ও দেখাতে চায়। অন্যের পাশে এসে দাঁড়ানোর শুভ অভিপ্রায়টা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে হতে পারে, আবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেও হতে পারে। তবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার অংশীদারিত্বটা নিঃসন্দেহে মহত্তর।

ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে কেউ কেউ জনহিতৈষণার অনুকূলে সময় ও মেধা ব্যয় করছেন, আবার কেউ ব্যয় করেছেন অর্থ-সম্পদ। তবে ব্যক্তিগত লাভালাভের নিমিত্তে

এটা কেউ করে না। Philanthropy ও Charitable শব্দ দুটি একই অর্থ বহন করে। চেরিটেবল সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের পরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ Their work is deemed charitable if their resources are directed to 'religious, educational, charitable, scientific, literary, testing for public safety to foster national or international amateur sports competition or prevention of cruelty to children or animals'

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

* ফিল্যানথ্রপির মৌলিক উদ্দেশ্য একটা অপেক্ষাকৃত উন্নত, স্বাস্থ্যসম্মত ও আনন্দ মুখর এক সমাজ তৈরিতে অবদান রাখা।

* সামাজিক স্থায়ী সমস্যা সমাধানে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে আম-জনতার মধ্যে সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রস্তুত করা।

* ফিল্যানথ্রপি গ্রীক ভাষার দুটো শব্দ Love এবং humankind থেকে এসেছে।

খ.

অপার সৌন্দর্যের নাম যদি হয় সাহিত্য, অনিঃশেষ স্বর্গীয় আনন্দের অপর নাম যদি হয় সাহিত্য, শুদ্ধতার-সততার-সত্যতার আরেক নাম যদি হয় সাহিত্য,– মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, কল্যাণ প্রত্যাশা, মানবজাতির জন্য সুখ-সমৃদ্ধি প্রার্থনাও নিঃসন্দেহে জনহিতৈষণার পদবাচ্য। সভ্যতার শুরু থেকে আজতক মহান সব কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ সামাজিক-রাজনৈতিক তথা ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে শাণিত-বিবেকে প্রতিবাদ করেছেন এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করেছেন। যখনই কোনো অনুশাসন, কোনো আদর্শ, কোনো বিধির যাঁতাকলে মানব-সত্তা নিষ্পিষ্ট হয়েছে তখনই বৈশ্বিক ঔদার্যে মানবাত্মার অবাধ মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন কোনো না কোনো মহৎ শিল্পী ।

সাহিত্যে পরার্থপরতা কোনো অর্থেই বস্তুগত নয় বা এর কোনো সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডও নেই। দুঃস্থ দরিদ্র মানুষের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি করার জন্য শৈল্পিক ও সাহিত্যিক পরার্থপরতা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে কোনো কাজে আসবে না সত্য, তবে যুগে যুগে শিল্প-সাহিত্য গোটা মানব-জাতির স্বপ্নের প্রতীক, বেঁচে থাকার ইন্ধন তথা মানব-কল্যাণকামনার পার্থিব প্রত্যাদেশ। কবি যখন বিশ্বাসের পরম পবিত্রতা নিয়ে উচ্চারণ করেন:

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে-
'মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;

তখন দীনহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানবেতর জীবন-বিপর্যয় থেকে ন্যূনতম মানসম্মত মানব জীবনে সমুন্নতির প্রত্যাশাই ধ্বনিত হয়। কবির আকাঙ্ক্ষার গভীরে দেশহিতৈষণা

বা মঙ্গলচেতনার অন্তর-প্রেষণা ক্রিয়াশীল ছিল সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। এই একই কবিতায় কয়েকটি চরণ শেষে মানবজীবনের জন্য একটি ঐশ্বরিক প্রাপ্তির জন্য কবি প্রার্থনা করেছেন:

এ দৈন্য-মাঝারে, কবি
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।।

স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের ছবি প্রত্যাশার আগে কবি মানুষের মৌলিক চাহিদার পূরণের লক্ষ্যে বেশ চড়াকণ্ঠে 'অন্ন-প্রাণ-আলো-মুক্ত-বায়ু' স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ুর অধিকার অর্জনের নিমিত্তে দাবি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের জীবনের হত-দরিদ্র-দশা তার অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর মানবিক চেতনা-বোধ-সম্ভূত সহমর্মিতা থেকে মানুষের জীবনধারণের অনুকূলে এ-চাহিদা পেশ করেছেন।

একজন কাব্যস্রষ্টার জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে আশা-নিরাশা, হতাশা-বিষাদ-দ্বন্দ্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, তারপর পদে পদে থাকে 'রাজসভা-ষড়চক্র'। গোপন আঘাতও হয়তো-বা তার সঙ্গী হয়, অবিশ্বাস, অনাদর, অপমানে কবির অন্তরাত্মা রক্তাক্ত হয়, বিশ্লিষ্ট হয়, ক্ষত-বিক্ষত হয়, তারপরও স্রষ্টার নির্মাণ-নৈপুণ্য থাকে অক্ষত, অপার রহস্যে-ভরা শিল্প-সঙ্গীত-সুষমা থাকে পরিপূর্ণ পাত্রে। ব্যক্তিজীবনে দহনদগ্ধতা মানসিক বৈকল্য, আঁধি, দুঃসহ যন্ত্রণা কোনো কিছুই কবির সৃষ্টিমগ্নতার ওপর কোনোরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না:

জীবন মন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।।

নিজে গরলের অসহ্য বেদনা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে লব্ধ-অমৃতকে অন্যের কল্যাণ-মানসে নিঃস্বার্থভাবে দান করাই একজন স্রষ্টার প্রকৃত পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের প্রায় অপঠিত কবিতা 'কাব্য'-তে এই নিঃস্বায়নের বিপুল ঐশ্বর্য রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতাখানি পরবর্তী সময়ে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে; চুরির অভিযোগে কারাগারে মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন বন্দী বজ্রসেনের রূপ ও ব্যক্তিত্বে অভিভূত ও প্রেম-বিগলিত শ্যামা তাকে কৌশলে মুক্ত করে। এবং অনাগত নতুন জীবনের স্বপ্নে ও মোহে বজ্রসেনের সঙ্গে তারা পালিয়ে যায়। বজ্রসেন বুঝতে পারে এই নারীই তার জীবন-ত্রাতা। অনেক অনুনয়ের পর যখন সত্যকাহিনী বজ্রসেন অনুধাবন করল তখন শ্যামাকৃত পাপকর্মে ঘৃণায় জ্বলে উঠল তার হৃদয়। সে বুঝল যে শ্যামার প্রেমে ব্যর্থ উত্তীয় শুধুমাত্র তার ভালবাসার পাত্রী শ্যামাকে স্বর্গীয় সুখের অমৃত দান করার মানসে মিথ্যা চুরির অপকর্মের দায় স্বীকার করে নিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন করে। শ্যামার কণ্ঠে সে কাহিনীর প্রতিধ্বনি:

–বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে

তব চুরি-অপবাদ নিজে স্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ!

এ-এক মহৎ আত্মোৎসর্গ। ভালোবাসাধনের হৃদয়িক আনন্দে নিজেকে বিলিয়ে দেবার মধ্যে যে পরম সুখ উত্তীয় সে সুখের সন্ধান দিয়ে গেছে সমস্ত মানুষের কাছে। বলা যেতে পারে ভালবাসাও উত্তীয়র কাছে ঋণী। পরের জন্য নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দেবার এমন পরাকাষ্ঠা আর কোথায়?

একজন কবির কণ্ঠে পরিশুদ্ধ আবেগের উষ্ণতায় 'গাহি সাম্যের গান–/মানুষের চেয়ে বড় নাই, নহে কিছু মহীয়ান' উচ্চারিত হওয়ার অর্থ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব ঘোষণা করা এবং মানবিক কল্যাণের কারণেই একটু উত্তেজনার মিশ্রণ থাকলেও সর্বহারা নিঃস্ব শোষিত মানুষের ফলবান জীবনাকাঙ্ক্ষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে:

মুক্ত-কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান–
জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান।

এই উত্থান প্রত্যাশার নেপথ্যে একটাই উদ্দেশ্য: নির্বিচার শোষণের অবসান এবং মানব-সমাজে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির প্রত্যাবর্তন।

কবি কাজী নজরুলের পরিবর্তন-উন্মাদনা যুক্তির উর্ধ্বে। তাঁর কাল ছিল ভয়াবহভাবে অস্থির, টালমাটাল, উত্তেজনাময়, সময়ের চেয়েও বেশি তিনি উদ্ভ্রান্ত, উৎক্রান্ত, অধীর অসংযত, অসংবৃত, ধৈর্যহীন। সাধারণ মানুষের অশেষ প্রতিকারহীন দুঃখ-কষ্ট তাঁর ভেতরের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করে প্রায় ছন্নমতিতে পরিগণিত করেছিল। অস্থির উৎক্রান্তির বিনিময়ে সততার সাথে তিনি চেয়েছিলেন দুধে-ভাতে মানব-সন্তানেরা বেঁচে-বর্তে থাকুক:

প্রার্থনা ক'রো– যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।

গভীর বিশ্বাসের ঘনত্ব নিয়ে শুঁকলে উদ্ধৃত দুটি পংক্তির প্রত্যেক শব্দের ভেতর থেকে 'রক্ত'-এর উষ্ণ ও প্রতিশোধাত্মক গন্ধই এসে নাকে লাগবে। কবির ক্ষোভ, রোষ, আক্ষেপ, ক্রোধ, কোপ এ-সবের পেছনে একটাই লক্ষ্য অত্যাচার আর শোষণের উচ্ছেদ সাধন এবং মানুষের হিতৈষণা।

মানবজীবনের সমৃদ্ধি ও সমুন্নতি কামনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশা, মানবিক বিকাশের নিশ্চিতি নজরুলের কবি-সত্যের মৌল ভিত্তি:

(ক) গাহি তাহাদের গান–
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি' ফসলের ফরমান।

(খ) মোদের চোখে বিশ্ববাসীর

স্বপ্ন দেখা হোক সফল
আমরা ছাত্রদল ।

জীবনানন্দের কবিতায় সিদ্ধান্তসূচকতা স্বল্প । তাঁর কবিতায় হতাশা-বিষাদ-জাতীয় নেতি-চর্যা থাকলেও সংগোপনে তিনি সভ্যতার শেষ পরিণতিকে ধ্বংসাত্মকতায় প্রত্যাশা করেননি । আশার আলো ক্ষীণ বা প্রায়-অদৃশ্য হলেও তাঁর অনেক কবিতার প্রেরণা হল 'শক্তি' । জীবনানন্দ তাঁর জন্মগত আত্মমগ্ন স্বভাবের কারণেই মৃদুমন্দ-ভাষী, আয়ত শব্দসন্ধানী, মায়াবী, স্নিগ্ধ অথচ দূর-সংবেদী চিত্রকল্পে স্বচ্ছন্দ এবং চির-রাহস্যিক কুয়াশার আবরণে কৌতূহল-প্ররোচক । তারপরও জীবনানন্দ দাশ মানবমুক্তির কথা ভেবেছেন হৃদয়িক গভীর মন্থন থেকে:

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে-এ-পথেই পৃথিবীর ক্রম মুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে ।

পুরাণে কল্যাণকামিতা

রোগ-শোক-মৃত্যু-জরা তথা প্রকৃতির অবাধ খেয়ালিপনা, অনিশ্চয়তার প্রতিবন্ধকতা ইত্যাকার প্রাকৃতিক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায় অনুসন্ধান থেকে মিথের জন্ম । প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ছোট-খাটো ঘটনা থেকে অসংখ্য বিশালমাত্রিক ঘটনার নেপথ্যিক কারণসমূহ অজ্ঞাত থাকার কারণে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বেঁচে থাকার দুর্বার যুদ্ধে ও সংগ্রামে মানুষ তার উর্বর কল্পনা-শক্তির সহযোগিতায় সংঘটিত ঘটনাগুলোর এক ধরনের সরল ব্যাখ্যা যুগে যুগে উপস্থাপন করে সান্ত্বনা পেয়েছে । সে ব্যাখ্যাসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে কোনো না কোনো ঘটনা বা চরিত্রের মাধ্যমে । সে ঘটনাসমূহের অন্তরালে অন্য কোনো শক্তির অস্তিত্বকে বিশ্বনিয়ন্তার আধার হিসেবে বিশ্বাস ও পবিত্র জ্ঞান করা এবং মানুষ-মাত্রই সেই শক্তির ক্রীড়নক এবং সেই মানব-ভাগ্যের নিয়ন্তার সন্তুষ্টি বিধানের ওপরই মানুষের জীবন-যাপন ও সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ভবিতব্য নির্ভর করে । এই বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর পুরাকালে যে সব কাহিনী, যে কাহিনীগুলো মিথিক্যাল; তৈরি হয়েছে তাতে দেবতার নিরঙ্কুশ আধিপত্য বা ক্ষমতা নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিষ্ঠা পেলেও এর অভ্যন্তরে মানুষের দুর্মর সংগ্রামশীলতা ও মানুষের জন্য আত্মত্যাগ ও মানব-কল্যাণ-সাধন-চেতনা অভিষিক্ত হয়েছে ।

জিউসের মস্তিষ্ক থেকে জাত এথিনা । ঘোড়ার লাগামের আবিষ্কর্ত্রী । এথিনা ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিলেন শুধুমাত্র মানুষের জন্য । আর সমুদ্র দেবতা পসাইডন মানুষকে প্রথম একটি অশ্ব দান করেন । কবিতায় তাঁর অবদানের উচ্চকণ্ঠীয় স্বীকৃতি:

প্রভু পোসাইডন, তোমার কাছ থেকে এই আমাদের গর্ব,
শক্তিমান অশ্বদান, তরুণ অশ্বদল ।

এ্যাপোলো মানুষকে প্রথম শেখালেন শুশ্রূষার সুষমা । ডেফিতে এ্যাপোলো উপকারী দেবতা । মানুষ এবং দেবকুলের মধ্যে সরাসরি সংযোগ-স্থাপনকারী । মানব-দৈব ইচ্ছা সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দানকারী । হারমিস ছিলেন বাণিজ্য এবং বিপণীবিতানের দেবতা এবং বণিকদের রক্ষাকারী ।

হেফাস্টুস ও এথিনা দু'জনে মিলে কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষণা করেন । এই শিল্পই কৃষির পাশাপাশি সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে । এথিনা তাঁতীদের এবং হেফাস্টুস কামারদের রক্ষাকারী ।

অলিম্পাসের গ্রেস ও মিউজরা সৌন্দর্য ও করুণার দল । এরা যখন এ্যাপোলোর বীণার সুরে তাল মিলিয়ে নাচতেন এবং যার গৃহে উপস্থিত হতেন তার গৃহে সুখ আবির্ভূত হত । মিউজ সম্পর্কে হেসিয়ড এর অভিমত: এরা সকলে অভিন্ন শরীর । মিউজরা যাকে ভালোবাসে তারা সুখী হয় । কোনো মানুষের হৃদয় যখন ভরে ওঠে দুঃখশোকে, তখন যদি মিউজরা গান করেন নিমেষে উন্মথিত হৃদয় প্রশান্ত হয় সুরের মাধুর্যে, মূর্ছনায় । মানুষের ভেতরের কষ্টবোধটা লাঘবের মহান দায়িত্বটা মিউজরা এ-ভাবে পালন করে । মানুষের জন্য একজন ত্যাগী বীর ছিলেন প্রমিথিউস । টাইটান প্রমিথিউস ছিলেন সততা ও ন্যায়ের প্রতীক । দেবরাজ জিউস প্রমিথিউসকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন । তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন । মানুষকে অপদস্থ, কোনো-না-কোনোভাবে ব্যতিব্যস্ত বা অধীন করে রাখার সর্ববিধ ব্যবস্থাদির আয়োজন করেছিলেন জিউস । তাঁর বিশ্বাস, মানুষকে সুযোগ-সুবিধা দিলে একদিন সে ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠবে । সে কারণে পৃথিবীময় অসংখ্য হিংস্র প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জিউস । আর মানব-প্রেমী প্রমিথিউস পশ্চাদপদ মানব-জাতির সমুন্নতির জন্য স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে মানুষকে দান করেছিলেন । প্রমিথিউসকেন্দ্রিক দু'ধরনের ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে পৌরাণিক কাহিনীতে । প্রথমত, মানব-সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সাথে প্রমিথিউসও সংশ্লিষ্ট ছিলেন । জীবন-অস্তিত্বের অনুকূলে গুণবাচক সত্তাগুলো, যেমন শক্তিমত্তা, দ্রুতগতি, নির্মোক, চাতুর্য, পাখনা, লোম ইত্যাদি অন্য প্রাণীদের বিলি-বণ্টনের পর মানব-জাতির জন্য তেমন কিছু অবশিষ্ট না থাকায় মানব-দরদী প্রমিথিউস দূরঋদ্ধ একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে মানব-জাতির জন্য অমরত্বের যাত্রাপথের শুভ সূচনা করে ফেলেন । প্রমিথিউস মানুষকে দেবতাসুলভ দেহাবয়ব দিয়ে তৈরি করলেন । তারপর স্বর্গে গিয়ে সূর্যের আলোতে একটা মশাল জ্বেলে পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিলেন । এই আগুনই মানুষের শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা, সেই থেকে অগ্নিযুগের শুরু এবং শুরু মানুষের বিরামহীন অগ্রযাত্রা এবং সভ্যতার সমুন্নতি । অন্য ঘটনায় বলা হল: মানব- জাতির কল্যাণ কামনায় প্রমিথিউস একটি ষাঁড় শিকার করে, পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়ে সেই ষাঁড়টিকে দস্তুর-মতো পুড়িয়ে মানুষকে খাবার হিসেবে উপহার দিলেন । সেই প্রথম

মানুষের আগুনকে জানা, আগুনের ব্যবহার জানা। এই আগুনকে ব্যবহার করে মানুষ অস্ত্র বানাতে শিখল, ব্যবহার্য অনেক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করল। মানবসভ্যতাকে কয়েক ধাপ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করে নিয়ে গেল।

মহাকবি ভার্জিলের 'ইনিড' কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইনিয়াস ট্রয়ের যুদ্ধে পরাজয়ের মুখে জননী আফ্রোদিতির নির্দেশক্রমে দেশান্তরী হন। স্ত্রী, সন্তান কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর আর অক্ষম প্রায়-পঙ্গু পিতাকে কাঁধে বহন করে বিধ্বস্ত-প্রায় মাতৃভূমির ধ্বংসযজ্ঞকে সাক্ষী রেখে ইনিয়াস স্বজাতির জন্য নতুন ভূ-খণ্ড অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। আপন জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা, প্রতিষ্ঠা প্রদান করা, সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখার ইনিয়াসের পরিশুদ্ধ অভিপ্রায় নিঃসন্দেহে কল্যাণকামিতা, হিতৈষণা-প্রসূত।

সত্য-দেবতা এ্যাপোলোর পুত্র এসক্লেপিয়াস ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাবান পৌরাণিক চিকিৎসক। মা করোনিসের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে মাতৃ-জঠর থেকে এসক্লেপিয়াসকে বের করে আনেন এ্যাপোলো। সুচিকিৎসক কিরণের কাছে লালিত-পালিত হন। পরবর্তীকালে তিনি মন্ত্রসিদ্ধ অব্যর্থ চিকিৎসক হিসেবে প্রশংসিত হন। দেবী এ্যাথিনা তাকে দানব গর্গনের দেহের উভয় পার্শ্ব থেকে সংগৃহীত দুই পাত্র মন্ত্রপূত রক্ত দান করেন। এই মন্ত্রপূত রক্তের মাধ্যমেই রোগগ্রস্ত মানুষকে সুস্থ করতে ও মৃত মানুষের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে শুরু করেন।

মিসরীয় দেবতা ওসিরিস সূর্য ও ফসলের দেবতা। মিসরীয়দের বিশ্বাস যে, সূর্যের আলো ও ফসলের দেবতা ওসিরিস। তিনি প্রথম জমির ওপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন এবং অবারিত মৃত্তিকা থেকে জীবন-ধারণের কৌশল শিখিয়েছিলেন।

অনুবীক্ষণিক অন্বেষণ চালালে হয়তো বাংলা সাহিত্যেও পরার্থবাদী শুভচিন্তার বিস্তৃত প্রেক্ষণভূমির সাক্ষ্য মিলবে। সে অনুসন্ধান আমার পক্ষে আপাতত সম্ভব নয়।

মানুষের কল্যাণ, মঙ্গল-চিন্তা ব্যতিরেকে কোনো আদর্শই শুদ্ধশ্রদ্ধা পেতে পারে না। আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ পরিসর থেকে আত্মাকে মুক্ত করতে জানলেই মানুষ মহত্ত্ব অর্জনে সক্ষম হয়। যুগ থেকে যুগান্তরে নৈতিকতা তথা মানবিক শুভবুদ্ধি বা শ্রেয়োবোধ, পরহিতব্রতই মানবসভ্যতার টিঁকে থাকার অন্তর্লীন জ্বালানি শক্তি। আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা, সাধনা, দক্ষতা, অন্বেষণ, বৃদ্ধি, ঋদ্ধি-প্রেরণা হোক মানুষের জন্য, মানবতার জন্য, সার্বজনীন সভ্যতার জন্য।

ফিল্যানথ্রপির প্রয়োজনীয়তা: বর্তমানের প্রেক্ষাপটে

ফ রী দু ল আ ল ম

ইংরেজি 'ফিল্যানথ্রপি' (PHILANTHROPY) কথাটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মানবপ্রেম, লোকহিতৈষণা, জনসেবা ইত্যাদি। কিন্তু নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার লোক একালে খুঁজে পাওয়া ভার– বিষয়বুদ্ধিতে টনটনে না হলে আজকালকার সমাজে টিকে থাকা কষ্টকর। এ কারণে অতিমাত্রায় বৈষয়িক হয়ে উঠেছে আমাদের কালে যথার্থ লোকহিতৈষণা– ইদানীং অনেকের ভিজিটিং কার্ডেও মুদ্রিত থাকে 'ফিল্যানথ্রপিস্ট' বা সমাজসেবী বিশেষণটি, যদিও ভদ্রলোকটি কখন, কোথায়, কাদের কী সেবা করেছেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে একটি উচুঁমাপের হাসি হেসে নিরুত্তর থাকেন। বর্তমানে ফিল্যানথ্রপি বিষয়টিকে বহুলাংশে অর্থহীন করে ফেলা হয়েছে এবং অর্থকরী পেশা হিসেবেই রূপান্তরিত করে নেয়া হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনামলে লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সমাজের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে গ্রাম ও শহরের অভিজাত ও অভিজাত নন এমন ব্যক্তিবর্গ অবদান রেখেছেন।

অতীতের তুলনায় বর্তমান শতকে জনসাধারণের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও জীবনযাত্রার মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সমাজের কার্যকরী ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতেই কেন্দ্রীভূত– এরা ব্যাপক ও সুদক্ষ প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তা, রুচি এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সক্ষম। জনসাধারণের শিক্ষার সুযোগ আগের তুলনায় বাড়লেও সমাজের সাংস্কৃতিক সম্ভোগের সুবিধা আজও অভিজাত ও বিত্তবানদের মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ। দেশের বিশালসংখ্যক লোক এখনও প্রায় নিরক্ষর, এবং যে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেও বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্যের অনুশীলনে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের সুবন্দোবস্ত করা এ যাবৎ সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। স্বল্পশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ যদি জটিল চিন্তা এবং সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকেন তাহলে উৎকৃষ্ট ও যথার্থ শিক্ষার যে সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত রয়েছেন তাকেই দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রকৃষ্ট উপায় হল– সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে যুক্তি, সহযোগিতা এবং সহনশীলতার আদর্শে শিক্ষিত করা যাতে করে তারা নিজ নিজ ইচ্ছাকে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করতে পারেন, নিজের

বিকাশকে সর্বজনের বিকাশের সঙ্গে মেলাতে উদ্যোগী হন, যান্ত্রিক ঐক্যের পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের সুষম সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। এ কাজে তাদের যিনি সহযোগিতা করবেন তাঁকেই প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্ট বলা যেতে পারে।

অনেক মানুষ যখন এক সমাজের অন্তর্গত হয়ে বাস করেন তখন তাদের প্রত্যেকের পক্ষে প্রতিটি সামাজিক সিদ্ধান্ত নিরূপণে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রয়োজন ঘটে। যথাযথ প্রতিনিধি নির্বাচন করে নিজেদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রতিনিধি নির্বাচনের জ্ঞান থাকতে হবে। উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করার জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রয়োজন হবে– প্রতিটি নাগরিকের মনে ব্যক্তিগত অধিকারবোধ গড়ে তোলা, স্বাধীন চিন্তার শক্তি, সমাজের বিচিত্র ও জটিল বিষয়াদি ও সমস্যাদি বিষয়ে জ্ঞান– সেইসাথে থাকতে হবে প্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও ক্রিয়াকলাপ বিচার করার সামর্থ্য। আত্মপ্রত্যয়, স্বাধীন চিন্তা, জ্ঞান ও যুক্তিশীলতা অনুশীলনের ফলে মানুষ তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদিকে সমাজের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে শেখে, উত্তেজনা বা আক্রোশবশত কিংবা প্রতিশ্রুতির মোহে অযোগ্য ব্যক্তিদের নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত না করে জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তিদেরকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করে– প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ ও সিদ্ধান্তগুলোকে নিজেদের সুচিন্তিত সমালোচনার দ্বারা সর্বসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারে। জনসাধারণকে সুসংস্কৃত করা– তাদের মনে জ্ঞান, স্বাধীনচিন্তা, বিচারশক্তি, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুণকে বিকশিত করা হচ্ছে একজন ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর অবশ্য কর্তব্য।

একজন ফিল্যানথ্রপিস্ট জনসাধারণের মনের এ ধরনের বিকাশ ঘটালে তা হবে সংস্কৃতির উৎস, বিকশিত মনের বিচিত্র প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতির উপাদান। যে সমাজে যত বেশি সংখ্যক লোকের মনের বিকাশ ঘটবে সে সমাজে শুধু যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই তত দৃঢ়মূল হয়ে উঠবে তা নয়, সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনও তত সমৃদ্ধতর হবে। একটি দেশে, একটি সমাজে ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর প্রয়োজন এবং গুরুত্ব অপরিসীম। ফিল্যানথ্রপিস্ট চেষ্টা করেন সর্বসাধারণ যেন তাদের সংস্কৃতির প্রতি অনুগত থাকে। যথার্থ ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর অনুপস্থিতিতে কোনো সমাজে সংস্কৃতি শুধুমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে– সেই সমাজের সংস্কৃতির প্রতি সমাজের সর্বসাধারণের আনুগত্য গড়ে-ওঠা কঠিন হয়। ফলে সেই সংস্কৃতিকে যখন কোনো বহিরাগত শক্তি আক্রমণ করে, সাধারণ মানুষ তাকে রক্ষা করার জন্য কোনো আগ্রহ বোধ করে না; তা সহজেই পর্যুদস্ত হয়। অতীতে বহু প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির এইভাবেই বিলোপ সাধিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক সম্পদে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণ এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের মাঝখানে শুধু ব্যবধান গড়ে ওটে না– বরং তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের মনোভাবও প্রবল হয়ে ওঠে। তারই সুযোগ নিয়ে সংস্কৃতিবিরোধী তথাকথিত 'গণনেতা'-রা আবির্ভূত হন, এবং প্রলোভনের মাধ্যমে

কৃত্রিম জনসমর্থন সৃষ্টি করে সমাজ থেকে প্রকৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। যেহেতু জনসাধারণ তাদের সংস্কৃতিকে যথাযথ মূল্য দিতে শেখে না সেহেতু নিজস্ব সংস্কৃতির বিলোপের দ্বারা তারা যে নিজেদের বিকাশের সম্ভাবনাকেই উচ্ছেদ করছে– এ কথা তারা বুঝতে পারে না। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে 'ডিজুইস' সংস্কৃতির আক্রমণ ও তার চলমান পরিণতি এহেন পরিস্থিতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিশ শতকের শেষের দিক দিয়ে আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিতসংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে; কিন্তু সেই স্বল্পশিক্ষিতদের অধিকাংশেরই বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশক্তি বা রুচির মান বেশি উচুঁতে ওঠার সুযোগ পায় না। তারাই যখন সংখ্যার জোরে এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রধান খরিদ্দার হয়ে উঠলেন, তখন কোনো বিদগ্ধ এবং বিবেকবান সংস্কৃতিকর্মীর পক্ষে তাদের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই শ্রেণীর স্বল্পশিক্ষিত মানুষেরা সুস্থ সাংস্কৃতিক বিষয়াদির চর্চার চাইতে রগরগে বিষয়ে অনেক বেশি কৌতূহলী; চিন্তাশীল সাহিত্যকর্ম পাঠের চাইতে সংক্ষিপ্তবসনা সুন্দরীদের ছবি দেখে এরা অনেক বেশি আরাম পায়। সুতরাং এদের চাহিদা মেটাতে এগিয়ে আসলেন 'ডিজুইস'-এর ব্যানারে গণতোষক সংস্কৃতিসেবীর দল– যাদের হাতিয়ারের চাহিদা পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন অতিসাম্প্রতিককালে আবির্ভূত বাংলাদেশী বিভিন্ন এফ.এম.রেডিও স্টেশনের রেডিও জকি (আর.জে.)-র দল।

আমাদের দেশে জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি(?) ঘটলেও তার সঙ্গে তুলনীয় মানসিক বিকাশ ঘটেনি। আধুনিকতম বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে সংস্কৃতির উপাদানও আর ব্যক্তিমনের অনন্য সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যন্ত্রজাত অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যসকলের মতো কারখানার একই ছাঁচে তৈরি হয়ে পাইকারীভাবে বাজারে বিক্রিযোগ্য পণ্যে পর্যবসিত হয়েছে। যেহেতু বাজারের মাল ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী কারখানায় তৈরি করানো হয়ে থাকে– আর যেহেতু স্বল্পশিক্ষিতরাই বাজারের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রেতা, সে কারণে বর্তমানে সাংস্কৃতিক উৎপাদন প্রধানত এদের রুচির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আজকের দিনের লেখক, শিল্পী, গায়ক, সম্পাদক, প্রকাশক, রেডিও কিংবা টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষ, চলচ্চিত্রের প্রযোজক এবং পরিচালক নিজের রুচি বা শিল্পবোধের উপর নির্ভর করতে অপারগ– প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এদেরকে জনসাধারণের চাহিদার হিসেব করে চলতে হয়। সব সংস্কৃতিতেই অল্পকিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি সংস্কৃতির স্রষ্টা– বাকি সবাই ভোক্তা; বর্তমানের ভোক্তাদের মন নিতান্ত অপরিণত– অথচ তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে তাদের মন জয় করতে পারলে তবেই কোনো লেখক, প্রকাশক অথবা প্রযোজক রাতারাতি বিত্ত এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন। বর্তমানের গণচাহিদাকে অগ্রাহ্য করে নিজের বিবেক এবং প্রেরণা অনুযায়ী কিছু সৃষ্টি করে তাকে সমাজের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা বর্তমানকালে ব্যর্থ এবং পণ্ডশ্রম মাত্র। গণচাহিদার প্রেক্ষিতে শিল্পীসম্প্রদায় রুচির চাইতে বাজার সম্বন্ধে

বেশি সচেতন। তাঁরা সৃষ্টি করেন সৃজনের তাগিদে ততটা নয়– যতটা বিশালসংখ্যক ক্রেতার সংখ্যা স্মরণে রেখে। যে দু-চারজন বিবেকবান শিল্পী এবং মনীষী স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাঁদের পথে প্রলোভন অসংখ্য –তাঁদের ওপরে চাপের শেষ নেই। সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হওয়ার ফলে তাঁদের শিল্পকর্ম, সাহিত্যকর্ম ক্রমেই বিরস এবং দুর্বোধ্য অনুভূত হচ্ছে স্বল্পশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ তথাকথিত সংস্কৃতিভোক্তাদের কাছে। এ ভয়াবহ পরিস্থিতি আমাদের প্রকৃত সংস্কৃতিকে প্রচণ্ড শক্তিতে অন্ধকারের অতল খাদে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে– এ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের দেশে সত্যিকারের ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর আজ খুবই প্রয়োজন। প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্ট তাঁর প্রদর্শিত পথে, তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণকে আত্মসচেতন করে তুলতে পারেন– আত্মধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

উপরের কথাগুলোর প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন উঠে আসতে পারে, তা হচ্ছে জনসাধারণ বিদ্যার্জনের পরও কেন যথার্থ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয় না? তার একটা কারণ, অধিকাংশ মানুষই প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ পায় না; ফলে রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ পড়ে উপভোগ করার সামর্থ্য আজও তাদের অনায়ত্ত– শেকস্‌পিয়র-মিল্টন-কীট্‌স্ তো অনেক দূরের কথা। অধিকাংশ মানুষই এস.এস.সি. পাশ করে পরবর্তী বছরগুলোতে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করে তার ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অংশীদার হবার সামর্থ্য অর্জন করে না। ফলে তাদের উভয় কূলই নষ্ট হয়ে যায়– নিরক্ষর জনসাধারণের অমার্জিত ভোগশক্তিতে তারা বঞ্চিত থাকে আবার উচ্চ সংস্কৃতি বা প্রকৃত ও যথার্থ সংস্কৃতিও তাদের অনায়ত্ত থেকে যায়। তখন 'ডিজুইস' সংস্কৃতিই তাদের একমাত্র সম্বল ও সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ পরিবারের যেসব ছেলেমেয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়, তাদের অবস্থা আরও করুণ। উচ্চশিক্ষা ক্রমেই এই তরুণদের আপন পরিবার ও সমাজ থেকে বিযুক্ত করে। লেখাপড়ার জন্য যেটুকু নিভৃতি প্রয়োজন– সাধারণ সংসারে তা একান্তই দুর্লভ। তা ছাড়া কাব্য, দর্শন, চিত্রকলা, উচ্চস্তরের সঙ্গীত ইত্যাদির যে রস, তার সঙ্গে তাদের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন একবারেই অপরিচিত থাকে। তাদের সমবয়স্ক অন্যান্য সাধারণ ঘরের লেখাপড়া-না-করা তরুণরা যখন উপার্জনে [তথাকথিত ঠিকাদারী বিজনেস] ব্যস্ত, তখন এই স্বল্পসংখ্যক তরুণরা স্বাবলম্বী না হয়ে লেখাপড়ায় ব্যাপৃত থাকার ফলে নিজেদের সমবয়সীদের কাছে ঠাট্টার পাত্র হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে [প্রাইভেট এবং পাবলিক উভয়ই] পড়তে গিয়ে তারা আবিষ্কার করে যে, বিত্তবান পরিবারের ছাত্রদের তুলনায় সে-জগতে তারা নিতান্ত বেমানান– পাঠ্যপুস্তকের বাইরে মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় হয় না। তারা পারিবারিক অথবা আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের আবহাওয়ায় বড় হয়নি; তাদের চোখ এবং কান ভালো ছবি দেখে অথবা সঙ্গীতসুধা শুনে অনুশীলিত নয়; পোশাক, খাদ্য-পানীয়, আচার-ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা সব ব্যাপারেই তাদের স্থূল রুচি পদে-পদে প্রকাশ

পায়– শাহবাগের আজিজ মার্কেট থেকে টি-শার্ট কিনে গায়ে জড়িয়েই তারা জাতে উঠে যাবার প্রয়াস চালায়। উচ্চশিক্ষা তাদের মনে আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার না করে হীনমন্যতাবোধকেই দৃঢ়মূল করে। একদিকে তারা বিত্তবান সহপাঠীদের অনুকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে; অন্যদিকে পদে-পদে আত্মাবমাননা এবং ব্যর্থতার যন্ত্রণায় তারা সত্যিকারের সংস্কৃতির প্রতি মানসিকভাবে বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। মূল গ্রন্থ পড়ে আনন্দ পাবার শক্তি তারা অনেকেই সংগ্রহ করতে পারে না– অথচ বুদ্ধিজীবী সমাজে কল্কে পাবার লোভে তারা প্রাণপণে মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং সরলীকৃত ব্যাখ্যা পড়ে বৈদগ্ধ্য অর্জনের ব্যর্থ প্রয়াসে আসর সরগরম করে তোলে। এদের পক্ষে তাই কোনো সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, কোনো প্রাণবান সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে না। সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ধারাকে রোধ করতে এই শ্রেণীর শিক্ষিতরা অসমর্থ। সেই সামর্থ্য অর্জন করার জন্য যতখানি সুযোগ এবং সময় প্রয়োজন তা তারা পায়নি। দু-চার পুরুষ ধরে দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-চারুকলার চর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ এবং অবসর করে দেওয়া সম্ভব একমাত্র প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর পক্ষে– তিনিই তথাকথিত শিক্ষিতদের প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন– আত্মাবমাননার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে, তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। অতীতে আমরা এহেন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তকে সাফল্য পেতে দেখেছি।

এবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক। স্বাধীনতার সাড়ে তিন দশকের মধ্যে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার যে লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অল্পসংখ্যক বিত্তবানের হাতে প্রচুর ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রবল। বর্তমানে বাংলাদেশে শুধু শিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্য নয়, সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা একটি মুষ্টিমেয় অভিজাতগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে আছেন শিল্পগ্রুপগুলোর পরিচালকবৃন্দ; দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মুখ্য নেতারা। এদের মধ্যে যখন যে দল দেশ পরিচালনার ভার পায় সেই দলের পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগীরা সরকার ও সমাজের প্রধান প্রধান 'কী-পয়েন্ট' অধিকার করে বসে। এরা আসলে সমাজের একই স্তরের মানুষ; এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান; এদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং যোগ্যতা মোটামুটি একই ধরনের। ক্ষমতার চূড়ায় আসীন হয়ে এরা সুবিধামতো পরস্পরের সঙ্গে আসন অদলবদল করে থাকেন মাত্র, সৈন্যবিভাগ থেকে অবসর নিয়ে কর্মকর্তা হন অতিকায় কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক কিংবা চেয়ারম্যান; আবার শিল্পপতি সুযোগ বুঝে সংসদ সদস্য কিংবা মন্ত্রী হয়ে সরকারী বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন; রাজনৈতিক নেতাদের ছেলে কিংবা স্বজনদের জন্য কোনো-না-কোনো উচুঁদরের সরকারী চাকরি কিংবা শিল্পগ্রুপের প্রধান পদটি তোলা থাকে। এই অভিজাত সমাজে বাইরের সাধারণ লোকের প্রবেশ কালেভদ্রে ঘটে–এই শ্রেণীর সদস্যপদ প্রধানত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়। এদের এই বিরাট কেন্দ্রীভূত শক্তির সামনে জনসাধারণ নিতান্তই অসহায়;

শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের সদস্যদের এরা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রচুর বিত্তসম্পদ এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই অভিজাতগোষ্ঠী সমাজে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারতেন না, যদি তাদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হয়ে উঠত। কিন্তু আমাদের জনসাধারণ তাদের ব্যক্তিগত অধিকার এবং দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলতে শেখেনি। অপরপক্ষে, ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ক্ষমতার মূল উৎস হচ্ছে তাদের সংগঠন-ব্যবস্থা। সুনিপুণ সংগঠনের সামর্থ্যেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গ সমস্ত সমাজের জীবনযাত্রা নির্ধারিত করতে সক্ষম। বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, ফিল্ম, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচারসংস্থা মারফৎ ক্ষমতাসীন মহল দিনের-পর-দিন জনসাধারণের ভাবনা-কামনা-রুচিকে নিজেদের প্রয়োজনমতো ভেঙে আবার গড়িয়ে তুলছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে যারা শিক্ষা ও সংগঠনের সামর্থ্যে অটল থাকতে পারবেন–তাদের পক্ষে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দ্বারা সংগঠিত বিভিন্ন অন্যায়-অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ক্ষমতাবানদের সংগঠনের মধ্যে বিবেকবোধের কোনো চিহ্ন থাকে না; আমাদের দেশের জনসাধারণ অসংগঠিত এবং তাদের বিচারবুদ্ধি অপরিণত বলেই পরিকল্পিত প্রচারের চাপের সামনে তারা এতটা অসহায়– আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানীগুণী সম্প্রদায় ক্ষমতাশীলদের কাছে আত্মবিক্রয় করে থাকে বলেই গণমননিয়ন্ত্রণের এতসব উপায়-পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং সুনিপুণ প্রয়োগ সম্ভবপর হয়েছে এবং হচ্ছে। এ অবস্থায়, দেশের জনগণকে সংগঠিত করার উদ্যোগটি আসতে পারে প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর তরফ থেকে – সংস্কৃতির ভোক্তা হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, কিন্তু প্রতিটি সমাজেই সংস্কৃতির প্রবর্ধক এবং প্রধান সংরক্ষক হচ্ছেন সেই সমাজের ফিল্যানথ্রপিস্ট ব্যক্তিগণ। এই মনীষী ব্যক্তিরা পূর্বসূরীদের দ্বারা অর্জিত সাংস্কৃতিক সম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকেন। ফিল্যানথ্রপিস্ট ব্যক্তিরা সেই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মূল্যায়নে সমর্থ থাকেন, সেই সম্পদের সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকেন এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে এঁরা নব নব রূপের উদ্ভাবনে সক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে যান। এঁরা নব নব জিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত থাকেন, স্বকীয় সৃষ্টির দ্বারা ঐতিহ্যকে সম্পন্নতর করতে উদ্যোগী থাকেন। সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং নিপুণ প্রকাশ-সামর্থ্যের অনুশীলনে এঁরা সর্বদা নিরলস– অদম্য সৃজনপ্রেরণার অধিকারী হওয়ার ফলে অভ্যাসের জড়তা থেকে এঁরা মুক্ত থাকেন। ফিল্যানথ্রপিস্ট ব্যক্তিগণ যে কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান উৎস। সৃষ্টি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের দ্বারা এঁরা সাংস্কৃতিক সম্পদকে গাণিতিক হারে বৃদ্ধি করেন, বৈদগ্ধ্য ও নিষ্ঠার দ্বারা এঁরা অর্জিত সংস্কৃতিকে অবক্ষয় ও নিম্নগামিতার হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন।

বিত্ত, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করে; বিরোধ, ক্ষতি এবং শাস্তির ভয়কে উপেক্ষা করে যে মনীষীরা নিজেদের সাধনার ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকতে সমর্থ, তাঁরাই সংস্কৃতির যথার্থ রক্ষক– তাঁরাই প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্ট। কোনো সমাজে

যখন ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর অভাব ঘটে, তখন সে সমাজে সর্বক্ষেত্রে নিম্নগামিতা নিতান্তই প্রত্যাশিত একটি ঘটনা মাত্র।

গোটা বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সর্বত্রই ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের কাছ থেকেই ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর ভূমিকা পালিত হবে বলে প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানকালে এদেশের অধিকাংশ অধ্যাপক [ব্যতিক্রম বাদে] জ্ঞানচর্চা অথবা শিল্পসম্ভোগের চাইতে বিত্ত এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রতি অনেক বেশী অনুরক্ত; তাঁরা স্বাধীন চিন্তায় অনভ্যস্ত এবং সে কারণে প্রচলিত চিন্তার পুনরাবৃত্তি করেই তৃপ্ত থাকতে পছন্দ করেন। এঁদের অনুভূতি স্থূল, জিজ্ঞাসাবোধ মোহগ্রস্ত– এঁদের না আছে আপন উপলব্ধির প্রতি নিষ্ঠা, না আছে নতুন কিছু মূল্যায়নের ক্ষমতা। মনের সম্পদে দরিদ্র এই অধ্যাপকদের প্রভাব তাঁদের সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেই কার্যকর নয়– গোটা দেশবাসী তো অনেক পরের ব্যাপার। যাঁরা জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানকে মূল্যবান না মনে করে বিদ্যাকে সামাজিক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত নন– তাঁদের পক্ষে ছাত্রসম্প্রদায় এবং তাদের অভিভাবক তথা দেশবাসীর ওপরে আদর্শগত কোনো প্রভাব ফেলা যে মোটেও সম্ভব নয়– এটা অপ্রত্যাশিত কোনো বিষয় নয়।

আমাদের দেশে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা বিত্তপ্রতিপত্তির লোভে অথবা সংঘাত ও শাস্তি এড়াবার উদ্দেশ্যে নিজেদের সামর্থ্যকে শক্তিমানের নির্দেশ পালনে নিয়োজিত করেছেন– নিকট-অতীতে এটা দেশবাসী বারবার লক্ষ্য করেছে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের বিদ্যাবুদ্ধি বা প্রকাশের দক্ষতা একবারেই না থাকলে তাঁরা দেশীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী হতে পারতেন না; এবং সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল কিংবা অন্যান্য ক্ষমতালিপ্সু সংগঠন এঁদেরকে চড়া হারে পারিশ্রমিক দিতে রাজি হত না। অথচ এইসব ব্যক্তিদের পক্ষে ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর ভূমিকা সমগ্র জাতির প্রত্যাশা ছিল। এঁরা যদি বিবেকবান ব্যক্তি হতেন তাহলে আর্থিক সাফল্য কিংবা জনপ্রিয়তার চাইতে জিজ্ঞাসা ও প্রকাশের স্বাধীনতা, বক্তব্য ও ব্যঞ্জনার সমৃদ্ধিসাধন এবং জনসাধারণের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া তাঁদের কাছে অনেক বেশী কাম্য বলে মনে হত। আর সে ক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক অবস্থার সমকালীন নিম্নগামিতার ধারা নিশ্চয়ই এতটা প্রবল হয়ে উঠতে পারত না। মনীষী যদি মনস্বিতার অনুশীলনে একাগ্র না থাকেন, জনসাধারণের মানসিক অপরিণতির দোহাই দিয়ে যদি প্রত্যেকেই ক্ষমতাসীন এবং বিত্তবান ব্যক্তিদের নির্দেশমতো নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যকে নিয়োজিত করতে সদাপ্রস্তুত থাকেন, তাহলে দেশের সকল ক্ষেত্রে অবনতি যে অবশ্যম্ভাবী, এটা বোঝা মোটেই কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। বিভিন্ন কালে পৃথিবীর দেশে দেশে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্নক্ষেত্রে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের এই ধরনের স্বধর্মচ্যুতি সেসব দেশে সর্বব্যাপী অধোগমনের অন্যতম প্রধান কারণ।

আমাদের দেশের বর্তমান সঙ্কটাক্রান্ত সমাজে যাঁরা ভাবুক ও বিবেকী, যাঁরা সুবেদী এবং কল্যাণকামী– তাঁদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। জনসাধারণের মনকে সুসংস্কৃত করে তুলতে হবে, অন্যথায় একদিকে যেমন পরিকল্পিত প্রচার এবং অপরিণত মনের চাহিদার কারণে সংস্কৃতির মান ক্রমেই নিম্নগামী হবে, অন্যদিকে শিল্পী এবং মনীষীরা ক্রমেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় অসমর্থ হয়ে দেশত্যাগ অথবা মৌনের পথ অবলম্বন করবেন, আর নয়ত শক্তিমান এবং বিত্তবানের দাসে পর্যবসিত হবেন। জনসাধারণকে অধঃগতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এবং তাদের বিকাশের সম্ভাবনা বাড়াবার জন্য রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল এবং ব্যবসায়ীদের হাতের যন্ত্র না হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা এবং বিশিষ্টতাকে রক্ষা করার জন্য জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। ফিল্যানথ্রপিক কাজকর্মের মাধ্যমে তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন– যাতে জনসাধারণ তাদের সংস্কৃতিকে মূল্য দিতে শেখেন, তাদের বিচারশক্তি জাগ্রত এবং রুচি পরিশীলিত হয়, যার মাধ্যমে জনসাধারণ তাদের মানসিক পরিণতির সামর্থ্যে বিত্তবান হয়ে শক্তিমানের সংগঠিত প্রচারপ্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন, যাতে জনসাধারণ প্রত্যেকে আপন আপন ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করতে উদ্যোগী হন এবং অপরের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা অর্জন করেন। মানবসমাজের ঐক্য এবং অবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সমাজ-সংগঠনকে কিভাবে মেলানো যায় সেই পথ ফিল্যানথ্রপিস্ট-কেই দেখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তীক্ষ্ণ, সুসঙ্গত এবং নিরলস সমালোচনার মাধ্যমে সমকালীন বিভিন্ন গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিকে উপেক্ষা করে তাদের মারাত্মক প্রভাব থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করতে হবে। শিক্ষার প্রকৃত মানকে কোনোক্রমেই নামতে না দিয়ে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা এবং বিবেকবোধের সমর্থক বৃত্তিগুলোকে পুষ্ট করে তুলতে হবে। দেখতে হবে, সাধারণ মানুষের মন যেন এক ছাঁচে ঢালাই না হয়ে বিচিত্রভাবে স্ফুরিত হবার সুযোগ পায়; এবং নানারকমের ভাবনা-চিন্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজের মানসজীবন যেন সক্রিয় ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

একজন ফিল্যানথ্রপিস্ট মানুষের মনে সেই প্রক্রিয়া জাগিয়ে তুলেন, যার দ্বারা মন পুষ্ট এবং বিকশিত হয়; যার ফলে ব্যক্তিমানুষ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার তুলনা, বিশ্লেষণ ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চতর ধারণায় আরোহণ করতে সমর্থ হয়; মানুষের বহুযুগসঞ্চিত মানসিক উত্তরাধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেই উত্তরাধিকারকে নিজের বিকাশের উপাদানরূপে ব্যবহার করার শক্তি অর্জন করে। ফিল্যানথ্রপিস্ট মানুষকে এমনভাবে গড়ে তোলেন যাতে করে সে কোনো সিদ্ধান্তকে শেষ উত্তর ভেবে তৃপ্ত না হয়ে ক্রমাগত জিজ্ঞাসার দ্বারা জ্ঞানকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য করে তোলে, যার ফলে মানুষের অনুভূতি সূক্ষ্ম এবং মার্জিত হয়; সুবিন্যস্ত চিন্তা এবং বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে; ব্যক্তিমানুষের প্রকাশপটুত্ব বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তিমানুষ যাতে নিজে উপার্জনক্ষম থেকেও বর্তমান এবং নিকট-অতীত ও দূর-অতীতের অন্যান্য

মানুষদের বহুবিচিত্র সাধনার অংশীদার হতে পারে। আমাদের দেশের সার্বিক ভবিষ্যৎ আজ ফিল্যানথ্রপিস্টদের নেতৃত্বের ওপরে অনেকটাই নির্ভরশীল।

দুই

ফিল্যানথ্রপিস্ট-দের কাজ করে যাবার অসংখ্য ক্ষেত্র রয়েছে। বদান্য বা দানশীল বা শিক্ষানুরাগী হিসেবে পরিচিত মহানুভব ব্যক্তিরা যা করে থাকেন তার সাথে ফিল্যানথ্রপিস্টদের কাজের ভিন্নতা রয়েছে। বদান্য বা দানশীল ব্যক্তিরা আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে ব্যক্তিটির তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেন– কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতা কিংবা ব্যাধিতে আক্রান্ত কারুর চিকিৎসা বাবদ প্রধানত দানশীল ব্যক্তিরা সাহায্য প্রদান করে থাকেন। কেউ কেউ হয়তো ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণে জমি দিয়ে সাহায্য করেন বা আর্থিক সাহায্য করেন। আবার কখনো-বা নিজের বসবাসের এলাকায় পুল নির্মাণ, পুকুর খনন, মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করে দেন। এর বাইরে রয়েছে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, মাদ্রাসা কিংবা টোল স্থাপন এবং কদাচিৎ ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নিজেদের নামে কিংবা নিকট-আত্মীয়-স্বজনের নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করছেন।

এসব ক্ষেত্রে উপকৃত ব্যক্তিটি তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য পেয়ে যায় ঠিকই কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিটির সামগ্রিক দারিদ্র্য নিরসনের কোনো ব্যবস্থা না হওয়ার কারণে পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো সংকটমুহূর্তে তাকে আবার দিশাহারা হয়ে সংকটমোচনে আরেকবার সাহায্য প্রার্থনায় নামতে হয়। আবার এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে যে সংকটগ্রস্ত ব্যক্তিবিশেষ উপকৃত হচ্ছে কিন্তু তার স্তরের অন্যান্য ব্যক্তিরা কোনোভাবেই উপকৃত হচ্ছে না– অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ উপকৃত হচ্ছে, গোষ্ঠী নয়, সমাজ নয়। ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করলে কিংবা জমি দান করলে দাতা ব্যক্তিটির পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীও তাদের উপাসনা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করে কিন্তু জাগতিক সংকট মোচনের কোনো দূরতম আকাঙ্ক্ষাও এ থেকে পূরণের সম্ভাবনা থাকে না। এলাকায় পুকুর খনন করে দেয়া কিংবা পুল নির্মাণ করে দেয়ায় এলাকাবাসীর সামষ্টিক কল্যাণ হয়ে থাকে ঠিকই কিন্তু দানশীল ব্যক্তিটি – যিনি উক্ত নির্মাণকাজের উদ্যোক্তা– তাঁর জীবদ্দশা অবধি কিংবা আরও কিছু সময় আগে-পরে অবধি জনসাধারণ পুকুর কিংবা পুলের সেবা ভোগ করে যায়– বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে নির্মাণকাজের উদ্যোক্তা ব্যক্তিটির অবর্তমানে পুকুর কিংবা পুলটি জনসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তি থেকে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে যায়। দাতব্য চিকিৎসালয়, মাদ্রাসা কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উদ্যোক্তা ব্যক্তিটির দূরদর্শিতার অভাবে সেগুলোর যথাযথ ও উপযুক্ত পরিচালনা কমিটি গঠিত না হওয়ায় ক্রমশ প্রতিষ্ঠানগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রধানত আর্থিক কারণে এবং কিছু ক্ষেত্রে

ব্যবস্থাপনার অভাবে এ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলো অতি দ্রুত অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। অতি সাম্প্রতিককালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিজেদের নামে কিংবা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের নামে প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলো প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে নিজেদের আর্থিক অহমিকা প্রদর্শন করা, সমাজে উচ্চতর স্তরে নিজের অবস্থান করে নেওয়া অর্থাৎ জাতে ওঠা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার লক্ষ্য ইত্যাদি– মোটেও জনকল্যাণ তথা শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে এ ধরনের কলেজগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় না। পরিণামে দেখা যায়, উপযুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর অনুপস্থিতি, পর্যাপ্ত সংখ্যক ও মানের ছাত্র-ছাত্রীর অভাব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্তির শর্ত পূরণে ব্যর্থতার কারণে এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজ চালিয়ে যেতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

ফিল্যানথ্রপিস্টের কাজ করে যাবার ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত বলে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুকুর খনন কিংবা পুল নির্মাণ, চিকিৎসালয় স্থাপন, দরিদ্রকে সাহায্য করা–এ সবও ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর কাজের ক্ষেত্র; কিন্তু একজন ফিলানথ্রোপিস্ট যখন এ ধরনের কাজগুলো সম্পন্ন করেন, তখন তিনি কাজগুলো সম্পন্ন করার পাশাপাশি দৃষ্টি রাখেন যেন প্রতিষ্ঠানগুলো কিংবা নির্মাণকার্যগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতিশীল থাকে, তাদের ভবিষ্যতে অস্তিত্ববান থাকার ক্ষেত্রে কোনো কিছু যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তিনি এটাই লক্ষ্য রাখেন যাতে করে উপকৃত জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতেও তাদের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বজায় থাকার স্বার্থে প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে– উদ্যোক্তার অনুপস্থিতিতে কিংবা অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলো যেন কোনোমতেই বিলুপ্ত না হয়ে যায়। সংকটাপন্ন ব্যক্তির তাৎক্ষণিক সংকট মোচনের পাশাপাশি একজন ফিল্যানথ্রপিস্ট এটাও মাথায় রাখেন যেন ভবিষ্যতে ব্যক্তিটি তার সংকটের মোকাবেলা নিজেনিজেই করার অনুপ্রেরণা অর্জন করে। ব্যক্তিবিশেষের সংকট সমাধানের চাইতে একজন ফিল্যানথ্রপিস্ট একটি জনগোষ্ঠীর সংকট সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণের দিকে আগ্রহী থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। পৃথিবীজুড়ে ফিল্যানথ্রপিস্ট হিসেবে ভূমিকা রেখে যাওয়া সকলেই মোটামুটি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এসেছেন যার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাপক জনগোষ্ঠী ক্রমাগতভাবে বর্ধিত হারে উপকৃত হয়ে আসছে।

বিগত বছরগুলোতে আমাদের দেশে নানামুখী অর্থনৈতিক সমস্যার বিপরীতে দরিদ্রসেবা তথা দারিদ্র্যমোচনের নামে বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান মাঠে নেমেছে। এদের মৌখিক বক্তব্য, চটকদার প্রচারণা ও বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই মনে করে থাকেন যে এই এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর বিকল্প ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে– অন্ততঃ ব্যক্তিমানুষের দারিদ্র্যমোচনের লক্ষ্যে এদের কাজকর্ম পরিচালনা করার প্রচারণায় তাই বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর বিকল্প ভূমিকার আড়ালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এনজিওগুলো হয়ে উঠেছে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান– মুনাফা অর্জন করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের নামে একশ্রেণীর

এনজিও প্রতারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এদের কোনো কোনোটি শেকসপিয়রের সৃষ্ট অমর চরিত্র কুসীদজীবী শাইলকের মতোই দরিদ্রদের প্রতি নির্দয়। দেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো গণতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালিত হবার কথা থাকলেও অনেক এনজিও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তথাকথিত জনকল্যাণমূলক এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পদটিতে পদধারীর মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত কখনোই পরিবর্তন আসে না। বেশিরভাগ এনজিও-র কাজের ধরন এবং ব্যবসার ক্রমাগত স্ফীতি অনুসরণ করলেই বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না যে, এরা প্রকৃতপক্ষে মানুষের কল্যাণ থেকে কত দীর্ঘ পথ দূরে আছে। এই অসহনীয় অবস্থা মোটেও কাম্য নয়; সামাজিক বিকাশের জন্য অবশ্যই নিঃস্বার্থ সেবাকর্মের প্রয়োজন রয়েছে– কিন্তু তাই বলে ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর ভূমিকা পালনের আড়াল নিয়ে বাণিজ্যিক ও স্বার্থবাদী মানসিকতা অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রটিকেও গ্রাস করে ফেলবে, বিধাতার সৃষ্টির সেবাকর্মের নামে সমষ্টির কল্যাণের এই কর্মক্ষেত্রটিকে স্বার্থান্ধতার গ্রাসে পরিণত করবে, জনকল্যাণের বিষয়টিকে চতুর বণিকের পণ্যে পরিণত করবে– এটা মেনে নিলে ত্যাগসুন্দর মানুষদের ত্যাগের আগ্রহকে সম্ভবত চিরকালের মতো চাপা দেয়ার কাজটি সম্পন্ন হবে।

তিন

ঔপনিবেশিক শাসনামলে পরাধীন ভারতবর্ষে তিমিরাচ্ছন্ন সমাজে প্রথমবারের মতো ঘুমভাঙার গান শুনিয়ে জাগরণের বীজ বুনে গিয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরো কয়েকজন।

৫৯ বছরের সীমাবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত জীবনকালে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, রাষ্ট্রবিধি-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে গেছেন। সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কার বিষয়ে তাঁর দুটো কাজের জন্য তিনি এতদঞ্চলে স্মরণীয় থাকবেন চিরকাল। তার একটি হচ্ছে সতীদাহ-নিবারণ-আন্দোলন সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়টি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেশের মধ্যে প্রচলন-প্রচেষ্টা। রাজা রামমোহনের প্রচেষ্টা ছাড়া এ উপমহাদেশের হিন্দু রমণীকুলের সতীদাহ প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া ছিল অসম্ভব। রাজা রামমোহনের কৃতী সম্পর্কে বিশদ বর্ণনার উপযুক্ত স্থান এ প্রবন্ধ না হওয়ায় রাজা রামমোহন রায় স্মরণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর উদ্ধৃতি প্রদান করে এই অবিস্মরণীয় ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বাংলা ১৩৪০ সালের ১৪ পৌষ রাজা রামমোহন রায় স্মরণে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকাশিত পুস্তিকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু-অন্তরাল ভেদি' দাও তব অন্তহীন দান,

যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্‌বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব ।

বিধবা বিবাহের পথ দেখিয়ে গেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) । করুণাবান, উদারহৃদয়, জনহিতৈষী ও সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শিক্ষাবিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব, গ্রন্থ-প্রণয়ন ও সম্পাদনে তাঁর ভূমিকা, তাঁর মহৎ জীবনী বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় হয়েছে। সমস্ত ধরনের গুণাবলীর সমন্বয়ে গঠিত এই ফিল্যানথ্রপিস্ট পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের সন্তান হয়েও স্বীয় প্রতিভাবলে এমন জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করেছিলেন, যাতে সমসাময়িক সকল সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারকে নির্মমভাবে আঘাত করতে তিনি দ্বিধা করেননি, দৃঢ়হস্তে সকল বাধা অপসারিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই মহান ফিল্যানথ্রপিস্ট-কে যথাযথ উপলব্ধি করতে গেলেও আমাদেরকে রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হতে হয়। বাংলা ১৩০২ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় কবিগুরু লিখেছেন:

"বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বন-জঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে– বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করিতেন; কিন্তু আমাদের শত সহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই,–কিন্তু তাঁহার মহান চরিত্রের যে অক্ষয়বট বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া সূক্ষ্মতম তর্কজাল ও স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত, দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্যবীর্য্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজেদের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে থাকিব, যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

ফিল্যানথ্রপিস্ট হিসেবে এ অঞ্চলের জনগণের কল্যাণে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন আরো অনেকেই। ১৮৫৫ সালে তদানীন্তন ভারতবর্ষে কলকাতা আদালতে কর্মরত নিতান্তই সাধারণ দুইজন কর্মচারী আল কুজ্জত ফজলুর রহমান এবং

মুহম্মদ মজহার এ অঞ্চলে আঞ্জুমান আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। আঞ্জুমান শব্দটির আভিধানিক অর্থ সমিতি, সভা, মজলিস। এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা বঙ্গীয় অঞ্চলে। আঞ্জুমানগুলো পল্লী এলাকায় এবং বিভিন্ন শহরে স্থানীয় উদ্যোগে গড়ে উঠত এবং পরিচালিত হত। দরিদ্র অসহায়দের সহায়তা প্রদান, হতদরিদ্র ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকারে সাহায্য করা, কলেরা-বসন্তের মতো মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাবে মানুষকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা ছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

এ উপমহাদেশের ইতিহাসে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) ছিলেন একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সে সময়কার জাতীয় কর্মকাণ্ডে পূর্ববাংলার জনসাধারণের বৈধ অধিকার, বিশেষ করে বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এক বলিষ্ঠ ফিল্যানথ্রপিস্টের ভূমিকা পালন করে গেছেন। সমকালের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তাঁর কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারার অবিস্মরণীয় প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রতি সম্ভবত তিনিই পূর্ববাংলা থেকে সর্বপ্রথম পশ্চাৎপদ মুসলিম জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা দানের পক্ষে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে সুনিদিষ্ট ও জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে ভারতে রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী লিখিত প্রস্তাবের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে বলেছিলেন– "ভারতে রাষ্ট্রভাষা যাই হোক, বঙ্গের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলা ভাষাকে।" এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ তাঁর "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" গ্রন্থে লিখেছেন –

"মুসলিম বাংলার সকল নাইট খেতাবধারীরা এবং উচ্চস্তরের সরকারী কর্মচারীরা; এমনকি মফস্বলের অনেক খানবাহাদুর সাহেবরা পর্যন্ত সরকারী ইঙ্গিতে সমস্বরে রায় দিয়েছিলেন– মুসলিম বাংলার মাতৃভাষা বাংলা নয়, উর্দ্দু। তখন গরীব আলেম-ওলামা ও সাহিত্যিকদের সাথে মিলে একজন মাত্র বলেছিলেন, "আমাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু নয়, বাংলা" –তিনি ছিলেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। [পৃষ্ঠা-৯০]"

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ৩৮ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে জমি ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ এবং আর্থ-সামাজিক দিকশূন্য উপলব্ধি করে মাদ্রাসাশিক্ষার সংস্কারে অবদান রাখেন। ১৯২৫ সালে তৎকালীন বেঙ্গল একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য থাকা অবস্থায় এই ফিল্যানথ্রপিস্ট কৃষকসন্তানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকা ও চুচুঁড়ায় সরকারী কৃষিক্ষেত্র বিদ্যালয় (FARM) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। কৃষিশিক্ষা বিষয়ক প্রাথমিক স্কুল, বয়নশিক্ষা বিদ্যালয়, তাঁতীদের শিক্ষার জন্য স্থায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করা; কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে কম সুদে গরীব কৃষকদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা; উন্নতজাতের গো-মহিষ জন্মাবার লক্ষ্যে রংপুর ও ঢাকায় গোশালা স্থাপন করা ও পশুচিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; অধিক ফলনশীল বীজ সংগ্রহ করে উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং রিসার্চ

ট্যানারী স্থাপনের মাধ্যমে চর্মশিল্পের উন্নতি ঘটানো তাঁর কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে অর্থাভাব দেখা দিলে তিনি তাঁর জমিদারীর একাংশ বন্ধক রেখে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। ১৯২২ সালে তিনি ছাত্রদের বৃত্তিপ্রদান বাবদ ষোল হাজার টাকার একটি তহবিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। ১৯১২ সালের ২৭ মে গঠিত ১৪ সদস্যবিশিষ্ট "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি"র তিনি ছিলেন চার নম্বর সদস্য – এ কমিটি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে।

বাঙালি মুসলিম সমাজের অবরোধবাসিনী ললনাকুলের মুক্তির পথ নির্মাণ করেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০–১৯৩২)। পরাধীন ভারতবর্ষের পরিত্রাণের উপায় হিসেবে বেগম রোকেয়া নারীমুক্তিকে তুলে ধরেছিলেন। নারীমুক্তি ব্যতীত দেশের যথার্থ মুক্তি সম্ভব নয়– এ কথাটি সুস্পষ্ট করাই এই ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; নারীমুক্তির জন্য নারীশিক্ষার প্রসারই ছিল তাঁর মূল ধ্যানধারণা। দেশ, জাতি ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই নারীশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে– এ বিষয়ে অন্য কোনো প্রশ্ন ওঠার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না বলে বেগম রোকেয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। জাতীয়তাবাদ, নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষা বিষয়ে বেগম রোকেয়ার চিন্তার গভীরতা, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা অসাধারণ ও অনন্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুরুষেরা পর্যন্ত যে বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে সাহসের অভাবে পিছু হটেছেন, তীব্র আত্মবিশ্বাসের জোরে বলীয়ান হয়ে বেগম রোকেয়া সেই সকল বক্তব্য সাহসের সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে যুক্তিভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীতে আচ্ছন্ন ছিল তাঁর চারপাশের সমাজ পরিমণ্ডল, কিন্তু তিনি নিজস্ব মনের আলোতে স্ফটিকস্বচ্ছভাবে সত্যকে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সত্যকে অনেকের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি নারীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন– নারীমুক্তি ধীরে ধীরে আলোর পথে অগ্রসর হয়েছে। আলোকবর্তিকা হাতে তুলে নিয়ে তিনি সাহসের সাথে এ অঞ্চলের মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। পরবর্তী প্রজন্ম এতে করে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

মেয়েদের মনের প্রসার বৃদ্ধি করে, তাদের ইচ্ছাশক্তিকে বলীয়ান করে, তাদের মন থেকে সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত করে, তাদেরকে শক্তিশালী, সাহসী ও আত্মমর্যাদায় বলীয়ান করার পথ প্রশস্ত করতে গিয়ে এক বিশাল ভূমিকা রেখে গেছেন এই ফিল্যানথ্রপিস্ট– বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি লিখেছেন–

"শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারাই শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ ভগ্নী, আদর্শ মাতারূপে গঠিত করিবে। ... তাহারা যেন কাহারও গলগ্রহ না হয়।"[রোকেয়া রচনাবলী, নতুন সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৪০]

চার

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটি দেখা যায় যে, ক্রমাগত জটিল হয়ে-ওঠা উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন-প্রসূত সামাজিক-সাংস্কৃতিক জটিলতা সামাজিক মানুষের স্বাভাবিক চলার পথে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তা নিরসনের বাস্তব প্রয়োজনে সমাজে যুগে যুগে ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। মানবতাবোধের অনুপ্রেরণায় সংগঠিত দানশীলতাই ফিল্যানথ্রপিস্টদের উপজীব্য। মানুষের সহজাত সহমর্মিতাবোধ, দানশীলতা, সমাজ-সংস্কারের মূল্যবোধ ফিল্যানথ্রপিস্টকে তার কাজে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট অবধি যেমন– রেডক্রস, জাতিসংঘ (বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের মাধ্যমে), ফিল্যানথ্রোপিস্টরা তাদের কর্মকাণ্ড তথা সামাজিক সেবা ও কল্যাণমূলক আয়োজন চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক জনজীবনের পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের মনোসামাজিক, আন্তঃব্যক্তিক, আন্তঃদলীয়, সাংস্কৃতিক তথা বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও স্পষ্ট পদ্ধতিভিত্তিক উন্নত, পরিশীলিত, বিজ্ঞানভিত্তিক তথা লাগসই সেবাদান ব্যবস্থা একমাত্র ফিল্যানথ্রপির মাধ্যমেই আসতে পারে। এতে করে সমাজচলার পথটি সাবলীল থাকে।

একসময় আমাদের দেশে ফিল্যানথ্রপিস্টদের বিবিধ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মিলিত চেষ্টায় সমাজকল্যাণের এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি চমৎকার সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কোনোরকম স্বার্থচিন্তা না করে, নিজের ক্ষতির কথা না ভেবে, মানুষের কী করে ভালো করা যায়, সে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে সার্থক জীবনের সন্ধান করেছেন ফিল্যানথ্রপিস্টবৃন্দ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও মানুষ ও সৃষ্টির নিঃস্বার্থ সেবার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই ফিল্যানথ্রপিস্টরা যাতে নির্বিঘ্নে তাঁদের কাজ করে যেতে পারেন, সেজন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

ফিল্যানথ্রপি: মোটিভ বিশ্লেষণ

ম ঈ ন চৌ ধু রী – আ নু মু হা ম্ম দ

[আজ ২২ এপ্রিল ২০০৮। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতার' পক্ষ থেকে জনাব মঈন চৌধুরী ও জনাব আনু মুহাম্মদ-এর মুখোমুখি হয়েছি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য। দেশের উল্লেখযোগ্য কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব মঈন চৌধুরী এবং শ্রেণীহীন সমাজকামী অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী আনু মুহাম্মদ এর কাছ থেকে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে বুঝবার চেষ্টা করব 'ফিল্যানথ্রপি' বিষয়টি কী।]

হালখাতা

ফিল্যানথ্রপি নিয়ে প্রথমে আমরা মঈন চৌধুরীর কাছ থেকে জানতে চাই, ফিল্যানথ্রপি বিষয়টিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

মঈন চৌধুরী

'ফিল্যানথ্রপি' নিয়ে কিছু বলতে যাওয়ার আগে আমি অন্য আরেকটি বিষয় নিয়ে বলতে চাই, সেটা হল ভালোবাসার দর্শন নিয়ে। 'ভালোবাসার দর্শন' বা 'ফিলোসফি অব লাভ' মানুষের ভেতরে কীভাবে কাজ করে? মানুষের ভেতরে ভালবাসা যেভাবে কাজ করে তার মূলে রয়েছে প্রথমত Eros বা কাম-কামনা, দ্বিতীয়ত Philia বা বন্ধুপ্রেম বা সামাজিক প্রেম এবং তৃতীয়ত Agape বা ঈশ্বরপ্রেম; অর্থাৎ মানুষ যখন তার ভাগ্য বা ভবিষ্যত সম্পর্কে জানে না তখন প্রচলিত ধর্মচিন্তার বাইরেও সে এক ধরনের ঈশ্বর-প্রেমে আক্রান্ত থাকে। এটা অবশ্য প্রচলিত ধর্মগুলো আসার আগেও মানুষের মধ্যে নানাভাবে কাজ করত।

এখন কথা হল মানুষের মধ্যে ইরোটিক যে বিষয়টি আছে অর্থাৎ কাম বা কামনা, তার একটি বড় ধরনের ফেক্টর হচ্ছে জেনেটিক। যার মধ্য দিয়ে আমরা পুত্র-কন্যার জন্ম দেই এবং বংশ রক্ষা করি। এই ইরোজের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ পারস্পরিক টান অনুভব করে এবং এভাবে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক টিকে থাকে। তবে এ বিষয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। যেমন প্লেটো বলেছেন কাম বা কামনা ছাড়াও ভালোবাসা

হতে পারে। যেমন প্লেটনিক লাভ। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় কাম-কামনার বাইরে এ ধরনের ভালোবাসা হওয়া সম্ভব নয়। কাম-কামনা এবং ঈশ্বর প্রেমের বাইরে যে প্রেম, সেটাই আসলে Philia বা সামাজিক প্রেম, যাকে 'ফিল্যানথ্রপিক' প্রেমও বলা যায়। গণমানুষের জন্যে ব্যক্তিমানুষের ভেতরে কিছু করার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় সেটা যেমন কাম-কামনা থেকে হয় না তেমনি এর বিনিময়ে সে যে কিছু আবার পাবে সেই চিন্তা থেকেও হয় না। তবে প্রকৃত 'ফিল্যানথ্রপিক' প্রেমকে অনেকে কখনো কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থের কাজে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে যে মৌলিক সামজিক প্রেম বা ফিল্যানথ্রপিক প্রেম রয়েছে সেটাকে অস্বীকার করা যাবে না। ইরোটিক যে প্রেম, সেটাকেও মানুষ তো স্বার্থসিদ্ধির কাজে অনেক সময় ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তাতে বলা যাবে না যে মানুষের মধ্যকার প্রেমের যে প্রকৃত শক্তি, সেটার মোটিভ বা ভ্রূণ বাণিজ্যিক। কামনা, বাসনা ও বন্ধুত্বের বাইরে থাকে ঈশ্বরপ্রেম। এই ঈশ্বর প্রেম তখনই সৃষ্টি হয় যখন যুক্তি দিয়ে মানুষ তার ভাগ্য বা ভবিষ্যতকে আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমকে আমরা যাই বলিনা কেন, মানুষের মধ্যে এধরনের প্রেমের অস্তিত্ব বহুকাল ধরেই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে এটাও সত্য, এই ঈশ্বরপ্রেমের নাম করেও মানুষ নানারকম ফায়দা লুটে থাকে।

ফলে 'ফিল্যানথ্রপি' নিয়ে যতরকম ব্যক্তিস্বার্থ, বাণিজ্য বা ফায়দা লুটে নেয়ার প্রক্রিয়াই চালু থাকুক না কেন, আমি বলব ফিল্যানথ্রপিক প্রেম বা জনগণের জন্যে যে ভালোবাসা তার প্রকৃতই একটি অস্তিত্ব মানুষের মধ্যে আছে। এবং সেটা নির্দোষ, নির্ভেজাল এবং মৌলিক একটি শক্তি। কথা হল মানুষ যদি সেই শক্তিকে ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগায় বা সেটা নিয়ে বাণিজ্য করে তাহলে তো মৌলিক ঐ শক্তিকে দায়ী বা অস্বীকার করা যাবে না। কাজেই ফিল্যানথ্রপির বীজ মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবেই, এটাই আসল সত্য।

হালখাতা

এবার ফিল্যানথ্রপি নিয়ে আনু মুহাম্মদের কাছ থেকে জানতে চাই, আপনি বিষয়টিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আনু মুহাম্মদ

আসলে আমাদের জন্ম এবং বেড়ে-ওঠা এটা একটি সামষ্টিক প্রক্রিয়ার ফসল। অনেক সময় অনেকে ভেবে থাকেন যে আমি একা বা আমি যে কাজ করছি সেটা আমি একাই করছি। কিন্তু এটি ঠিক না। কেননা আমরা অনেক সময় নিজেরাই বুঝতে পারি না যে, এত বড় প্রাকৃতিক আয়োজনের মধ্যে আমরা একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তবে প্রাকৃতিক সেই সামষ্টিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তির আবার একটি আলাদা অস্তিত্ব থাকে। সভ্যতার প্রারম্ভে যখন সামষ্টিকতা অনিবার্য ছিল কিংবা ব্যক্তির পরিচয় যখন স্পষ্ট হয়নি তখন কিন্তু ফিল্যানথ্রপি বলতে কিছুকে আলাদা করা যেত না। কারণ তখনকার মানুষ যখনই

কিছু করত তখন তা সবাই মিলে করত। ব্যর্থতা, সাফল্য, খাদ্য, বাসস্থান এসব কিছুই ছিল সামষ্টিক ব্যাপার। কিন্তু এ ধারা যখন ভেঙে যেতে থাকে অর্থাৎ যখন থেকে লক্ষ্য করা গেল কারো কারো সামর্থ্য বেশি আবার কারো কারো সামর্থ্য কম– এরকম এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির যখন পার্থক্যটা পরিষ্কার হতে লাগল আমার ধারণা তখন থেকেই এই ফিল্যানথ্রপি ধরনের কাজগুলো শুরু হতে থাকে। কারণ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যখন আলাদা হতে শুরু করেছিল তখন থেকেই একজনের জন্য আরেক জনের কল্যাণ বা উপকার করার বিষয়টি চলে আসে। সামষ্টিক বা প্রাকৃতিক সমাজ অর্থাৎ সে সময়কার সেই শ্রেণীহীন সমাজ ভেঙে যাওয়ার কারণেই ফিল্যানথ্রপি নামক বিষয়ের উৎপত্তি ঘটেছে।

হালখাতা

এবার পুনরায় মঈন চৌধুরীর কাছে ফিরে যাচ্ছি। আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, মানুষ কী কারণে ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো করে থাকে? এটা কি মানুষের জন্মগত ব্যাপার?

মঈন চৌধুরী

একটু আগে আমরা আলাপ করলাম ফিল্যানথ্রপি আসলে কী, সেটা নিয়ে। এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো মানুষ কেন করে– এ বিষয়ে বলতে গেলে সবার আগে আমি বলব এটা মানুষের জন্মগত ব্যাপার হলেও হতে পারে কিন্তু বাস্তবে কোনো না কোনো প্রলোভন থেকেই মানুষ ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো করে। সেই প্রলোভন বা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটি বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় রকমই হয়। সুনাম একটি অবস্তুগত ব্যাপার। কিন্তু সুনামকে বস্তুর মতোই আর্থিক মূল্যে বিক্রি করা যায়। কাজেই কেউ যদি সুনামের জন্যে ফিল্যানথ্রপিক কাজ করে তাহলে সেটাকে মোটেও নিঃস্বার্থ কাজ বলা যাবে না। সে অর্থে সকল প্রকার ফিল্যানথ্রপিক কাজই কোনো না কোনো না কোনো ধরনের প্রাপ্তির জন্যই করা হয়ে থাকে। 'নিঃস্বার্থ দান' এরকম একটি কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত থাকলেও আমি মনে করি এ কথার বাস্তব কোনো ভিত্তি নাই। সুতরাং মানুষ ফিল্যানথ্রপি করে প্রধানত দু'টি কারণে। **এক.** প্রাকৃতিকভাবেই অন্যের উপকার করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে রয়েছে, যেটাকে সে ইচ্ছা করলেও দমন করতে পারে না। **দুই.** ফিল্যানথ্রপি দ্বারা ব্যক্তি তার অন্যায় ও দোষকে ঢাকতে চায় এবং ফিল্যানথ্রপিক কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত খ্যতির বিপরীতে সে শোষণ-নিপীড়ন বা চুরি কলেরও মানুষ যাতে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, সে তৎপরতাই চালায়।

হালখাতা

আনু মুহাম্মদ। আপনি কি আমাদের বলবেন মানুষ ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো করে আসলে কোন ধরনের মোটিভ থেকে?

আনু মুহাম্মদ
একটি বিষয় তো আছে যে, অনেক সম্পত্তি হয়তো বাবা-দাদার কাছ থেকে কেউ পেল এবং একটা বিশেষ বোধ থেকে তার এ-ও মনে হতে পারে যে, অনেক মানুষ আর্থিক কারণে কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। এরকম পরিস্থিতিতে অঢেল সম্পত্তির ঐ মালিক হয়তো জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি তাদের ব্যবহার করার সুযোগ দিল। সে হয়তো এটা করে এক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। শুধু এই স্বাচ্ছন্দ্যের কারণেও ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল এ ধরনের ফেনোমেনা খুবই রেয়ার। এটি জেনারেল নয়।

পক্ষান্তরে আমরা আজ কী দেখছি; বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান আজ ‘সেইভ গার্ড-এর মতো একটি বিষয় চালু করেছে; এটা হল এমন একটি বিষয় যে, সমাজে যখন মাত্রাতিরিক্ত টেনশন দেখা দিবে তখন এই সেইভ গার্ডের মাধ্যমে মানুষের টেনশনকে রিলিফ করা হয়। যেমন ধরা যাক, সমাজে হয়তো দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি চলছে; তখন সমাজের মানুষ যাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে না ওঠে সে জন্যে কোনো পূজা বা ইফ্‌তার পার্টি বা বড় দিন বা বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে একটি বড় ধরনের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হল। কিংবা হঠাৎ করে হয়তো করের হার বেড়ে গেল; কিংবা দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি যখন সৃষ্টি হল– তখন দেখা গেল আবার একটা ভোজনের ব্যবস্থা করা হল, হয়তো একটা পুরো ভোজনাগারই খোলা হল। সেখানে গরিব মানুষ বেশ খেতে-টেতে হয়ত পারে। এতে করে মানুষ কিছুটা হলেও ভাববে যে, যারা সমাজ বা রাষ্ট্র চালায় তারা জনগণের জন্যে বেশ চিন্তাভাবনা করে। এভাবে ফিল্যানথ্রপির পুরো চেহারাটা আজকে পরিবর্তিত হয়ে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে মানুষ মানুষের জন্যে শুধু অনুভূতির বশবর্তী হয়ে সহমর্মিতার কারণে কাজ করে যাবে সেটা প্রায় স্রোতের বিপরীত। কাজেই আজকের পৃথিবীকে একটি বিশেষ পদ্ধতি যেভাবে গ্রাস করে ফেলছে তাতে ফিল্যানথ্রপির উদ্দেশ্য বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তনের চাইতে তাকে সমর্থন করাই মূলত। বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ বা এনজিও ধরনের আরো যত প্রতিষ্ঠান আছে, এদের এখন একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে– তথাকথিত ফিল্যানথ্রপির অন্তরালে মূলত নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে মানুষকে একটি অসহায় জায়গায় আটকে রাখা।

হালখাতা
তাহলে আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আগেকার দিনে কারো সম্পত্তি থাকলে সে যে ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো করত সেখানে অন্তত দুরভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু আজকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ফিল্যানথ্রপির নাম করে নানা রকম কূটকৌশলের মাধ্যমে মানুষকে দীর্ঘমেয়াদি পরাধীনতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তাহলে আপনি কি এটা

বলতে চাচ্ছেন যে আগেকার দিনের তুলনায় এখন মানুষের ভেতরকার কল্যাণবোধ জটিলতর একটি অবস্থানে পৌঁছেছে?

আনু মুহাম্মদ

সেটা তো বটেই। চারদিকে তাকালে আমরা হয়তো দেখব দালানকোঠা বেড়েছে, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল বেড়েছে, বড় বড় মার্কেট হয়েছে। কিন্তু মানুষের অন্তরের জায়গা আগের তুলনায় সংকুচিত হয়েছে। ধরা যাক্ একটি স্কুল বা কলেজ– এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেটা হল একটি বিশাল খোলা মাঠ থাকবে, বড় পুকুর থাকবে, বড় বড় ভবন থাকবে ইত্যাদি। এবং এরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে-কটা স্কুল, কলেজ বাংলাদেশে এখনও আছে, সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জমিদার আমলে। অথচ আজকের যুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানেই হল আটকা, চারদিক বন্ধ একটি দালান যার সঙ্গে একটি সুপার মার্কেটের কোনো পার্থক্য থাকে না।

হালখাতা

স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট– এগুলো নির্মাণ করা তো সরকারের দায়িত্ব; তো প্রশ্ন হল সরকারের দায়িত্বের সঙ্গে ফিল্যানথ্রপির কী ধরনের সম্পর্ক বা বিরোধ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

আনু মুহাম্মদ

আমি মনে করি একটি বৈষম্য, দরিদ্র্য নির্যাতনমূলক সমাজব্যবস্থাতেই ফিল্যানথ্রপির প্রশ্নটি আসে। কেননা একটি রাষ্ট্র চালায় সরকার, সেখানে সরকারই যদি দায়িত্ব নিয়ে মানুষের যাবতীয় অভাব দূর করে দেয়– অর্থাৎ রাষ্ট্র নিজেই যদি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে দেয় তাহলে কোনো ব্যক্তির ফিল্যানথ্রপির আর দরকার থাকে না। আসলে আমরা ব্যক্তির কাছ থেকে দান, ফিল্যানথ্রপি বা চ্যারিটি সম্পর্কিত বিষয় তখনই আশা করি যখন রাষ্ট্র মানুষের অভাব পূরণে ব্যর্থ হয়।

হালখাতা

আনু মুহাম্মদ যে কথাটি বললেন এ বিষয়ে মঈন চৌধুরী আপনার মতামত আমরা জানতে চাচ্ছি।

মঈন চৌধুরী

আনু মুহাম্মদের এ কথাটির সাথে আমি পুরোপুরি একমত নই। সরকার ব্যর্থ হলেই ফিল্যানথ্রপির প্রসঙ্গটি আসবে বিষয়টি বোধহয় পুরোপুরি এ রকম নয়। কারণ আমি আমার বাবার নামে একটি হাসপাতাল বানাব, আমার মায়ের নামে একটি কলেজ বানাব– এটা সরকারের যথাযথ উদ্যোগের পরও অর্থাৎ যতগুলো হাসপাতাল বা কলেজ

থাকা প্রয়োজন সেই অনুপাতে থাকার পরও একজন ব্যক্তি কিন্তু হাসপাতাল বা কলেজ নির্মাণ করতেই পারে। ব্যক্তির এই রকম কাজের পিছনে অপরের জন্য কল্যাণ করার বিষয়টি যেমন আছে একই সঙ্গে নিজের বাবা বা মায়ের নামে কিছু একটা করা হল– এই আত্মতৃপ্তিও তার থাকতে পারে। কাজেই ব্যক্তিমানুষের চিরন্তন যে বোধ অর্থাৎ সমাজের জন্য কিছু করা, সেটা সবসময় সরকারের ব্যর্থতার কারণ দ্বারা বুঝতে চাওয়া সঙ্গত হবে না। বরং আমাদের বুঝতে হবে একজন ব্যক্তি কোন স্বার্থ বা সহানুভূতি থেকে কাজটি করছে।

হালখাতা

আপনি যে ফিল্যানথ্রপির পজেটিভ দিকের কথা উল্লেখ করলেন, কিন্তু একই দৃষ্টিকোণ থেকে এর নেগেটিভ দিকও তো আছে?

মঈন চৌধুরী

পজেটিভ আর নেগেটিভ দিক সবসময় ছিল। আগেকার দিনে, সামন্ত যুগেও, জগন্নাথ কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী হাই স্কুল ইত্যাদি সহ অনেক বড় বড় স্কুল, কলেজ তৈরি হয়েছে অথচ এ যুগে ফিল্যানথ্রপি করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় যত্রতত্র মসজিদ-মন্দির বানাচ্ছে। এক ঢাকা শহরেই যতগুলো মসজিদ হয়েছে, এর সংখ্যা তো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও যথাযথ নয়। অনেক সময় দেখা যায় একটি মসজিদের ডোনার বড় দুর্নীতির সাথে যুক্ত। আবার এত মসজিদ হওয়া সত্ত্বেও শুক্রবারে দেখা যায়, মসজিদে লোক ধরে না, শেষে মানুষজন রাস্তায় নেমে আসে নামায পড়ার জন্য। কথা হল, এত মসজিদ, এত নামাজী থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি কিন্তু কমছে না। আর এই মসজিদ বানাতে যারা পয়সা দেয় তারা তাদের দুর্নীতির পরিচয়টি আড়াল করার জন্যই মসজিদ-মাদ্রাসা বানিয়ে দিচ্ছে। তবে এ কথা আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে সব ধর্মপ্রাণ মানুষই দূর্নীতিগ্রস্থ নন, প্রকৃত স্রষ্টা-প্রেমই কাজ করে বেশির ভাগ ধর্মপ্রাণের ক্ষেত্রে। কিন্তু দুর্নীতিকে আড়াল করার জন্য করা ফিল্যানথ্রপির মানে বুঝতে কারোর আর বাকি থাকে না। এ যুগেও মানুষ অনেক স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল বানাচ্ছে কিন্তু সেটা ব্যবসার জন্য। ব্যবসা আবার দু'ধরনের: একটি হল দেশের মানুষের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে শিক্ষা বা চিকিৎসার সুযোগ দেয়া আর অপরটি হল দেশের বাইরে থেকে ডোনেশন আনার মধ্য দিয়ে। এই ডোনেশনের বেশির ভাগ আবার লুটপাট হয়ে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে সামন্ত আমলেও যতটা ফিল্যানথ্রপিক কাজ হত এখন সেটা ব্যবসা ও চুরিতে রূপ নিয়েছে।

হালখাতা

এবার আনু মুহাম্মদের কাছে অবার ফিরে আসি। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই যে এনজিও, বিভিন্ন রকম ফাউন্ডেশন, ডোনার এজেন্সি, চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে; এগুলোকে ফিল্যানথ্রপিক দিক থেকে কীভাবে দেখবেন?

আনু মুহাম্মদ

এ ধরনের অর্গানাইজেশনের কাজকে ঠিক ফিল্যানথ্রপি বলা যায় না। ইদানিং 'করপোরেট স্যোশাল রেসপনসিবিলিটি' বলে একটি কথা চালু হচ্ছে। এই কথার মানে হচ্ছে আমরা শুধু ব্যবসাই করব না; জনগণের সেবাও করব। মুহম্মদ ইউনুস তো এখন আবার 'সামাজিক ব্যবসা' নামে একটি কথা চালু করেছেন। তার এপ্রোচ থেকে অনেকেই ভাববে এটা একটা নতুন কথা, একটা নতুন ব্যবসার কথা বলা হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের মতো একটি প্রতিষ্ঠান বলছে যে আমরা সামাজিক ব্যবসা করছি এবং আরও বলছে এটা তো কোনো 'ব্যক্তি-মালিকানা' প্রতিষ্ঠান নয়। কথা হচ্ছে, 'ব্যক্তি-মালিকানাধীন' কথাটির মানে এখন একটা বেশ ইন্টারেস্টিং জায়গায় এসে পৌঁছেছে। গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, ব্রাক এসব প্রতিষ্ঠান ফরমালি ব্যক্তি-মালিকানাধীন নয় কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে একজন ব্যক্তিই তো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সেই পদস্থ ব্যক্তির তো কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। ব্যক্তি সালমান রহমান, এর চেয়ে আর কী বেশি নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যক্তি সালমান রহমানের জীবনে মুহম্মদ ইউনুসের চেয়ে আর কী বেশি কর্তৃত্ব থাকতে পারে? ব্যক্তি-মালিকানা ফরমালি না থাকুক কিন্তু এটা তো 'নিউ ফর্ম অব প্রাইভেট ওনারশীপ'। সেখানে এরা চ্যারিটি বা দাতব্য অর্গানাইজেশন হিসেবে রেজিস্টার্ড। কিন্তু এগুলো তো আসলে দাতব্য নয়। এখানে ফান্ড আসছে, ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, মুনাফা হচ্ছে, বড় বড় এমাউন্টের বেতন নেয়া হচ্ছে, একটা ওয়েল অর্গানাইজড্ ওয়েতে সবকিছু হচ্ছে– তো এটা চ্যারিটি বা ফিল্যানথ্রপি হয় কী করে? অথচ চ্যারিটি, দাতব্য বা ফিল্যানথ্রপিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এরা রেজিস্টার্ড। আমরা তো জানি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান হতে গেলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনেক ত্যাগ-তীতিক্ষা করতে হয়, অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু এখানে তো সেরকম কিছু নেই। এখানে তারা প্রফেশনাল বডি বা কর্পোরেট বডি হয়ে কাজ করছে। এবং সেখানে তার রিটার্নের জন্যে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম আছে। তারা গরিব মানুষকে ঋণ দিচ্ছে, বলছে গরিব মানুষের উপকার করছি। এটা যদি এমন হয় কোনো কারখানার মালিক কারখানা দিয়ে বলছে আমি গরিব মানুষের উপকার করছি– এটা তো শুধু বললে হবে না? কারখানার মালিক যেমন নিজের স্বার্থেই কারখানা দেয় একইভাবে এনজিওগুলো নিজেদের মুনাফার স্বার্থেই সুদের উচ্চ হারে ঋণ দিয়ে থাকে। কথা হল এটা তো ব্যবসা করার জন্য সে করছে, এটা তো গরিব মানুষকে উপকার করার জন্য সে করেনি। এখনকার তথাকথিত 'ডোনার' এদেরই গোত্রভুক্ত– আধিপত্য তৈরির প্রক্রিয়ার অংশ।

হালখাতা

কিন্তু যদি এমন হয় যে গরিব মানুষের উপকার করতে গিয়ে ব্যবসাটাও হয়ে যাচ্ছে? আর এই ব্যবসার মুনাফা তো ব্যক্তি নিতে পারছে না?

আনু মুহাম্মদ

(কিছুটা উত্তেজিত হয়ে) মানুষের উপকার করতে গিয়ে মানে কী? এখন একজন জমিদার আগে যে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করত, সেটা তো সে কোনো রিটার্নের জন্য করত না। কিন্তু এখন কী দেখা যাচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে কেউ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে, কিন্ডার গার্টেন বানাচ্ছে, কোচিং সেন্টার তৈরি করছে– এগুলোর প্রত্যেকটি হচ্ছে রিটার্নের জন্য। কিন্তু কোনো জমিদার হয়তো স্কুল প্রতিষ্ঠা করত তার মায়ের নামে বা তার বাবার নামে; সেখানেও হয়তো একধরনের রিটার্নের ব্যাপার আছে, সে হয়তো সওয়াবের জন্য এটা করত কিংবা নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য করত। এখন জমিদারদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার পেছনে যে রিটার্ন আর বর্তমান সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার ক্ষেত্রে যে রিটার্ন– এই দুই রিটার্ন এক জিনিস নয়। আর চ্যারিটি বা দাতব্য হিসাবে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রেজিস্টার্ড, সেগুলোর রিটার্ন বা আয়-রোজগার কাগজ-কলমে শুধু দেখানো হয় যে সেটা ব্যক্তি না পেয়ে প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে একজন ব্যক্তি যখন দিনের পর দিন কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ধরে রাখে, তখন তাকে ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিকই বলা চলে। এবং সেই প্রতিষ্ঠানের আয়-রোজগার বা রিটার্ন কীভাবে ভোগ করা হবে সেটা ঐ একক ব্যক্তির ওপরই নির্ভর করে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের কম বেতন দেয়া হয় এবং তাদের নানা রকম শোষণ-নিপীড়ন করা হয় কিন্তু একটু উপর লেবেলে বা নির্বাহী লেবেলে মোটা অংকের বেতন এবং অতি বিলাসিতাপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। কাজেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের রিটার্ন অবশ্যই শেষ পর্যন্ত গুটিকয়েক ব্যক্তিই ভোগ করে।

হালখাতা

মঈন চৌধুরী এ ব্যাপারে আপনি বলবেন কি, এই যে দাতব্য বা চ্যারিটি হিসেবে রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থাৎ আমাদের দেশের এনজিওগুলোতে যে রিটার্ন আসে, কাগজ-কলমে আছে যে, এর ভোক্তা কোনো ব্যক্তি হতে পারবে না। কিন্তু আনু মুহাম্মদ যে বললেন এ ধরনের রিটার্ন এবং কর্তৃত্বের মালিক শেষ পর্যন্ত আসলে গুটিকয় ব্যক্তি-ই, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

মঈন চৌধুরী

সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ক্ষেত্রে একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই বোর্ডের অধিকাংশ মেম্বারগণই সেখান থেকে কোনো সুবিধা নেন না। শুধু নির্বাহী

দায়িত্বে যিনি বা যারা থাকেন তিনি বা তারাই আর্থিক সুবিধা নিয়ে থাকেন। এ ধরনের বহু প্রতিষ্ঠানের নাম আমি করতে পারব।

আর আনু মুহাম্মদ যে বললেন, সেখানেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিই সব কিছু। এক্ষেত্রে আমি তার সঙ্গে একমত এ অর্থে যে, আসলে যে কোনো ছোট বা বড় উদ্যোগের পেছনে ব্যক্তিরই অবদান মুখ্য। সেই ব্যক্তির কর্মকাণ্ডকে ঘিরে যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গড়ে ওঠে, সেটা ফাংশন করে বহুসংখ্যক মানুষের কারণে। এমনকি কার্ল মার্কস যে চিন্তা আমাদের দিয়েছেন সে চিন্তাও তো একজন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রথম এসেছে। পরে সেই চিন্তা ফাংশন করেছে বহুজনের কারণে। কাজেই কোনো-না-কোনোভাবে ব্যক্তিই কিন্তু প্রধান হয়ে ওঠে; এই সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা আমরা করতে পারি কিন্তু এর সমাধানের পথ কিন্তু এখনও আমাদের অজানা।

আনু মুহাম্মদ

আমি বলেছি, এই যে ফজলে হাসান আবেদ বা মুহম্মদ ইউনুস– ওনারা তো প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষমতার মালিক হয়ে আছেন; অর্থাৎ একজন সালমান এফ. রহমান যে মালিক তার সাথে ওনাদের কোনোই পার্থক্য নেই। ফলে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যটা আর রইল কোথায়?

হালখাতা

আনু মুহাম্মদের কাছে জানতে চাই, ক্যাপিটালিজম-এর দুনিয়ায় ফিল্যানথ্রপির মতো বিষয়টি আসলে আমরা কীভাবে দেখব?

আনু মুহাম্মদ

এটি একটি ভালো প্রশ্ন। ক্যাপিটালিজম তো মুনাফা আর লাভ ছাড়া কিছু বোঝে না। যে কারণে সমাজ থেকে এবং মানুষের মন থেকে পারস্পরিক সংহতি, সংবেদনশীলতাও দুর্বল হয়ে যায়। বরং প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, কীভাবে সে ব্যবসা করবে, মুনাফা করবে বা লাভ করবে। মানুষ দেখে যে যেকোনোভাবে টাকা বানালেই ভালো থাকা যায়, ভালো খাওয়া যায় ইত্যাদি। কাজেই অন্যের কী হল সেটা দেখার কিন্তু কোনো সময়ই কারো নেই। সবাই ভাবছে নিজে বাঁচলেই সব হয়ে গেল।

সে রকম একটি বাণিজ্যের, মুনাফার বা শুধু লাভালাভের পৃথিবীতে প্রকৃত ফিল্যানথ্রপির মতো একটি বিষয় নিয়ে কেউ ভাবলে, সেটাই ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায়।

মঈন চৌধুরী

এ বিষয়ে আমি একটু বলতে চাই। সেটা হল, বাণিজ্যের এই যুগে যারা ফিল্যানথ্রপি করছে সেই ফিল্যানথ্রপিক মোটিভ নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন রয়েছে। যেমন বড় বড় ডোনেশন নিয়ে বা পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে লাইব্রেরি বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান করা যায়। কিন্তু নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার মালঞ্চ গ্রামে জন্মগ্রহণকারী পলান সরকার নামের যে মানুষটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বই পড়াচ্ছেন, সেটা কিন্তু ডোনেশন-নির্ভর প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পলান সরকার তার ক্ষমতার হয়তো একশ ভাগই ব্যয় করছেন। কিন্তু ডোনেশন নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা হয়তো তাদের ক্ষমতার ৬০ বা ৭০ ভাগ ব্যয় করছেন। আমি মনে করি এই পলান সরকার হচ্ছেন প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্ট।

হালখাতা

কিন্তু প্রশ্ন হল পলান সরকার যতই প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্ট হন, তাকে তো ঠিকই একটি মোবাইল কোম্পানি তাদের বাণিজ্য কিংবা মুনাফার কাজে ব্যবহার করে ফেলল। অর্থাৎ পলান সরকারের অর্জন বাণিজ্যিক মূল্যে বিক্রি করে ফায়দা নিলো ঐ মোবাইল কোম্পানি! এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রথমত পলান সরকার বা আব্দুল কুদ্দুস বয়াতিদের অর্থের কারণে ব্যবহৃত হয়ে যেতে দেখা যায়। এবং দ্বিতীয়ত, যাদের হাতে ব্যবহৃত হল তারা এতই শক্তিধর যে তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া আদৌ কি পলান সরকার বা আব্দুল কুদ্দুস বয়াতিদের পক্ষে সম্ভব? এ ব্যাপারে আনু মুহাম্মদ আপনি যদি কিছু বলেন?

আনু মুহাম্মদ

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে রেহাই পাওয়া পলান সরকার কেন, এক সেন্সে কারোর পক্ষেই সম্ভব না। তবে আশার কথা এই যে, কোনো শক্তি চাইলেই মানুষ সেরকম হয়ে যাবে এমনটি সবসময় দেখা যায় না। সুনির্দিষ্ট ছকে বেঁধে রাখতে চাইলে কিংবা সুনির্দিষ্ট ডাইসে মানুষকে তৈরি করতে গেলে মানুষ কিন্তু সবসময় সেটা মেনে নেয় না বরং এর উল্টোটাও মানুষকে করতে দেখা যায়। সবাইকে যেখানে টাকা-মুনাফা-লাভের পিছনে দৌড়ানোর জন্য একধরনের মনস্তত্ত্ব তৈরি করে দেয়া হচ্ছে, সেখানে কোনো কোনো মানুষ কিন্তু টাকাপয়সাকে অনেক তুচ্ছ করেও দেখছে। একটি বড় অর্থকরীকে বা ধন-সম্পদকে বা ক্ষমতাকে তুচ্ছ করে দেখতে বা সেরকম মতাদর্শিকে অতিক্রম করতে হলে বড় মন লাগে। আমাদের আশার জায়গা এখানেই যে এ ধরনের লোকও আমাদের সমাজে আছে। সব সমাজেই থাকে।

আমি মনে করি পলান সরকার বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়ার জন্যে কাজ করেন নি। মোবাইল কোম্পানিটি তার বাণিজ্যের স্বার্থেই পলান সরকারকে মিডিয়ায় ব্যবহার করেছে, এতে করে শুধু মোবাইল কোম্পানিই যে উপকৃত হয়েছে তা নয়। তারা পলান

সরকারকে ব্যবহার না করলে আমরাও হয়তো পলান সরকার সম্পর্কে জানতে পারতাম না। আমরা জানার পরে কী ঘটছে? আমরা পলান সরকারকে ঠিকই গ্রহণ করলাম কিন্তু তাকে নিয়ে কোনো বাণিজ্যিক তৎপরতাকে আমরা কিন্তু গ্রহণ করলাম না বরং বাণিজ্যিক তৎপরতার সমালোচনায় আমরা লিপ্ত হলাম। এমনকি পলান সরকারের পক্ষ নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম তাকে নিয়ে বাণিজ্য করার কুকীর্তির বিরুদ্ধে। আমি বলব এখানেই পলান সরকারদের শক্তি কতখানি সেটা বোঝা যায়। আর এটাই আমাদের আশার বিষয়।

হালখাতা

প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্টরা এভাবে মানুষের কল্যাণ করছেন আর রাজনীতিকরা করছেন ভিন্নভাবে। এ দু'ধারাকে পাশাপাশি রেখে আপনি কিভাবে এদের ব্যাখ্যা করবেন?

আনু মুহাম্মদ

হাজী মুহম্মদ মুহসিন, রণদা প্রসাদ সাহা ওনারা বড় ধরনের দাতা। এটা হল একটি দিক। আবার প্রচলিত যে পদ্ধতি আছে, যে পদ্ধতির ভেতর দিয়ে মানুষের উপকার করা হয়, সে পদ্ধতির বাইরে এসে বিষয়টিকে যারা বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ করবে এবং পৃথিবীর মানুষের মুক্তির জন্যে সেভাবে কাজ করবে তাদের তো শুধু ফিল্যানথ্রপি শব্দ দিয়ে বোঝা যাবে না। তাদের কর্মকাণ্ড ফিল্যানথ্রপির চেয়ে অনেক বড়। সে কাজের বিস্তারই প্রয়োজন।

হালখাতা

ফিল্যানথ্রপি বা লোকহিতৈষণা সাধারণত ধনিক শ্রেণীই করছে। তাহলে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যাদের পয়সা নেই ফিল্যানথ্রপির ক্ষেত্রে তাদের জায়গা কোথায়? গরিব বা যাদের পয়সা নেই তারা কি ফিল্যানথ্রপি করবে না? নাকি ধনীরা সবসময় সেবা দিবে আর যাদের পয়সা নেই তারা সবসময় সেবা নিবে?

আনু মুহাম্মদ

এটাতো আলাদা কিছু নয়। সামাজিক প্রভাব যেভাবে সৃষ্টি হয়, ইতিহাস যেভাবে তৈরি হয়, যেভাবে মানুষের জ্ঞানস্তর তৈরি হয় কিংবা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে খবরগুলো যেভাবে পুনরুৎপাদিত হয়– এসব বিষয় যেভাবে ঘটে ফিল্যানথ্রপি বা লোকহিতৈষণার সংবাদটিও সেভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে। যাদের অর্থ নাই তাদের মধ্যেও অসংখ্য ঘটনা আছে যে নিজের অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েও তারা অন্যের উপকার করেছে। কিন্তু সেসব ঘটনা তো ইতিহাস হয়নি, সংবাদ হয়নি বা বইপুস্তকেও আসিনি। অর্থাৎ

সেগুলো আমরা কোনোভাবেই জানি না। তবে নিম্নবর্গের ইতিহাস যেমন লেখা হয়েছে, তেমনিভাবে যাদের পয়সা নেই অথচ আপামর জনগণের মুক্তির জন্য কাজ করে থাকে তাদের ইতিহাসও হয়তো একদিন লিখিত হবে। তখন আমরা খুব সহজেই জানতে পারব যে অর্থকরী বা টাকা-পয়সা না থাকলেও ফিল্যানথ্রপি বা লোকহিতৈষী কাজ তাদের অনেকেই করেছে। তখন এটাকে মানুষ শুধু ধনিক শ্রেণীর কাজ হিসেবে বিবেচনা করবে না।

হালখাতা

নারী ফিল্যানথ্রপিস্টদের কথা কিন্তু শোনাই যায় না। অথচ পরোপকার বা জনকল্যাণের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান কিন্তু কোনো অংশেই কম না। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

আনু মুহাম্মদ

নারীদের ভেতরে অনেক ফিল্যানথ্রপিস্ট আছে যাদের কথা আমরা জানিই না। এটা এ কারণেই হতে পারে যে নারীদের হাতে তো সম্পদ ছিল না, যে কারণে সম্পদ দিয়ে যেভাবে ফিল্যানথ্রপি করতে হয় সে ধরনের ফিল্যানথ্রপি হয়তো তাদের সেই অর্থে নেই। কিন্তু চোখের আড়ালে দৃষ্টির অন্তরালে অতি গোপনে তারা যে সেবাটা দিয়ে থাকে কিংবা অন্যকে সহযোগিতা করে থাকে সেই ইতিহাস কিন্তু আমাদের সামনে আসে না। কাজেই এসব ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নারীর যে অংশগ্রহণ সেটাও লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

হালখাতা

নারীর ফিল্যানথ্রপিস্টদের সংবাদ যে একেবারেই পাচ্ছি না তা কিন্তু না। যেমন বরিশালের মনোরমা মাসিমা, চট্টগ্রামের রমা চৌধুরীর কথা আমরা জানি।

আনু মুহাম্মদ

সেটা হাতে-গোনা দু'একজনের কথা হয়তো আমরা জানি। মনোরমা মাসিমা – উনি তো জমিদার পরিবারের সদস্য হিসেবে কাজ করার এক ধরনের সুযোগ পেয়েছেন, যদিও রমা চৌধুরীর বিষয়টি আলাদা। আমি বলছি যে এ ধরনের আরো নারী ফিল্যানথ্রপিস্ট রয়েছেন যাদের ইতিহাস লিখিত হওয়া প্রয়োজন। এমন অনেক নারী আছেন যাদের অবদানের কথা শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়, যদিও তাদের সে অবদান সবসময় অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যা আমাদের জানা থাকা জরুরি।

হালখাতা

মঈন চৌধুরীর কাছে জানতে চাই ফিল্যানথ্রপি দিয়ে একটি রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তন করা সম্ভব?

মঈন চৌধুরী

একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি, মানুষ কিন্তু যতই নির্যাতিত শোষিত হয় ততই মানুষ সেটা ভুলে যায়। যেমন এরশাদ সাহেব নয় বছর দূর্নীতি করে যে রাষ্ট্র চালালেন আর এখন আমি অনেককেই বলতে শুনি এরশাদই ভালো ছিলো। সেই আইয়ুব খানকে এখনো অনেকে ভালো শাসক হিসেবে মনে করে। আমি বলতে চাচ্ছি, ফিল্যানথ্রপি দিয়ে একটি রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় বরং এরশাদ সাহেবদের মতো শাসকেরা ফিল্যানথ্রপি করেই, নয় বছর টিকে থাকতে পারে, যার অন্তরালে যে কুকীর্তি ছিল সেটা ঐ ফিল্যানথ্রপি দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব হয়েছে।

হালখাতা

মঈন চৌধুরী যে বললেন মানুষ নির্যাতিত-শোষিত হয়েও নিজেরটা নিজেরা বুঝতে পারে না, এর একটা চলমান প্রমাণ হল, মানুষকে এখনো বলতে শোনা যায়, এরশাদই ভালো ছিল কিংবা আইয়ুব খানই ভালো ছিল; এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

আনু মুহাম্মদ

একটি সমাজে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করে যখন সেই সমাজের মানুষের মধ্যে কোনো ভবিষ্যতের আশা না থাকে। পুরো রাষ্ট্র ও সমাজটাই যখন স্থবির হয়ে পড়ে তখন ঐ রাষ্ট্র ও সমাজের মানুষের মধ্যে বর্তমান নিয়ে হতাশা দেখা দেয় এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েও যখন কোনো ভরসা পায় না তখন ঐ রাষ্ট্র ও সমাজের মানুষ অতীতমুখী হয়ে পড়ে। তখন সেই সমাজের মানুষকে বলতে শোনা যায় এরশাদই ভালো ছিল কিংবা আইয়ুব খানই ভালো ছিল। ভবিষ্যতের কোনো একটি পজিটিভ কিছু যদি সে দেখতে পেত তাহলে কিন্তু সে অতীতের ঐ সমস্ত লোককে কথা মানুষ বলত না।

হালখাতা

কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে মানুষের উত্তরণ ঘটতে পারে কীভাবে?

আনু মুহাম্মদ

এ ধরনের পরিস্থিতি আবার স্থায়ী কোনো ব্যাপার নয়, সেটাই আমাদের ভরসার জায়গা। এ ধরনের পরিস্থিতি মাঝে মাঝে আসে আবার এর উল্টো পরিস্থিতিও আসে। সেটা হল মানুষকে ছক বেঁধে দিলেই সকল মানুষ ঐ ছক অনুসারে তৈরি হয় না। পূর্ব নির্ধারিত ঐ ছকের বাইরেও মানুষ আসতে চায়। আমরা যখন দেখি কোনো কোনো মানুষের মধ্যে কোনো-না-কোনোভাবে আর একটি সামষ্টিক বোধ তৈরি হয় তখন আমাদের মনে আশা তৈরি হয় এই কারণে যে ঐ সামষ্টিক বোধ দিয়ে সে বর্তমান কিংবা অতীতকে অতিক্রম করে আরেক ধরনের প্রতিরোধ তৈরি করে এবং

পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। এভাবে সে তার নিজের জীবনও দিয়ে দেয়। তখন দেখা যায় ঐ দিনের সমাজ এবং তার কিছুদিন আগের সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। যেমন সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা বলি , ধরা যাক ফুলবাড়ীর কথা; এমনিতে দেখা যায় সাধারণ মানুষ হয়তো প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে ভয় পায় বা প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পায় কিংবা ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে নমনীয় হয়ে থাকে। কিন্তু ফুলবাড়িতে দেখা গেলো এক বিটিশ কম্পানি এসে মানুষকে কেনা শুরু করল। একটি সত্য ঘটনা বলি, ফুলবাড়িতে– একজন ভূমিহীন দিনমজুর, তার ছনের ঘর, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না তারপর আবার মাইনরিটি; কয়লাখনি চাইনা এই বলে সে আবার মিছিল করে। এমন অবস্থায় কোম্পানির লোক গিয়ে বলে, তুমি নাকি এই এই সমস্যায় আছ? তখন উনি বল্লেন সমস্যায় তো আছিই। কোম্পানির লোক বল্ল তোমাকে নিয়ে আমরা তো খুব ভাবি, যদি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সাহায্য লাগে..., তখন ঐ লোক তো বুঝে ফেলেছে ঘটনা কোনদিকে যাচ্ছে। কোম্পানির লোক বল্ল তোমার জন্য আমরা ষাট হাজার টাকা বরাদ্দ করেছি, তুমি যদি চাও এখনই বিশ হাজার টাকা আমরা দিয়ে যেতে পারি। ঐ লোকের মাথা তখনও ঠাণ্ডা, আমাকে পরে বল্ল যে তার নিজের উঠানে বসে কথা বলছিল বলে তা না-হলে তাকে তখনই মাইর দেয়ার দরকার ছিল। এরপর কোম্পানির লোক বলে, বিনিময়ে তোমাকে তেমন কিছুই করতে হবে না, তুমি মিছিল-টিছিলে যাবে , তা না-হলে লোকজনে আবার সন্দেহ করবে কিন্তু লোকজনকে ডাকাডাকি করে যে মিছিলে নিয়ে যাও এটা করবে না আর মিটিং টিটিংয়ে গেলে টুকটাক তথ্য আমাদের একটু জানাবে। সে কোনোভাবেই যখন থামছে না তখন তার বউ ঝাটা হাতে করে ঝাটা উচিয়ে বলছে, গোলামের পুত তুই গোলাম হইছস আমাগোও গোলাম বানাইতে চাস!... তো এরকম ঘটনাও কিন্তু ঘটছে। এভাবে সামষ্টিক স্বার্থ ব্যক্তি-স্বার্থকে অতিক্রম করে যায়, এটা যখন একটি সমাজে ঘটে তখন তার রেজাল্ট অন্যরকম হয়। ফুলবাড়িতে যেকারণে গণমানুষের আন্দোলনকে আর প্রতিরোধ করা গেল না। একইভাবে জাতীয় ক্ষেত্রেও মানুষ যখন ব্যক্তিগত স্বার্থকে এভাবে অতিক্রম করে যায় তখন মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টির শক্তিও মানুষ তার নিজের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম হয়।

হালখাতা

শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সময় দেয়ার জন্য হালখাতা'র পক্ষ থেকে আপনাদের দু'জনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্র ব ন্ধ

লোকহিত? কোন লোক? কীভাবে?

জা কি র তা লু ক দা র

ঋগ্বেদে নিতান্ত অনবধানবশত সম্ভবত সংকলকরা একটি শব্দ রেখে দিয়েছিলেন। বলা হত ঋষিরা যদি বেদের মূল ভাব অক্ষুণ্ন রেখে একটি শব্দও কমিয়ে ফেলতে পারতেন, তাহলে তাঁরা পুত্রলাভের আনন্দ ও পুণ্য লাভ করতেন। আসলে এখানে সম্পাদনার কথা বলা হয়েছে। যুগোপযোগী সম্পাদনা। যাতে করে বেদকে পরবর্তী যুগের মানুষ ইতিহাসের চিহ্ন হিসাবে না ধরে শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ ভেবে মাথায় তুলে রাখতে পারে। ভুলক্রমে হতে পারে। আবার হতে পারে এই ভেবে যে শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য হয়তো পরবর্তী যুগের মানুষরা ভুলে গেছে। অতএব শব্দটি বিদ্যমান থাকলেও হয়তো তা সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে সেভাবে আর আগামী দিনের মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হতে পারবে না।

শব্দটি 'ঋত'।

ভারততত্ত্ববিদ ভিটারনিৎসের মতে ঋত হচ্ছে সৌরজাগতিক শৃঙ্খলা। আর ম্যাকডোনেল ঋতকে বলছেন বাহ্যিক এবং নৈতিক নিয়ম। প্রায় সমসুরেই বলেছেন রাধাকৃষ্ণন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো যে একপেশে সেকথা প্রথম জোরে-শোরে উত্থাপন করলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে ঋত বলতে নিশ্চিতভাবেই আরো কিছু বোঝানো হত যেদিকে আধুনিক পাশ্চাত্যম্মন্য পণ্ডিতরা নজর দিতে চাননি। ঋত প্রসঙ্গে যেটি সর্বাগ্রে লক্ষণীয় তা হচ্ছে বৈদিক যুগের অনেক কবি ঋতের অবলুপ্তির জন্য দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং ঋত যাতে আবার স্বমহিমায় ফিরে আসে তার জন্য আকুল প্রার্থনা করছেন। ঋত যদি নিছকই নিয়মশাসিত প্রকৃতির প্রতীক হয়, তাহলে তা অবলুপ্তই বা হবে কেন, সেই অবলুপ্তির জন্য বিলাপই বা করা হবে কেন, তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রার্থনাই-বা করা হবে কেন? দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঋগ্বেদের অনেকগুলো শ্লোক বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে ঋত মানুষকে অন্ন, গোধন ও জীবনের অপরাপর প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। ঋতই সবকিছুর পরিচালক। অ্যাঙ্গেলস-এর অনুসরণে দেবীপ্রসাদ দাবি করছেন যে ঋত হচ্ছে প্রাচীন কৌম সমাজের ন্যায়নীতির অনুশাসন, যার অবলুপ্তির বেদনা বৈদিক কবিরা

অনুভব করেছিলেন। একমাত্র অবিভক্ত তথা আদিম সাম্যবাদী সমাজের প্রেক্ষিতেই ঋত-এর সঠিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যায়। যে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল না, তখনকার যৌথজীবন ছিল যৌথশ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যৌথশ্রম থেকে আহরিত বা উৎপাদিত বা সংগৃহীত সম্পদও সকলে ভাগ করে নিয়ে ভোগ করত। এই 'ভাগ করে ভোগ করা'ই ছিল ঋতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সমানতা তখনকার সূক্তগুলোর প্রধান আবেদন। তিনটি সূক্তে পর পর বলা হচ্ছে–'তোমরা একত্রে মিলিত হও, এককণ্ঠে ঘোষণা করো, একত্রে মন বিনিময় করো; যেরূপ অতীতের দেবতাগণ সচেতনভাবে একত্রে বসিয়া তাঁহাদের ভাগ গ্রহণ করিতেন।'

'মন্ত্র সমান হউক, সমিতি সমান হউক, মন সমান হউক, বিচার একরূপ হউক। তোমাদের সহিত একই মন্ত্রে আমি মন্ত্রণা করি, তোমাদের সহিত একই হবি দ্বারা আমি হোম করি।'

'তোমাদের প্রচেষ্টা সমান হউক, হৃদয়গুলো এক হউক, মন এক হউক–যাহাতে তোমাদের ঐক্য স্থাপিত হয়।'

সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন–'অন্যান্য আদিম সমাজের মতো বৈদিক কবিরাও আদিতে যৌথজীবন যাপন করতেন; তখন তাদের সমাজ-সংগঠন প্রাক-বিভক্ত বা আদিম সাম্য সমাজ। এই পর্যায়ের চেতনাই ঋত-র পরিকল্পনায় প্রতিফলিত। কিন্তু কালক্রমে–বিশেষত যুদ্ধ ও লুণ্ঠনমূলক কীর্তির প্রাধান্যের ফলে সেই আদিম সাম্য সংগঠন ধূলিস্মাৎ হয় এবং তারই ধ্বংসস্তূপের ওপর আবির্ভূত হয় ব্রাহ্মণ-সমর্থিত ক্ষত্রিয়-শাসিত সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। স্বভাবত ঋত-র চেতনাও তাই বিলীন হয়ে যায়।'

এখন আর সমান ভাগ নয়। এখন বৈষম্য এসে গেছে। শাস্ত্র তাকে এই বলে সমর্থন করছে যে–'যে হরিবান ইন্দ্র সোমযুক্ত ব্যক্তিকে বল প্রদান করেন এবং শত্রুরা যাহাকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রের ভাগ জয়শীল ব্যক্তির ভাগের ন্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক।'

যেখানে লোকসকল সমান সেখানে তথাকথিত লোকহিতের প্রশ্নই আসে না। ঋত তখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। 'লোকহিত' নামক ধারণাটিও তখন থেকেই উৎপন্ন। তখন দাতা শ্রেণীর উদ্ভব। যাদের হাতে উদ্বৃত্ত সম্পদ। মানুষ আকুল হয়ে যখন 'ঋত' ফিরিয়ে আনার জন্য সংগঠিত হয়, দাবি তোলে সমস্বরে, তখনই লোকহৈতৈষণার নামে সম্পদের কিছুটা প্রবাহ করা হয় দরিদ্রমুখি। যার আধুনিক নাম সংস্কার ও কল্যাণমূলক অর্থনীতির সমাজ। যেখানে 'সমাজের ধন' চুরি ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে বিত্তবানে পরিণত হওয়া 'আধুনিক ইন্দ্রদের', এনজিও নামধারী মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের ও করপোরেট পুঁজির ধারকদের বলা হয় 'লোকহিত'র মাধ্যমে ইহকালে নিজেদের আত্মপ্রসাদ ও পরকালে স্বর্গ লাভের সুযোগ গ্রহণ করতে এবং একই সাথে শোষিত মানুষকে বিপ্লবের পতাকাতলে সংহত হওয়ার প্রবণতা থেকে বিরত রাখতে।

দুই.

ফিল্যানথ্রপির ধারণাটিই সূক্ষ্ম বিচারে মানবজাতির জন্য অবমাননাকর। ধরিত্রীর সন্তান হিসাবে যা প্রত্যেক মানুষের ন্যায্য অধিকার, সেই অধিকারকে অস্বীকার করে তাকে দানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং সেই ধারণাটির সম্মতি শোষিত মানুষের কাছ থেকে প্রচারে- কৌশলে আদায় করে নেয়ার মাধ্যমে শোষকশ্রেণী এক ধরনের বিরাট বিজয় উদযাপন করে আসছে শত শত বছর ধরে। তাদের এই কাজে চিরদিন সহায়তা করে যাচ্ছে সমাজের এই ধরনের স্থিতাবস্থার সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। কেউ কেউ তো অন্য রকম কোনো সমাজের কথা ভাবতে বা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত পর্যন্ত নন। এমনকি যাঁদের যুগোত্তীর্ণ ও মহত্তম প্রতিভা বলেও মানবজাতি স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে, তাঁদেরও অনেকেই বিদ্যমান ব্যবস্থার অসঙ্গতি আমলে নিতে অস্বীকার করেছেন। গ্রীক নগররাষ্ট্রের গঠন ও তার ভিত্তি দাসপ্রথা নিয়ে প্লেটোর মনে কোনো প্রশ্ন তো জাগেইনি বরং তিনি এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে দাসপ্রথাকে ভিত্তি করে যে নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সেগুলো মানুষের জ্ঞানচর্চার প্রচণ্ড সহায়ক। প্লেটোর অনুভূতির আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায়–' আমরা চমৎকার একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি যার ফলে আমাদের নাগরিকবৃন্দ শারীরিক শ্রমের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হচ্ছেন। কারিগরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব তুলে দেয়া হয়েছে একটি শ্রেণীর হাতে, আর কৃষির দায়িত্ব পালন করছে দাসশ্রেণী। এরা সবাই মিলে আমাদের নাগরিকদের জন্য সেই রকম একটি অবকাশ তৈরি করে দিয়েছে যে অবকাশ বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার প্রাথমিক পূর্বশর্ত। আর বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চাই তো সেই নির্ণায়ক যা পশু থেকে পৃথক করেছে মানুষকে।' কিছু মানুষকে পশু থেকে পৃথক হয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার সুযোগ করে দিতে অন্য মানুষগুলো যে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের জন্য কি নাগরিক সমাজের কোনো করণীয় রয়েছে? প্লেটো বলছেন, আছে। তা হচ্ছে মাঝে মাঝে তাদের জন্য জনহিতকর কিছু পদক্ষেপ নেয়া, যাতে করে তারা ন্যূনতম শারীরিক সবলতা বজায় রেখে অব্যাহতভাবে 'বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চাকারী নাগরিক সমাজের' সেবা করে যেতে পারে।

শারীরিক শ্রমের সাথে জ্ঞানচর্চার এই বিযুক্তি মানবসমাজে শ্রেণীবিভক্তি এবং ভাববাদী দর্শনের উদ্ভবের জন্য দায়ী। আর যে বুদ্ধিজীবীরা এই বিভক্তিকে কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাঁরা ক্রমশই পরিণত হন মানবতাবিরোধী, অগণতান্ত্রিক, আত্মকেন্দ্রিক, সংবেদনাহীন এক প্রাণীতে যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে শোষক-শাসক শ্রেণীর মতাদর্শের পক্ষে যুক্তি (কুযুক্তি) ও সম্মতি সংগ্রহ করা। এরা দাবি করেন যে জ্ঞানই হচ্ছে ব্রহ্ম। ব্রহ্মচর্চা মানেই হচ্ছে জ্ঞানকে শ্রম থেকে বিযুক্ত করে নিয়ে তার চর্চায় মগ্ন থাকা। ব্রহ্ম শব্দটির যে এককালে অন্য অর্থ ছিল, এবং ব্রহ্ম বলতে এককালে অন্ন, পুরোহিত, যজ্ঞের উপকরণ–সবকিছুকেই বোঝানো হত, সেই জায়গা থেকে সরে এসে তাঁরা শব্দটির তাৎপর্যকে একটি বদ্ধ জায়গার মধ্যে সংকুচিত করে রেখেছেন।

শ্বেতকেতু অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তার পিতা তাকে কয়েকদিন খাদ্য না দিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে অন্নই ব্রহ্ম। আবার ভৃগুর ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ভৃগু প্রথমে সজ্ঞার দ্বারা বুঝে নিয়েছিলেন যে অন্নই যথার্থ ব্রহ্ম। কিন্তু তার কুল-পুরোহিতরা তাকে এই জ্ঞান থেকে সরে আসতে বাধ্য করেন এই বলে যে এটি নিতান্ত শিশ্নোদরসর্বস্বদের ভাবনা হতে পারে। তার মতো জ্ঞানচর্চাকারীর এই চিন্তা শোভা পায় না। জাতিচ্যুত হবার ভয়ে ভৃগু এই চেতনা থেকে সরে আসতে বাধ্য। আর শ্বেতকেতুর পিতাও পরবর্তীকালে তাকে এই চিন্তায় স্থিত রাখতে পারেননি। দেখা যাচ্ছে ভাববাদের নামে এমন এক দার্শনিক মতবাদের সূচনা হচ্ছে যার মূল কথাই হচ্ছে জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করে 'বিশুদ্ধ যুক্তি' বা 'বিশুদ্ধ জ্ঞানকে' অবলম্বন করা। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্মের কোনো স্থান নেই। এটি তখনই সম্ভব হতে পারে যখন সমাজের একটি শ্রেণী অপরের উৎপাদিত উদ্বৃত্তে জীবনধারণের সুযোগ পায়। দৈহিক শ্রমের বাধ্যবাধকতা না থাকার দরুন বাস্তব জগতের স্থূল দিকগুলোর প্রতি তাদের কোনো মানসিক বাধ্যবাধকতা থাকে না। কেননা শ্রম, কর্ম ও জ্ঞানের সম্মেলন দ্বারাই একমাত্র বাস্তব জগতকে চেনা যায়। কিন্তু দাবি করা হয় যে অন্ন নয় বরং আনন্দই হচ্ছে ব্রহ্ম। সত্যই শ্রম না করে অপরের শ্রমফলভোগী হতে পারলে জীবনে আনন্দই সত্য হয়ে ওঠে, জাগতিক বিষয়গুলো হয়ে ওঠে তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয়, সেই সকল বিষয়ের জ্ঞানও হয়ে ওঠে অজ্ঞান বা অবিদ্যা, বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্করহিত 'বিশুদ্ধ জ্ঞান' 'বিশুদ্ধ তত্ত্ব' 'বিশুদ্ধ চৈতন্য'ই হয়ে ওঠে সকল মানসিক কর্মকাণ্ডের উপজীব্য। তখন ঘোষিত হতে পারে যে–বেদ (জ্ঞান) ও কৃষি পরস্পরের শত্রু। অথচ সমাজ যতদিন শ্রেণীহীন ছিল ততদিন প্রজ্ঞা, ধী এবং কর্ম; কর্ম, ক্রতু এবং প্রজ্ঞা; শচী, কর্ম এবং প্রজ্ঞা ছিল সমার্থবাচক শব্দ। লোকবঞ্চনার মতো লোকহিত শব্দটিও তাই শোষণমূলক সমাজের উপজাত।

তিন.

'আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে, কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না– ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই, কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায়– তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।' [লোকহিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

এভাবে মানুষকে নত করার অধিকার কারও নেই। এনজিওর নেই, করপোরেট পুঁজির নেই, দাতা সংস্থার নেই।

তাহলে আমরা কি লোকহিতে বিশ্বাস করি না? করি। এযুগের একমাত্র ফিল্যানথ্রপি হচ্ছে বিপ্লবী রাজনীতি, যার মাধ্যমে সমাজের বর্তমান অসম বিন্যাসকে পাল্টে মানবসমাজে হৃত 'ঋত'কে ফিরিয়ে আনা যাবে।

জনহিতৈষী কাজ!

আহমাদ মোস্তফা কামাল

অনেক শব্দের আভিধানিক অর্থই সময়ে সময়ে পাল্টে যায়, বা নতুন অর্থ ধারণ করে। ফিল্যানথ্রপি শব্দটির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। জনহিতৈষী কর্মকাণ্ডকেই ফিল্যানথ্রপি বলা হত সবসময়, এবং একসময় এই বিষয়টি কেবল ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ এই ধরনের কর্মকাণ্ড প্রধানত ব্যক্তি-উদ্যোগেই পরিচালিত হত। আমাদের দেশে, এবং আরো অনেক দেশেই ধর্ম-প্রচারের কাজে আগত ভিন-দেশী মানুষদের নানাভাবে ফিল্যানথ্রপিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকতে দেখা গেছে। ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য আগত সুফীরা এবং খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের জন্য আগত পাদ্রীরা ধর্ম-প্রচার ছাড়াও জনগণের জন্য কল্যাণকর নানা কাজ করতেন। চিকিৎসা এবং শিক্ষা ছিল তার মধ্যে অন্যতম। কখনো কখনো বৈষয়িক চাহিদা মেটাবার জন্যও চেষ্টা করতে দেখা গেছে তাঁদের। সুপেয় পানির অভাব পূরণের জন্য কেউ কেউ পুকুর কেটে পানির সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন, কেউ আবার দরিদ্র জনগণের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য লঙ্গরখানা জাতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। এখন ব্যক্তি-উদ্যোগে পরিচালিত এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে ফিল্যানথ্রপিক কাজ বলতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করেন। পুঁজির এবং কর্পোরেট দুনিয়ার নতুন কালচারের দাপটে এই বিষয়টিও নতুন রূপ ধারণ করেছে। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নেই, বা যে ব্যক্তি-উদ্যোগের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ অর্থলগ্নির ব্যাপার নেই, সেইসব ব্যাপারকে আর ফিল্যানথ্রপিক বলা হয় না! একজন মানুষের অর্থ না থাকলেও যে তিনি অন্তরের তাড়নায় বা মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সময়, শ্রম ও চেষ্টা দিয়ে এই ধরনের

কাজ করে যেতে পারেন, এই সত্যটিকে এখন যেন আর কেউ মূল্য দিতে চাইছেন না। যেন প্রচুর অর্থ না থাকলে জনহিতৈষী কাজকর্ম করা যায় না!

কিন্তু একজন মানুষ বা একটি প্রতিষ্ঠান কেন এই ধরনের কাজে উৎসাহ বোধ করেন? কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য কি থাকে তার বা তাদের? কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই কেউ কেউ কেবল 'বিবেকের তাড়নায়' এই ধরনের কাজ করে যাবেন, এটা আশা করা সম্ভবত ভুল হবে। সবারই কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য থাকে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা উপভোগের উদ্দেশ্য, সমাজে 'সমাজসেবী' হিসেবে পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্য, এই পরিচয়কে ব্যবহার করে প্রভাবশালী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার উদ্দেশ্য, এমনকি কারো কারো মধ্যে এটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অর্থ-সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। কিংবা এর কোনোটা না থাকলেও পরকালে ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কৃত হওয়ার স্বপ্ন থেকে থাকতে পারে কারো কারো মধ্যে! প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সংঘটিত জনহিতৈষী কাজের পেছনে যদি এরকম এক বা একাধিক কারণ/উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে তাহলে আদৌ কি তাকে জনহিতৈষী কাজ বলা যাবে? ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, কোনো ব্যক্তি বা তার গড়ে তোলা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি নিছক সামাজিক সম্মানপ্রাপ্তির জন্য এই ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, সেটিকে জনহিতৈষী কাজ হিসেবেই গণ্য করা যায়। সমাজ ও সমাজের মানুষের কাছ থেকে সম্মান লাভের প্রত্যাশাকে খুব নেতিবাচক চোখে দেখা ঠিক হবে না। আবার কেউ যদি পরকালে ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কৃত হওয়ার লোভে/উদ্দেশ্যে এরকম কাজ করতে থাকেন, সেটিকেও জনহিতৈষী কাজ হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতি আমি। বুঝতে হবে যে, এই ধরনের মানুষ দুর্বলচিত্তের হলেও তার মধ্যে অপরাধবোধ আছে, মানুষের জন্য কিছু করার তাড়না আছে, শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার সম্পন্ন করেই ঈশ্বরের কাছ থেকে পার পাওয়া যাবে না বলে তিনি বিশ্বাস করেন, ফলে এইসব কাজে সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করেন। এই দুই ধরনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে খানিকটা ছাড় দেয়া যেতে পারে। তবে কেউ যদি কোনোরকম উদ্দেশ্য ছাড়াই, কেবলই– মানুষ হিসেবেই সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে– এইরকম কোনো বোধ থেকে এই ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করেন তাহলে সেটিকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ জনহিতৈষী কাজ বলে গণ্য করতে হবে। অবশ্য এই ধরনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব বেশি সংখ্যায় পাওয়া যাবে না, এটাও প্রায় অনিবার্য সত্য।

কিন্তু জনহিতৈষী কাজের পেছনে যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা উপভোগের উদ্দেশ্য, বা 'সমাজসেবী' পরিচয়কে ব্যবহার করে প্রভাবশালী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার উদ্দেশ্য, বা এটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অর্থ-সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য থেকে থাকে তাহলে তাকে কোনোভাবেই জনহিতৈষী কাজ বলা যাবে না। যদিও এটিই বর্তমান সময়ে ব্যাপকহারে ঘটে চলেছে। চারপাশে একটু চোখ মেললেই আমরা এর সত্যতা টের পাই। জনসেবামূলক কাজের আড়ালে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করার প্রবণতা অহরহই চোখে পড়ে। কর্পোরেট দুনিয়া

জনসেবার নামে যা কিছু করে তা কি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও প্রচার লাভের উদ্দেশ্যেই করে না? কিংবা বাংলাদেশের বড় বড় এনজিওগুলো যা করে বেড়াচ্ছে তার পেছনে কি বৈদেশিক অনুদান এবং দরিদ্র মানুষদের শোষণের পতাকাতলে জড়ো করে নিজেদের চাকচিক্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যই সফল করছে না? একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক; এনজিওদের কথা উঠলেই এদের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের কথা সবার আগে মনে আসে। এর কারণও আছে। এই প্রকল্পটি বিষবৃক্ষের মতো এমনভাবে বেড়ে উঠেছে যে, সমাজের সর্বত্র তার প্রভাব চোখে পড়ে। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ ছাড়াও এনজিওগুলো আরো বহু ধরনের কাজ করে থাকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা, নন-ফরমাল প্রাথমিক শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নানাবিধ কাজের প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতামূলক নানা ধরনের কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি। কিন্তু এসব নিছক জনসেবার মহান ব্রত নিয়ে করা হয়, এটা কোনো নির্বোধও বিশ্বাস করবে না! এইসব কর্মকাণ্ড দেখিয়ে বৈদেশিক অনুদানের ব্যাপার তো আছেই, সেই সাথে আছে সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি তৈরি, এবং বৈষয়িক লাভালাভের মতলব। কিছু এনজিও আবার এই কাজগুলো করে তাদের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে জায়েজ করবার জন্য। এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নিয়ে যত ভালো ভালো কথা শোনা যায়, প্রকৃত চিত্রটা অত মনোমুগ্ধকর নয়! অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, এই কর্মসূচি অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কোনো কাজে তো আসেই না, বরং তাদের ক্ষেত্রে অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। যারা দীর্ঘদিন ধরে অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, যাদের মাথার ওপর একটা ছাউনি নেই, যাদের পরনের কাপড়টি শতছিন্ন, যাদের সন্তানরা রোগশোকে-অনাহার-অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে কংকালসার হয়ে গেছে, তারা যদি– যে কোনো উৎস থেকে দুই/তিন/পাঁচ হাজার টাকা ঋণ পায়, তাহলে প্রথম যে কাজটি করবে তাহল– অন্তত দু-চারদিন পেটপুরে খাওয়া। দীর্ঘকাল ধরে মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত এই সব মানুষ স্বভাবতই অন্য চাহিদাগুলোর একটা ন্যূনতম সমাধানও করতে চাইবে। ফলে তার সাধের ক্ষুদ্রঋণ অনেকটাই ক্ষয়ে যাবে।

ওদিকে, যে 'প্রকল্পের' (হাঁস-মুরগী পালন, মাছচাষ বা দোকানপাট ইত্যাদি ইত্যাদি) কথা বলে ঋণটি দেয়া হয়েছিল, সেটি শুরু করার আগেই, সপ্তাহান্তে মহাজনী কায়দায় কিস্তির টাকা নিতে আসবে এনজিওর লোকজন। একদিকে সে ওই টাকার অনেকটাই খরচ করে ফেলেছে অন্যদিকে আবার অন্যদিকে আছে মহাজনী চাপ– এ অবস্থায় তার আর 'প্রকল্প' শুরু করার সুযোগ কোথায়? কিন্তু প্রকল্প শুরু হোক বা না হোক, শুরু হলে সফল হোক বা ভেস্তে যাক, ঋণের কিস্তি শোধ করতেই হবে। না করলে নির্মম নিপীড়ন। কিস্তি দিতে না পেরে অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করার খবর আমাদের নাগরিক মিডিয়ায় খুব কমই পৌঁছায়। কিন্তু যেটুকু পৌঁছায় সেটুকু থেকেই যে-কেউ বুঝে নিতে পারে, ওই আত্মহত্যার পেছনে নিপীড়নের মাত্রা কী ভয়াবহ ছিল! এই ধরনের একটি ঋণ নিয়ে ওই অতিদরিদ্র লোকটি আসলে এক ঋণ-ফাঁদে পড়ে। সে হয়তো তখন অন্য এক এনজিও থেকে ঋণ নেয় প্রথম ওই এনজিও'র ঋণ শোধ

করবার জন্য। কিন্তু এই নতুন এনজিও-ঈশ্বরও তো আগের জনের মতোই ভয়াবহ নিষ্ঠুর! ফলে একসময় তাকে ভিটেমাটি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে শহরের উদ্দেশ্যে পালাতে হয়। শহরে বস্তির মধ্যে আরেকটি অসহায় পরিবার তখন তার ঠাঁই খুঁজে দেয়! প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন নদী-ভাঙন ইত্যাদি) কারণে বাধ্য হয়ে শহরে আশ্রয় নেয়া লোকের চেয়ে এনজিও'র নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে আশ্রয় নেয়া লোকের সংখ্যা কম নয়। যে কেউ ইচ্ছে করলে ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। তাহলে কি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কোনোই সাফল্য নেই? আছে। একটু সচ্ছল জনগোষ্ঠী– যাদের হয়তো খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তা নেই, আবার একটি প্রকল্পে হাত দেয়ার মতো নগদ অর্থও নেই, তারা এই ধরনের ঋণ নিয়ে খানিকটা সফল হয়েছে। কিন্তু এটাকে তো এনজিওগুলোর ফিল্যানথ্রপিক কাজ বলে গণ্য করা যায় না! কারণ, উচ্চহারের সুদ নির্ধারণ করে তারা তো আসলে তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকেই সফল করে নিচ্ছে। এর মধ্যে জনহিতৈষী উপাদান কোথায়?

এই ধরনের উদাহরণ আরো দেয়া যাবে। কিন্তু সেগুলো না দিয়েও এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, সাদা চোখে যেসব কাজকে জনহিতৈষী বলে মনে হয়, বা তথাকথিত মিডিয়াগুলো যেসব কাজকে জনহিতৈষী বলে হাইলাইট করে, তার সবই জনহিতৈষী নয়। এর অনেকগুলোর আড়ালে আছে অনেক অনেক করুণ ও নির্মম ইতিহাস, যেগুলো আমরা খুব কমই জানতে পারি অথবা আদৌ জানতে পারি না!

ফিল্যানথ্রপি: একটি দার্শনিক সমীক্ষণ

সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার

ফিল্যানথ্রপির অন্য নাম মানবকল্যাণ। অনেকে একে 'লোকহিতৈষণা' 'জনহিতৈষণা' 'উদারতা' 'দানশীলতা' কিংবা 'বদান্যতা' বলেও উল্লেখ করেন। তবে পারিভাষিক জটিলতা এড়িয়ে যদি একে স্রেফ মানবপ্রেম হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে বোধকরি কেউ আপত্তি করবে না। অভিধানে আছে 'concern for the welfare of mankind' অর্থাৎ মানুষের মঙ্গল কামনাই ফিল্যানথ্রপি। কোনো ধরনের প্রাপ্তির

প্রত্যাশা ছাড়া নিখাদ মানবপ্রেমের উদ্দেশ্যে মানুষের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকে ফিল্যানথ্রপি বলে। এর পরিধি যতই বিস্তর হোক এর কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু মানুষই। গীতায় যে নিষ্কাম কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ফিল্যানথ্রপির লক্ষ্য অনেকটাই তাই। নিষ্কাম কর্মে যেমন ফলের আশা বিচার্য নয়, ফিল্যানথ্রপির মাধ্যমে মানবকল্যাণের প্রতিদান প্রত্যাশা করাও তেমনি অকাম্য। অষ্টাদশ শতকের নামকরা জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) যে শর্তহীন আদেশ (categorial imperative) বা কর্তব্যের জন্য কর্তব্য (duty for duty's shake)-এর কথা বলেছেন ফিল্যানথ্রপির মূল অর্থ এর একচুলও বাইরে না। কান্ট যেমন একমাত্র সদিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত মানুষের কর্মকাণ্ডকেই শর্তহীন বলেছেন তেমনি এর মূল প্রণোদনাটি সেই সদিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত মানবপ্রেম। এ কারণে বিষয়টার একটা গভীর অর্থবহ দার্শনিক ভিত্তি আছে। প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজকল্যাণ, বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের নানান উপাঙ্গ মানবমনে গভীর বিস্তৃতি লাভ করেছে যার মূল কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। আর এ বিষয়সমূহের সার্থকতা নির্ভর করেছে এগুলো মানবকল্যাণের সাথে কতখানি সম্পর্কিত তার ওপর। তবে ফিল্যানথ্রপি বাস্তবসম্মত একটা তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে। তা হল এ জগতে মানুষের কি এমন কোনো কর্মকাণ্ড আছে যার পেছনে কোনো-না-কোনো স্বার্থ নেই? সমালোচকদের এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেওয়া যথেষ্ঠ শক্ত ব্যাপার। তবে এটা বলা যায় ফিল্যানথ্রপিস্টের সে ধরনের কর্মকাণ্ডই অর্থবহ হবে যা এ ধরনের প্রশ্নের সদর্থক উত্তর দিতে সক্ষম।

দুই

মানবকল্যাণের উদ্দেশ্য দুই প্রকার। এক. বিশেষ কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় (বস্তুগত কিংবা অবস্তুগত) মানবকল্যাণ, দুই. কোনো কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা ছাড়া মানবকল্যাণ। শাস্ত্রীরা বলেন, 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। এটাকে বাহ্যত মানবপ্রেমের মতো দেখালেও লক্ষ্যটা কিন্তু মোটেও তা নয়। মানবপ্রেম এখানে ঈশ্বর প্রেমের একটা উপায় মাত্র। অর্থাৎ কেউ যদি জীবে প্রেম করে তাহলে প্রকারান্তরে তার প্রেমটা ঈশ্বরে গিয়েই ঠেকে। এ কাজটা অনেকটা গাছে-ওঠা 'মই'-এর -মতো। কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মই যেমন নিছক উপায় তেমনি জীবের প্রতি প্রেমভাব দেখানো ঈশ্বরপ্রাপ্তির একটা করণীয় মাত্র। এ ধরনের চিন্তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার কিন্তু মানুষের জন্য বেশ খানিকটা মর্যাদাহানিকর। নির্দ্বিধায় বলা চলে একমাত্র ঈশ্বরবিহীন ধর্ম ছাড়া (বৌদ্ধ অথবা জৈন ধর্ম) কোনো ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকেই ফিল্যানথ্রপি বলা যায় না। কারণ ধার্মিকদের প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছে পারলৌকিক কিছু-না-কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা। হতে পারে সেটা স্বর্গলাভ, মোক্ষপ্রাপ্তি, ফানা, বাকা অথবা বেহেস্তে-র অনন্ত সুখ প্রাপ্তি। আরেক ধরনের বাহ্যিক মানবকল্যাণের দিক আছে যা পরিলক্ষিত হয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক প্রলোভনের বেশ কিছু ঘটনার মধ্যে। অর্থনীতির মূলভাষা যেহেতু মুনাফাকে কেন্দ্র করে তাই অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রায় প্রতিটি

ক্ষেত্রেই কোনো কোনো উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যাবেই। পত্রিকাতে দেখেছি এসিডদগ্ধদের সহায়তা তহবিলে মাত্র একশ টাকা সাহায্য করেও নিজের নামটা বাম পার্শ্বে উল্লেখ করিয়ে নিতে। 'সিডর'বিধ্বস্ত বস্ত্রহীন নিরন্ন অসহায় মানুষদের সহযোগিতা করতে অসংখ্য মানুষ এগিয়ে এসেছেন সত্য কিন্তু নিজেদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছা দেখিয়েছেন হয়তো একজনই (যিনি ১৩০ মিলিয়ন ডলার সহযোগিতা করেছিলেন নাম গোপন রেখে)। অন্য দিকে রাজনৈতিক কৌশলটা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে যে আরও স্থুল তা বোধকরি কারো অজানা নয়। মোটকথা যেসব ক্ষেত্রে মানুষকে লক্ষ্য (end) হিসেবে না নিয়ে উপায় (means) হিসেবে গ্রহণ করা হয় সেখানেই ফিল্যানথ্রপি তার মূল তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু কবি যখন বলেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' তখন তিনি মানুষ বাদে অন্য কিছুকে সত্য হিসেবে নির্দেশ করেন বলে মনে হয় না। তার কাছে মানুষই চূড়ান্ত, অন্য কিছু নয়। ধার্মিকের কাছে যে মানুষ ছিল সাময়িক উপায়, কবির কাছে সে মানুষ পরম অর্জন। তাই সম্ভবত কবিগুরু বললেন, 'এ আমার অহংকার,/অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে/মানুষের অহংকারপটেই/বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।' প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মন আচ্ছাদন করেছিল অতিপ্রাকৃতিক বিচিত্র সব চেহারা। অগণিত দেব-দেবীতে পরিপূর্ণ ছিল তাদের মন। মস্তিষ্কের অতল গহ্বর মগ্ন ছিল সুবিশাল এই ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তায়। সেখানে ছিল না মানুষের জন্য কোনো ঠাঁই। যদিও আদিকাল থেকে মানুষ উপলব্ধি করেছে মানবসভ্যতার অগ্রায়ণে দয়া, ক্ষমা, প্রেম, ভক্তির বিকল্প কিছু নেই। তাই মানুষ তথা মানবপ্রেম হয়ে উঠেছে তাদের চিন্তা-র প্রধানতম জায়গা। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে দার্শনিক থেলিসের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে প্রতীচ্যের চিন্তা। থেলিস ব্যস্ত ছিলেন জগতের মূল উপাদানের খোঁজে। মানুষ ছিল সেখানে অনাবিষ্কৃত। তার বেশ পরে একদল পেশাদার দার্শনিক যাদের সোফিস্ট বলা হত তারাই মানুষকে টেনে আনেন চিন্তার কেন্দ্রে। সম্ভবত পাশ্চাত্যে সেই প্রথম মানুষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজার আসনে। সোফিস্ট-শ্রেষ্ঠ প্রোটাগোরাস তাই ঘোষণা দিলেন, 'Man is the measure of all things'। বাংলার কবি যখন বলেন, 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' তখন বোধ করি তাদের সাথে তার আর পার্থক্য থাকে না। প্রাচ্যে অবশ্য এর সমসাময়িককালে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল যার মূল দর্শনটা মানবমুক্তি। দুঃখের আন্ত্যন্তিক বিনাশের মাধ্যমে অনন্ত আনন্দাবস্থায় পৌঁছানই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন। আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ নয় বরং জাগতিক বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির মধ্য দিয়ে নির্বাণ লাভের জন্যই তিনি সমগ্র জীবনে ৪টি চরম আর্য সত্য (The four noble truths) আবিষ্কার করেছেন। এজন্য আমি গৌতম বুদ্ধকে বিশ্বের অন্যতম ফিল্যানথ্রপিস্ট মনে করি। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ তথা সকল প্রাণীর প্রতি অসীম দয়া প্রদর্শনের জন্য তিনি তার শিষ্যদের বলেছেন–

'মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ুসা

এক পুত্ত মনুরদথে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানু সম্ভাবয়ে
অপরিমানং’

মা যেমন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও পুত্রের প্রাণ রক্ষা করেন সেরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অসীম দয়া জন্মানোর জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। ড. রাধাকৃষ্ণাণ গৌতম বুদ্ধকে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে মানবিক গুণাবলীসমৃদ্ধ একজন অন্যতম মানবপ্রেমিক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি মনে করেন গৌতম বুদ্ধ ছিলেন একজন সমকালীন দৃষ্টবাদী মানুষ। তার নিজের কথায়, '...Buddha demands love of humanity and discipline of mind independent of a religious sanction, there are people who exclaim that Gautama Buddha was the positivist August Comte born 2,000 years too soon!' যদিও প্রায় ধর্মের মধ্যেই জীবের প্রতি অপরিসীম করুণা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে তবু সেসব ক্ষেত্রে এই করুণার একটা বিশেষ মানে আছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই করুণার পাত্রটি একটা উপায়, লক্ষ্য নয়। এজন্য ধর্মীয়প্রেম ও ফিল্যানথ্রপিস্টের মানবকল্যাণের মধ্যে পার্থক্যটা বেশ বড়সড়।

তিন

মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ সার্থকতার প্রশ্নে চিন্তাশীল মানুষ, বিশেষ করে নীতি-দার্শনিকেরা নানা ধারায় বিভক্ত। মানুষের বিচিত্র মূল্যবোধ এই অনেক ধারায় তাদের বিভক্ত করেছে। ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কিত মানুষের বিচারবোধের প্রেক্ষিতে নীতি-দার্শনিকেরা মানবজীবনের চূড়ান্ত সার্থকতার বিষয়গুলোকে অন্তত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, যদিও সমকালে এই চিন্তা আরো প্রসারলাভ করেছে। ব্যক্তির সাথে সমাজের নৈতিক সম্পর্কগুলোকে আত্মবাদ, পরার্থবাদ এবং সর্ববাদে বিভক্ত করা হয়েছে। যার সাথে নিম্নোক্ত শিরোনামগুলোর সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ:

ক. সুখবাদ (Hedonism)
খ. বিচারবাদ (Rationalism)
গ. পূর্ণতাবাদ (Eudeomonism)

ক. সুখবাদ মানবআচরণ তথা মানবপ্রত্যাশার একটা নির্মোহ ব্যাখ্যা। আচরণবাদীরা যেমন মানবপ্রকৃতির স্বরূপ উন্মোচন করে একে নৈর্ব্যক্তিক ভাবেন তেমনি সুখবাদীরাও মানবআচরণের প্রকৃতি উদঘাটন করেন নিরপেক্ষভাবে। এই মতবাদে বলা হয়ে থাকে সুখই মানব-কামনার একমাত্র বিষয়। কেননা মানুষ সুখ ছাড়া অন্যকিছুই কামনা করে না। ধন-সম্পদ, প্রতিপত্তি, মান-সম্মান যাই সে কামনা করুক না কেন তার চরম লক্ষ্য সুখ। এজন্য তারা বলেন সুখই নৈতিকতার একমাত্র মানদণ্ড। কোনো কাজের ভালোত্ব-মন্দত্ব, ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব নির্ধারিত হয় সেই কাজের সুখ তৈরির সম্ভাবনার ওপর। যে কাজ যতটুকু সুখ দেয় সে কাজ ততটুকু ভালো। সুখবাদীদের একটা গ্রুপ বলেন মানুষের সুখ অনুসন্ধান করাই উচিত, সাথে সাথে

উচিত দুঃখকে পরিহার করা। সুখবাদীদের কেউ কেউ জোর দিয়েছেন দৈহিক সুখের ওপর আবার কেউবা দিয়েছেন মানসিক সুখের ওপর। এই দুই ধরনের সুখের প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের চিন্তায়-কবিতা-গানে তথা নানা লিখনীতে। দৈহিক সুখের এক আদি ও অকৃত্রিম আকুতির সন্ধান পাওয়া গেছে ষোড়শ শতাব্দীর সুবিখ্যাত ইংরেজ কবি জন ডানের (১৫৭২-১৬৩১) 'টু হিজ মিসট্রেস গোইং টু বেড' কবিতায়–

'Come, Madame, come, all rest my powers defie
Until I labour, I in labour lye.
... ...
Full nakedness, all joys are due to thee
As soules unbodied, bodies uncloth' must bed
To taste whole joyes. Gems which you women use
Are as Atlanta's balls, cast in mens views,'

প্রাচীন গ্রীসের সিরেনাইকরা (Cyrenaics) এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। আধুনিককালের বেনথাম, মিল, প্রমুখ চিন্তাবিদেরা এই মতবাদের বেশ কিছু সংস্কার করেছেন। সুখবাদীদের মধ্যে আত্মগত সুখবাদী হবস্ (১৫৮৮-১৬৭৯) বলেন মানুষ একান্তভাবে নিজের সুখ খোঁজে। নিজেকে ছাড়া সে অন্য কাউকেও ভালোবাসে না। সমালোচকরা এই ধরনের মনোভাবকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেছেন, তাহলে মানুষের সাথে ইতর শ্রেণীর প্রাণীদের পার্থক্য কোথায়? অবশ্য এসব সমালোচনা মাথায় রেখে সর্ববাদী সুখবাদী বা উপযোগবাদীরা অমার্জিত, স্থূল ও দৈহিক সুখের পরিবর্তে মার্জিত ও মানসিক সুখের ওপর জোর দিয়েছেন। উপযোগবাদী মিল দৈহিক সুখের পরিবর্তে উচ্চতর বৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে সর্বাধিকসংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখের তাগিদ অনুভব করেছেন। তিনি মনে করতেন একটি সুখী শুকর হওয়ার চেয়ে অসুখী মানুষ হওয়া শ্রেয়। তবে মানুষকে যারা আরো বুদ্ধিশাণিত পরিমার্জিত প্রাণী হিসেবে প্রত্যাশা করেন তারা প্রচার করেছেন বুদ্ধিবাদ বা বিচারবাদকে।

খ. যদিও প্রাচীন গ্রীকদর্শনে (স্টোয়িকবাদ) বুদ্ধিবাদ বা বিচারবাদের বীজ নিহিত ছিল তথাপি এই মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন দার্শনিক কান্ট। কবি কামিনী রায়ের 'সুখ' কবিতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে বিচারবাদ তথা পরার্থবাদের মর্মবাণী–

'পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ
কোথাও কী আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।'

এখানে মনে করা হয় মানুষের নৈতিক জীবন পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন বিচার বা বুদ্ধি দিয়ে। আবেগ, অনুভূতি কিংবা যে কোনো ধরনের প্রবৃত্তিগত তাড়না দিয়ে মানুষের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ার সুযোগ নেই, কেননা মানুষ এমন এক অনন্য প্রাণী

যার কাছেই একমাত্র বিচারিক জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ কেবল মানুষের প্রত্যেকটি কর্মই পরিচালিত হবে শর্তহীন আদেশ দিয়ে। শুধুমাত্র রাগ, ঘৃণা, দ্বেষ কিংবা উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা দিয়ে মানুষের জীবন পরিচালনা অর্থহীন।

আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম 'ফিল্যানথ্রপি' হল কঠোর দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত এমন ধরনের মানবকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা যা সম্পূর্ণরূপে করুণা বা অনুকম্পাবিহীন। প্রশ্ন জাগতে পারে কর্তব্যের সাথে যেহেতু প্রেম-দয়া-ক্ষমার কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে কী করে মানুষ একমাত্র কর্তব্যের মধ্য দিয়ে মানবকল্যাণে ব্রতী হবেন? দুটো আপাতবিরোধী ধারণার কীভাবে সমন্বয় সম্ভব? এ যেন বিচারকের দয়া প্রদর্শনের মতো ব্যাপার। যিনি ভালো বিচারক তিনি নির্মম। অন্যদিকে যিনি দয়ালু তিনি বিচারকার্যে শিথিল। এমন একটা জটিল অবস্থায় গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন –

'প্রভু দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার।'[১]

আসলে যে দায়িত্ব মমতায় পূর্ণ, মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত, যে কর্তব্য মানুষের কল্যাণের অনন্য নিদর্শন সেই মানবকল্যাণই 'ফিল্যানথ্রপি'। ফিল্যানথ্রপি মানুষের প্রতি অহেতুক করুণা নয়, নয় ভিক্ষা। মনে রাখতে হবে এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষ এক অখণ্ড প্রজাতি। সামাজিক বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় বিভাজন, ভৌগোলিক সুবিধা-অসুবিধা, সম্পদের তারতম্য ইত্যাদি কারণে মানুষের মাঝে ধনী-দরিদ্র সৃষ্টি হয়েছে বটে। তাই বলে মানুষকে উত্তমর্ণ-অধমর্ণ বিভাজন করলে মানবতাকে খণ্ডিত করা হবে। মানুষ দরিদ্র হতে পারে কিন্তু বিপদগ্রস্ত মানুষের সহযোগিতা পাবার অধিকার আছে। করুণাকে মানুষ অপছন্দ করে যার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি সাধারণ মানুষের চোখে ঘৃণার বস্তু। যিনি সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবেক দ্বারা তাড়িত হয়ে আসবেন– ভাবলে চলবে না তিনি অসহায়দের চেয়ে উঁচু, ধনী ও দাতা। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে এমনই এক অসাধারণ দায়িত্ব-বোধের কথা–

'ওরে তুই ওঠ্ আজি
আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ জনে! কোথা হতে ধ্বণিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল! কোন অন্ধ কারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়!'

বিচারবাদের সমালোচকরা এই মতবাদকে অতি কঠোর বলে আখ্যা দেন। তারা বলেন মানুষের মধ্যে যেমন আছে বিচারবোধ তেমনি আছে প্রেম, ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমা ও ঔদার্যের গুণাবলী। কিন্তু কান্ট মানুষকে শুধুমাত্র যন্ত্রবৎ আবেগহীন নিরস প্রাণী বলতে চেয়েছেন। আরেকটা সমালোচনা প্রায়ই শোনা যায় কান্ট যে কর্তব্যের

কথা বলেছেন তা তাত্ত্বিকভাবে বেশ চমৎকার মনে হলেও বাস্তব পৃথিবীতে সবার জন্য 'ইউনিফর্ম কর্তব্যবোধ' আজও তৈরি হয়েছে বলে জানা যায়নি। বুদ্ধিহীন, অসভ্য অথবা মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের কর্তব্যবোধের ধারণা নিশ্চয় ভিন্ন হবে ।

সে কারণে এই আদেশ অনেকটাই বিতর্কিত। এসব সমালোচনার পরও বলা চলে জ্ঞানের ইতিহাসে কঠোর বিচারবোধসম্পন্ন মানুষ মানবসভ্যতাকে যতটা এগিয়ে নিয়েছে, অন্যরা সে ক্ষেত্রে শুধু দর্শকের সারিতেই রয়ে গেছে।

গ. পূর্ণতার অর্থ আত্মোপলব্ধি। আত্মোপলব্ধি হল মানুষের অন্তর্নিহিত মানবতার পূর্ণ বিকাশ। পূর্ণতাবাদ একটি সমন্বয়ী মতবাদ। কেউ কেউ মনে করেন সুখবাদ ও বুদ্ধিবাদ উভয়ই চরম মতবাদ। এ কারণে এ দুয়ের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। সুখবাদ মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করেছে অন্যদিকে বিচারবাদ করেছে সন্ন্যাসী। সুতরাং এই দুই মতবাদের অপরিহার্য অংশটুকু রেখে বাকি অংশ বাদ দেয়া সম্ভব। আর সেটা অর্থপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে পূর্ণতাবাদে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এবং অষ্টাদশ শতকের জার্মান ভাববাদী দার্শনিক হেগেল (১৭৭০–১৮৩১) এই মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা।

প্লেটো মনে করতেন বুদ্ধি হল স্বর্গীয় নীতি। আত্মার অধিক স্তরে থাকে বুদ্ধি এবং নিম্নতর স্তরে থাকে কামনা। কামনার যেহেতু জীববৃত্তির সাথে সম্পর্ক তাই এটা ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতে চায় সব সময়। এ কারণে একে বুদ্ধির লাগাম দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। প্লেটো এই বিপরীতমুখী প্রবণতা দুটোকে সমন্বয় করে জীবন গঠন করার কথা বলেন। আবার অ্যারিস্টটলও প্রায় এই ধরনের কথাই বলেছেন তাঁর নীতিশিক্ষায়। 'এথিকা নিকোমেকিয়া' গ্রন্থে তিনি তাঁর নৈতিকতা সম্পর্কে মতামত রেখেছেন। তিনি মনে করেন মানুষের জন্য তাই ভালো– যা তাকে সুখী করে এবং সুখ হল মানুষের একান্ত অন্তর্নিহিত গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন। তাঁর মতে আত্মার কর্মপরিধি বুদ্ধি দ্বারা চালিত হতে হবে। আর এজন্য দরকার মধ্যপন্থা অবলম্বন। তাঁর কথায়, 'The good life involves friendship with virtuous men and development of the intellectual virtues'। তিনি অনুধ্যানমূলক (contemplative) জীবনকে উৎকর্ষ জীবন বলে মত দেন। আধুনিককালের জার্মান দার্শনিক হেগেলও মানবজীবনের পূর্ণতার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত দু'টি উক্তি হল– 'মানুষ হও' (নব ধ ঢ়বৎংড়হ) ও 'বাঁচার জন্য মরো' (die to live)। মানুষ যেহেতু জীববৃত্তির ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করেছে তাই তার সার্থকতা বিশ্বলোকের দিকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় এই চিন্তাটা সম্ভবত সবচেয়ে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে–

'বাসনা করো জয়, দূর করো ক্ষুদ্র ভয়।
প্রাণধন করিয়া পণ চলো কঠিন শ্রেয় পথে,
ভোলো প্রসন্নমুখে স্বার্থসুখ, আত্ম দুখ
প্রেম-আনন্দরসে নিয়ত রহো নিরত ॥'

আমরা বলতে পারি নৈতিকতার মানদণ্ড নিয়ে এ আলোচনায় তিনটি মতবাদই কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে মানবজীবনকে ধ্রুব করে তুলেছে। তবে এক্ষেত্রে ফিল্যানথ্রপির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবাদ ও পূর্ণতাবাদ সবচেয়ে বেশি ধ্রুবতার দিকটা তুলে ধরেছে। তবে চিন্তাশীল মানুষ এর বাইরেও ভিন্নভাবে লোকহিতৈষী কাজে তাদের অবদান রেখে চলেছে।

চার

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষ নিরন্তর এগিয়ে চলছে সামনে। অনুসন্ধান করে চলছে অনন্ত ও বহুশাখ সুখের ক্ষেত্র। উন্মোচন করছে মানবকল্যাণের নতুন নতুন নানা দিক। আর এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করে চলেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানে নিরন্তর সত্য অনুসন্ধান। তবে সেই সত্যটা অবশ্যই মানবকল্যাণকে ঘিরে। গুহাবাসী মানুষ থেকে আজ মানুষ পৌঁছেছে এমন এক অকল্পনীয় সুখের নিকেতনে যা এক সময় ছিল অবিশ্বাস্য। মানুষের নিয়ত মাথার ব্যবহারে মানুষ উন্মোচন করে চলছে অজানালোকের নানা রহস্য। সেদিক থেকে বিজ্ঞানীকে বলতে হয় শ্রেষ্ঠ ফিল্যানথ্রপিস্ট। বিজ্ঞানকে অবশ্য কিছু হিংস্র মানুষ ব্যবহার করেছে হীনস্বার্থে কিন্তু তাতে বিজ্ঞানের মর্যাদাহানি হয়নি। দোষটা বিজ্ঞানের নয়; দোষ ব্যবহারকারীর। আধুনিক জীবন বিজ্ঞান ছাড়া অচল। বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখা যেমন– চিকিৎসা বিজ্ঞান, যন্ত্রকৌশল, রসায়ন বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, কম্পিউটার ইত্যাদি মানুষের জীবনকে ভরিয়ে তুলেছে অনাবিল সুখে। একইভাবে সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদিও সভ্যতা–সংস্কৃতি বিনির্মাণে সমান তালে অবদান রেখে চলছে। বিশেষ করে অস্তিত্ববাদ, প্রয়োগবাদ, মার্কসবাদের কেন্দ্রীয় চিন্তা মানবতাবাদ। মানবকল্যাণকে ঘিরেই সকল দর্শন ও মহৎ সাহিত্যের চাকা আবর্তিত হয়ে আসছে।

অস্তিত্ববাদের সাথে মানবতাবাদের যে যোগসূত্র আছে তার আবিষ্কারকর্তা ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫–১৯৮০)। অস্তিত্ববাদ হল সাহিত্য ও দর্শনের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ব্যক্তিমানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাও প্রকাশ পেয়েছে এখানে। সার্ত্র তার অস্তিত্ববাদের সাথে মানবতাবাদের সম্পর্ক বিষয়ে বলেন,

‘existentialism in our sense of the word, is a doctrine, that does render human life possible ; a doctrine also, which affirms that every truth and every action imply both an environment and a human subjectivity.

এই ভয়াবহ বিশ্বব্যবস্থায় মানুষের অস্তিত্ব যেখানে হুমকির সম্মুখীন সেখানে অস্তিত্ববাদ যেন ঘন আঁধারের মাঝে এক আলোকবর্তিকা।

প্রয়োগবাদ মানুষকে তার উপযুক্ত মর্যাদায় আসীন করেছে, তাই প্রাচীন সোফিস্টদের সাথে হালের প্রয়োগবাদীদের মিল রয়েছে। ব্রিটিশ প্রয়োগবাদী এফ.সি.এস. শিলার লিখেছেন– অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান নির্মাণ করার জন্য সময় ব্যয় না করে, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা হবে মানবিক অভিজ্ঞতাকে মানবিক অভিজ্ঞতার

জগতেরই সূত্র হিসেবে ধরে নেওয়া। অর্থাৎ মানুষকে তার নিজের মেধায় নিজেকে দাঁড়াতে দেয়া...। মানুষ সকল কিছুরই মাপকাঠি– একথা মনে করা−−সেক্ষেত্রে তার

সমগ্র অভিজ্ঞতার জগৎ এবং আমাদের বিচারের মাপকাঠি মিথ্যা প্রমাণিত হলে, আমাদের সকল পরিমাপই (measure) বাতিল হয়ে যায়। মানুষ বিজ্ঞানের নির্মাতা; বিজ্ঞান তার মানবিক উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে মাত্র–এই কথা মনে করা।

পৃথিবীতে যত সামাজিক ভাবনা আছে তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী এবং সর্বাধিক মানবকল্যাণমূলক চিন্তা মার্কসীয় দর্শন। এই দর্শনের প্রায়োগিক ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এই দর্শন অতুলনীয়। কারণ যে সমাজে আমরা বাস করি সে সমাজ যদি শ্রেণীহীন হয়, বৈষম্যহীন হয়, তার থেকে কল্যাণের আর কী থাকতে পারে? যে সমাজে সীমাহীন সম্পদ সংগ্রহের তাগিদ নেই, যে রাষ্ট্রে মানুষের খাদ্য সংগ্রহের অশুভ প্রতিযোগিতা নেই, ব্যক্তিগত মুনাফার তাগিদ নেই, সে সমাজের থেকে ভালো কিছু থাকতে পারে না। ধর্মভিত্তিক সমাজও আদর্শিক দিক থেকে নৈতিক সমাজ কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শনভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার সাথে বিশেষ পার্থক্য এখানেই যে ধর্মভিত্তিক সমাজে মানুষ মানুষের লক্ষ্য নয়। কোনো ভীতি, লোভ বা দয়ার ওপর এই সমাজের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে নৈতিকতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষকে লক্ষ্য বিবেচনা করে মানবকল্যাণের পথে এগিয়েছে।

পাঁচ

আমাদের দেশের মতো এত কম সম্পদের জনবহুল দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বিপুল মানুষের পদভারে আজ এই দেশটা ক্লান্ত। সেখানে প্রতি সেকেন্ডে অসংখ্য শিশু মূল জনস্রোতের সাথে মিশে মানুষের মিছিলকে বড় করে তুলছে। ক্রমে ক্রমে শেষ হচ্ছে আবাদী জমি, নিঃশেষ হয়ে চলেছে প্রাকৃতিক সম্পদ, বিপর্যয় আসছে প্রকৃতিতে। বাঁচার সংগ্রামে মানুষ নামছে ভয়ংকর প্রতিযোগিতায়। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্বের সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। আগে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, রাস্তাঘাট, পুকুর-পরিখা খনন করত মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিকতার তাড়না থেকে আর সেইসব কাজ আজ হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণের উপায় হিসাবে। পত্রিকাতে দেখেছি স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মুনাফার যন্ত্র হিসেবে। হাসপাতাল এখনকার সবচেয়ে লোভনীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের অশুভ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে বিচিত্র সব প্রতিষ্ঠান। ফিল্যানথ্রপির ঘোমটার আড়ালে অপ্রকাশিত অন্ধকারের কথা আমরা জানি না। এভাবে চলতে থাকলে অর্ধ-শতাব্দী পরে ফিল্যানথ্রপি শব্দটাকে হয়তো অভিধানে বেঁচে থাকতে হবে এর বিপরীত অর্থ নিয়ে তখন এই শব্দটি দ্বারা হয়তো খারাপ কিছুকে বোঝানো হবে।

বিচ্ছিন্ন কিছু ফিল্যানথ্রপিক প্রচেষ্টায় সামগ্রিক মানবকল্যাণ সম্ভব নয় এজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের সামগ্রিক দর্শনকে মানবকল্যাণমুখী করা। আর এক্ষেত্রে আমাদের সবার আগে দরকার এমন একটা জ্ঞানভিত্তিক মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর ইস্পাতকঠোর নৈতিকতা দ্বারা মানুষ পরিচালিত হবে। এজন্য আমাদের উচিৎ হবে লাগামহীন জনবৃদ্ধিকে ঠেকানো সাথে সাথে ন্যায়, সাম্য ও প্রেম দ্বারা উৎসারিত কল্যাণমূলক সমাজবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করা।

তথ্যসূচি

১ .মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গান্ধারীর আবেদন’ কবিতা থেকে।

সা ক্ষা ৎ কা র

ফিল্যানথ্রপিঃ গভীর বিশ্লেষণ অতঃপর গ্রহণ বর্জন

শা হা দু জ্জা মা ন

[জন্ম ১০ নভেম্বর ১৯৬০ ঢাকায়। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা দশ। বর্তমানে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব পাবলিক হেলথ বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কয়েকটি বিহবল গল্প (গল্প), পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ (গল্প), ঃ তে দুঃখ (উপন্যাস), একটি হাসপাতাল, একজন নৃবিজ্ঞানী, কয়েকটি ভাঙ্গা হাড় (গবেষণা), ভাবনা ভাষান্তর (অনুবাদ), আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরি (গ্রন্থনা, সম্পাদনা)]

হালখাতা

ইংরেজি ‘ফিল্যানথ্রপি’র পাশে বাংলা ‘লোকহিতৈষণা’, ‘জনহিতৈষণা’ ইত্যাদি শব্দ রেখে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আপনার কাছ থেকে আরও জানতে চাই, শব্দগত ও চিন্তাগত উভয় দিক থেকেই ‘ফিল্যানথ্রপি’র ব্যাখ্যা আসলে কী?

শাহাদুজ্জামান

'ফিল্যানথ্রপি' নিয়ে আলাদা করে ভেবে দেখিনি। আপনাদের প্রশ্ন পেয়ে ভাববার চেষ্টা করলাম। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে 'ফিল্যানথ্রপি'র অর্থ দেয়া আছে দেখছি, দরিদ্রদের সাহায্য করা, বিশেষত অর্থনৈতিকভাবে। বাংলা 'জনহিতৈষণা' শব্দটি খানিকটা ভারী, প্রাত্যহিক ব্যবহারোপযোগী নয়। 'জনসেবা', 'জনকল্যাণ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় কিন্তু তা ঠিক 'ফিল্যানথ্রপি' শব্দটির অর্থ বহন করে না সম্ভবত। 'ফিল্যানথ্রপি' বা 'জনহিতৈষণা'র সঙ্গে নিঃস্বার্থতার একটা সম্পর্ক দেখেন অনেকে। কোনো কিছু পাওয়ার আশা না করে অন্যের কল্যাণ করা। ছোটবেলা নানা দানবীরের নাম শুনতাম। যারা দান করেন তারা বীর এমন একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা আছে এতে। শুনতাম দানবীর মহসিন, দাতা হাতেম তায়ী, রণদাপ্রসাদ সাহা প্রমুখের নাম। বিপুল অর্থ, সম্পদ তারা দান করেছেন জনগণের জন্য। তখন অবশ্য প্রশ্ন জাগেনি অত অর্থসম্পদের মালিক তারা হলেন কী করে, এত সব দানের মধ্যে কোন স্বার্থ ছিল কিনা? এখন সেসব প্রশ্ন জাগে। নানা মিশ্র তথ্যও পাই এ বিষয়ে। ফলে 'জনহিতৈষণা' মানেই অন্যের জন্য নিঃস্বার্থ কল্যাণ এমন সোজাসাপ্টা সংজ্ঞায় বোধহয় বিষয়টিকে ধরা যাবে না। জনকল্যাণের পেছনে মোটা দাগে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থ কিম্বা সূক্ষ্মভাবে আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক স্বার্থ থাকতে পারে। প্রচলিত অর্থে 'ফিল্যানথ্রপি' শব্দটির সাথে দুটো বিষয়কে সম্পর্কিত দেখি, এক কোনো কিছু দান করা এবং দুই তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয় বরং একটি জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যবহার করা।

হালখাতা

ইসলামে পরিষ্কার নির্দেশ আছে, কাউকে উপকার করতে হবে এমনভাবে যাতে অন্য কেউ তা জানতে না পারে। অর্থাৎ সকল দানকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি এর পুরো উল্টো। কারও সামান্য উপকার করে যেভাবে প্রচারকার্য চালানো হয় তাতে বাণিজ্যের দিকটিই অধিক গুরুত্ব পায়। যেখানে ভুলকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া প্রতি মুহূর্তে অব্যাহত থাকে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

শাহাদুজ্জামান

শুধু ইসলাম নয় প্রায় সব ধর্মই মানুষকে এধরনের সদুপদেশ দিয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব জীবন তো আর কিতাবের কথা মতো চলে না। আদর্শ পরিস্থিতির সঙ্গে বাস্তবতার এই গরমিল জীবনের অনিবার্য নিয়ম বলা যেতে পারে। এই গরমিলের মাত্রাটা হয়তো সাম্প্রতিককালে বেড়েছে। বাজার অর্থনীতির চাপ, প্রচার-প্রচারণার উৎসব ইত্যাদি মিলিয়ে মানুষের মধ্যে নিভৃতে কিছু করবার প্রণোদনা লুপ্ত হয়েছে।

হালখাতা
বাংলাদেশে যে এনজিও সেক্টর তৈরি হয়েছে এবং এদের জনহিতকর কার্যকলাপের যে ধরন, এ ধরনের কাজকে ফিল্যানথ্রপিক কাজ বলা কতটা সঙ্গত?

শাহাদুজ্জামান
'ফিল্যানথ্রপি'র সাথে দানের একটা সম্পর্ক আছে সেই অর্থে বাংলাদেশের কোনো এনজিও দানের মানসিকতা থেকে কাজ করছে বলে মনে করি না। তবে এনজিও কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ব্যক্তি নয়, সমষ্টি যা 'ফিল্যানথ্রপি'র আরেকটি বৈশিষ্ট্য আগে উল্লেখ করেছি। বলা বাহুল্য এনজিও কর্মকাণ্ড নিঃস্বার্থ নয়। সামগ্রিকভাবে 'ফিল্যানথ্রপি' শব্দটির যে প্রচলিত দ্যোতনা তার সঙ্গে এনজিও কর্মকাণ্ডের মিল নেই।

হালখাতা
ইংরেজ আমলে কোনো কোনো বৃটিশ যেমন লর্ড কার্জন, ডেভিড হেয়ার, উইলিয়াম কেরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ বাংলায় গণমানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যেসব সেবামূলক কাজ করে গেছেন, সেগুলোকে কি ফিল্যানথ্রপি বলা সঙ্গত বলে আপনি মনে করেন?

শাহাদুজ্জামান
এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে 'ফিল্যানথ্রপিকে' কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে তার ওপর। আবারও যদি নিঃস্বার্থ দানকে 'ফিল্যানথ্রপি' বলা হয় তাহলে এঁদের সবার কর্মকাণ্ডকে এক কাতারে দাঁড় করানো যাবে না। লর্ড কার্জনের জনহিতকর কাজের পেছনে নানাভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে, উইলিয়াম কেরীর প্রণোদনা ভিন্ন।

হালখাতা
আমাদের দেশে একদিকে রয়েছে ডোনেশন-নির্ভর এনজিও, বিজ্ঞাপন-নির্ভর ইলেকট্রনিক মিডিয়া, পত্র-পত্রিকা আর মুনাফা-নির্ভর বহুজাতিক কোম্পানি। অন্যদিকে রয়েছে ধর্মকে পুঁজি করে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা– এই দুটি ধারা থেকে কিছুটা উপকৃত হলেও জনগণ কিন্তু এর কোনোটির ওপরই সন্তুষ্ট বা আস্থাশীল নয়। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

শাহাদুজ্জামান

এ ব্যাপারটির সঙ্গে বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক বাস্তবতার সম্পর্ক রয়েছে। বাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় এমনটি ঘটে থাকে। শুধু বর্বরতা দিয়ে পুঁজিবাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয় এখন। এর সঙ্গে একটা মানবিকতার মিশেল অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 'বিজনেস উইথ এ হিউমেন ফেস' বলে একটি কথা আছে। ফলে নানা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকেও দেশপ্রেম, নারী উন্নয়ন ইত্যাকার প্রগতিশীল কথাগুলোর মধ্য দিয়েও নিজেদেরকে জনগণের সামনে হাজির করতে হচ্ছে। মানবতা এবং মুনাফা দুটোর ভেতর একটা টেনশন তো থেকেই যাচ্ছে ফলে জনগণের পক্ষে সর্বাংশে সন্তুষ্ট হওয়া দুরূহ।

হালখাতা

ফিল্যানথ্রপি চর্চার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের সমগ্র জনসাধারণের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি আনা কি সম্ভব? নাকি রাষ্ট্রীয়ভাবেই জনসাধারণের মুক্তি একমাত্র পথ?

শাহাদুজ্জামান

জনগণের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির কথা যদি বলেন তাহলে বলতে হবে শুধুমাত্র 'ফিল্যানথ্রপি'র মাধ্যমে তা কখনই সম্ভব নয়, রাষ্টীয়ভাবেই তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে 'ফিল্যানথ্রপি' সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে যেসব রাষ্ট্র বৃহত্তর জনমুখি নয় সেখানে নানারকম সেবামূলক কাজ রাষ্ট্র এবং বঞ্চিত জনগণের মাঝের নানা গহ্বরগুলো পূরণ করতে পারে।

হালখাতা

ফিল্যানথ্রপির যে দর্শন, সেটাকে আপনি সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন কিনা? নাকি এর চর্চার যথার্থতাকে নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ফিল্যানথ্রপিকে আপনি সমর্থনযোগ্য মনে করেন?

শাহাদুজ্জামান

আগেই উল্লেখ করেছি দান-দক্ষিণার মধ্য দিয়ে কোনো সমাজের সার্বিক উন্নয়ন হয় না। তবে 'ফিল্যানথ্রপি'কে আমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ও মনে করি না। আগের প্রশ্নে আমি 'ফিল্যানথ্রপি'র ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছি।

হালখাতা

একজন মানুষ নানা রকম জনহিতকর কাজের মধ্য দিয়ে ফিল্যানথ্রপিস্ট হয়ে ওঠেন। প্রশ্ন হল সমাজের আর দশটা মানুষ থেকে ঐ ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব জনহিতকর কাজ করার লক্ষ্যে আলাদা ধরনের হয়ে ওঠে কেন ও কীভাবে?

শাহাদুজ্জামান
মনস্তত্ত্ববিদরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন । নানা মানুষের মধ্যে নানা ধরনের প্রবণতা থাকে। জেনেটিক কোড, পরিবার, সামাজিক পরিবেশ এমন বিবিধ বিষয়ের মিথষ্ক্রিয়ায় একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এমনিভাবেই কারো কারো মধ্যে অন্যের জন্য কিছু করবার একটা সহজাত তাগিদের জন্ম নেয়। সেদিন টেলিভিশনের একটি রিপোর্টে দেখছিলাম নওগাঁর কোনো এক গ্রামে এক বৃদ্ধকে সবাই তাল বুড়া বলে ডাকে। এই বৃদ্ধ ভিক্ষুক অর্থ, অন্ন ভিক্ষার পাশাপাশি তালের মৌসুমে সবার কাছ থেকে তাল ভিক্ষা করেন। সেই তালের আঁটি তিনি লাগান গ্রামের প্রধান সড়কের দু'পাশে। বহু বছর ধরে এ কাজ তিনি করে আসছেন। এখন ঐ গ্রামের মূল রাস্তার দুপাশে সেই তাল বুড়ার লাগানো সারি সারি তাল গাছ। সেই বৃদ্ধ এখনও ভিক্ষাই করেন। ফিল্যানথ্রপির মোক্ষম উদাহরণ। এই বৃদ্ধের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা সহজ কাজ হবে না।

হালখাতা
উপরের প্রশ্নটির ঠিক উল্টো একটি প্রশ্ন; যেখানে ফিল্যানথ্রপি'র মতো একটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি, সেই একই পৃথিবীকে আধুনিকতার নামে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে ব্যক্তিসর্বস্বতা একেবারে গ্রাস করে নিচ্ছে। মানুষের পৃথিবীতে এই ব্যক্তিসর্বস্বতা কখনোই এতটা প্রবল ছিল না, মানুষের এই ব্যাধি তাকে পশুর চেয়েও নিচে নামিয়ে আনছে। এ ব্যপারে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, ব্যক্তিসর্বস্বতার উৎপত্তি ও এর বিস্তারের কারণ কী?

শাহাদুজ্জামান
সমাজবিকাশের সঙ্গে ব্যক্তির বিকাশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুঁজিবাদী সমাজবিকাশের অনিবার্য শর্ত। পুঁজির সচলতা নিশ্চিত করতে ব্যক্তিকে ব্যক্তি হয়ে উঠতে হবে। পুঁজিবাদের ঊষালগ্নে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যক্তির মুক্তির শর্ত হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় পুঁজিবাদ আগ্রাসী হয়ে উঠেছে, ব্যক্তিকেও হতে হয়েছে আগ্রাসী। মুনাফা এবং প্রতিযোগিতা যেখানে জীবন যাপনের প্রধানতম শর্ত সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিস্বর্বস্বতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। ব্যক্তিস্বার্থ এবং সমষ্টিস্বার্থের এই সমীকরণ কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজও মেলাতে পারেনি সঠিকভাবে। ফলে ব্যাপারটি জটিল।

হালখাতা
ধর্মীয় দৃষ্টিতে মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি তৈরি করে যারা মানুষের কল্যাণ করছেন বলে মনে করেন, ফিল্যানথ্রপিক্যাল দিক থেকে তাদের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

শাহাদুজ্জামান

মসজিদ, মন্দির ধর্মীয় দৃষ্টিতে তৈরি হচ্ছে না অন্য স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হচ্ছে সেটা খতিয়ে দেখা জরুরি। আমাদের দেশে ফিল্যানথ্রপিক কাজ হিসেবে মসজিদ, মন্দির তৈরির চাইতেও জরুরি জাগতিক কাজ আছে বলে মনে করি।

হালখাতা

অনেকের মতে বাংলাদেশে তো এখন 'উন্নয়ন', 'জনকল্যাণ' তথা 'ফিল্যানথ্রপি'র রমরমা ব্যবসা চলছে; এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

শাহাদুজ্জামান

উন্নয়ন, জনকল্যাণ ইত্যাদির নামে ব্যবসা হচ্ছে স্বীকার করি কিন্তু পুরো ব্যাপারটাকে একবারে ঢালাওভাবে বিবেচনা করাও সমীচীন মনে করি না। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন ভাবনা একটা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। উন্নয়ন সংস্থার কর্মকাণ্ড বাংলাদেশে একটি বাস্তবতা, একে গভীর বিশ্লেষণ ছাড়া গ্রহণ, বর্জন কোনোটাই ঠিক নয়।

হালখাতা

আপনার উপন্যাসে 'ফিল্যানথ্রপি' বিষয়টি কি কোনোভাবে উঠে এসেছে? আপনার উপন্যাসের সে রকম দু-একটা জায়গা সম্পর্কে যদি 'হালখাতা'র পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলেন...।

শাহাদুজ্জামান

সচেতনভাবে ফিল্যানথ্রপিকে উপজীব্য করে কখনো কিছু লিখবার চেষ্টা করেছি বলে মনে পড়ে না। তবে আমার গল্পের কোনো কোনো চরিত্রের মধ্যে ফিল্যানথ্রপিক উপাদান থেকে থাকতেও পারে। আমার 'ইব্রাহিম বক্সের সার্কাসের' ইব্রাহিম যে গোপনে মৌমাছির মধু থেকে মানুষের জন্য এক যুগান্তকারী ঔষধ আবিষ্কারের গবেষণা করছে তাকে কি ফিল্যানথ্রপিস্ট বলা চলে?

নি ব ন্ধ

কয়েকজন জনহিতৈষী

জ য় না ল আ বে দী ন

মানুষের ভালো বা মঙ্গলের জন্য যাঁরা প্রচারবিমুখ হয়ে কাজ করেন, চিন্তা করেন ও দান করেন তাঁরাই জনহিতৈষী। আমি এমন কয়েকজন জনহিতৈষী সম্পর্কে জানি। তাঁদের মধ্যে আছেন অতীশ দীপঙ্কর, ডা. মনমথনাথ নন্দী, আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, বিশ্বরঞ্জন সেন, আবদুশ শহীদ, অধ্যক্ষ বি. রহমান ও বিন্দু ফকির। এদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর ও ডা. নন্দী বাদে অপর পাঁচজনকে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে।

এক

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে একজন বৌদ্ধধর্মের পণ্ডিত, ধর্মগুরু ও দার্শনিক হিসেবে জানি। বিশ্বে এখনও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অন্য যে কোনো ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় বেশি। গৌতম বুদ্ধের পরেই যাঁকে অনেক মানুষ মনে করেন– সে ব্যক্তিটি বাংলাদেশের বিক্রমপুরের সন্তান। ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বজ্রযোগিনী গ্রামে এক রাজপরিবারে তাঁর জন্ম।

শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর একজন ধর্ম প্রচারক, পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন এর পরেও তাঁর একটি বড় পরিচয় তিনি একজন ‘জনহিতৈষী’। ধর্মপ্রচার, শিক্ষা, জ্ঞান দানের সাথে তিনি মানবকল্যাণের জন্যও অনেক কাজ করেছেন। জ্ঞানার্জন ও মানবকল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেন– এ জন্য তিনি ঘর সংসার পর্যন্ত করেননি। বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক বিদ্যায় নিজেকে সুপণ্ডিতে প্রতিষ্ঠিত করে ৩১ বছর বয়সে তিনি আচার্য ধর্মরক্ষিত কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুদের শ্রেণীভুক্ত হন। মগধের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আচার্যদের নিকট শিক্ষালাভের পরে তিনি ‘শূন্য থেকে জগতের উৎপত্তি’ তত্ত্ব (শূন্যবাদ) প্রচার করেন। ৪৩ বছর বয়সে তিনি বাগ্মিতা, যুক্তি ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে তখনকার প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নিয়ে তাদের পরাজিত করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের স্বীকৃতি লাভ করেন। এ সময়ে তিনি বিক্রমশিলা মহাবিহারের আচার্য পদে নিয়োগ পান। বিক্রমশিলাসহ

উদন্তপুরী ও সোমপুর বিহারে দীপঙ্কর ১৫ বছর অধ্যাপক ও আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে মহীপালের পুত্র ন্যায়পালের সঙ্গে কলচুরীরাজ লক্ষ্মীকর্ণের যে যুদ্ধ হয়– দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় তার অবসান ঘটে এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। এ সময়ে তিব্বতের বৌদ্ধরাজা লা: লামা ইয়োসি হোড (লাহ্‌লামা যে-শেস্‌) তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি কামনায় দীপঙ্করকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বর্ণোপহার ও পত্রসহ বিক্রমশিলায় দূত প্রেরণ করেন। দূত জানান দীপঙ্কর তিব্বতে গেলে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান জানানো হবে। কিন্তু নির্লোভ ও নিরহঙ্কার দীপঙ্কর এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

রাজা লা: লামার মৃত্যুর পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যাংচুব (চ্যান-চাব) জ্ঞানপ্রভ তিব্বতের রাজা হয়ে দীপঙ্করকে একান্ত অনুরোধ করেন তিব্বত ভ্রমণের জন্য। ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন পণ্ডিতসহ দীপঙ্কর মিত্র বিহারের পথে তিব্বত যাত্রা করেন। মিত্র বিহারের অধ্যক্ষ-অধ্যাপকগণ এই দলকে অভ্যর্থনা জানান। পথেও বহুস্থানে তাঁরা অভ্যর্থিত হন। নেপালের রাজা অনন্তকীর্তি দীপঙ্করকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করেন। দীপঙ্কর সেখানে 'খান-বিহার' নামে একটি বিহার স্থাপন করেন এবং নেপালের রাজপুত্র পনুপ্রভকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তিব্বতের রাজা দীপঙ্করকে রাজকীয় সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে বরণ করেন। তাঁকে তিব্বতের মহাচার্য ও ধর্মগুরু হিসেবে রাজা ঘোষণা করেন। তিব্বতে থোলিং ছিল দীপঙ্করের প্রধান কর্মস্থান। তিব্বতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র প্রচার করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রচেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ব্যভিচার দূর হয় এবং বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্মাচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বতীরা দীপঙ্করকে বুদ্ধের পরেই শ্রেষ্ঠগুরু হিসেবে সম্মান ও মান্য করে। তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে দীপঙ্করের প্রভাব অদ্যাবধি বিদ্যমান। তিব্বতে বসে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের একটি নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে বড় ধরনের জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ করেন। ধর্ম, জ্ঞান, দর্শন বিষয়ে তিনি প্রায় দুশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বতে তিনি অনেক সংস্কৃত-পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং নিজহাতে সেগুলোর প্রতিলিপি তৈরি করে বাংলাদেশে পাঠান। তিব্বতি ভাষায় তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও কারিগরিবিদ্যা সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন বলে তিব্বতিরা তাঁকে 'অতীশ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সুদীর্ঘ ১৩ বছর তিব্বতে অবস্থানকালেই ৭৩ বছর বয়সে ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে লাসা নগরের লেথান পল্লীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁর সমাধিস্থল তিব্বতিদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২৮ জুন দীপঙ্করের পবিত্র চিতাভস্ম চীন থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকায় আনা হয় এবং তা ঢাকা বৌদ্ধবিহারে সংরক্ষিত আছে। ধর্মপ্রচারক, অধ্যাপক, দার্শনিক, জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের কয়েকটি বাণী:

* অন্যের দোষ সন্ধান করবেন না, আত্ম-দোষ প্রচার করবেন, অন্যের গুণ প্রচার করবেন,
নিজের গুণ গোপন রাখবেন।
* ক্রোধ ও অহমিকা বর্জন করুন, চিত্তকে নম্র করুন।
* বাক্যবাগীশ হবেন না, জিহবাকে সংযত রাখুন।
* অন্যদের অপমান করবেন না, বিনয়ী হবেন, অন্যদের প্রতি ভালোবাসা ও কল্যাণের কথা ভেবেই তাদের উপদেশ দিবেন।

দুই
ডা. মনমথনাথ নন্দী

১৯৩৭ সালে কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে স্বর্ণপকদপ্রাপ্ত এম.বি ডাক্তার। বাপ-দাদার আদি নিবাস মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায়। তাঁর বাবা ছিলেন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। ১৯৩৮ সালে তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক থাকাকালে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ফ্রান্সে যাওয়ার স্কলারশিপ পান। কিন্তু ডা. নন্দী ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ না করে চলে আসেন বিক্রমপুরের শ্রীনগরে সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত শ্রীনাথ চেরিটেবল হাসপাতালে। ১৯৩৮ সালের শ্রীনগর আর বর্তমানের শ্রীনগর-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। বর্তমানের শ্রীনগর ঢাকা থেকে সড়কপথে ৪০ মিনিটের পথ। সেকালের শ্রীনগরের অবস্থা ছিল একেবারেই অনুন্নত। রাস্তা নেই ঘাট নেই বিদ্যুৎ নেই টিউবওয়েল নেই। কিন্তু কলিকাতা কারমাইকেল কলেজের হাউজ ফিজিশিয়ান ডা. নন্দী ফ্রান্সের স্কলারশিপ ছেড়ে নিভৃত পল্লী শ্রীনগরে এলেন কেন? এটা যে একজন মানুষের কত বড় ত্যাগ, তা ভাবলে শুধু অবাক নয় হতভম্ব হতে হয়। ডা. নন্দী নিজের কেরিয়ার গড়ার চেয়ে সেকালের বিক্রমপুরবাসীদের স্বাস্থ্য সেবাদানের বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে কলিকাতা ও ফ্রান্সের আধুনিক জীবনযাত্রা ত্যাগ করে আসেন শ্রীনগরে। সেই থেকে শুরু করে একটানা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শ্রীনগর হাসপাতালের কর্ণধার ছিলেন ডাক্তার নন্দী। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন সরকার তাঁকে নিয়ে আসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কারণ বড় বড় হিন্দু ডাক্তাররা দেশভাগের ফলে কলিকাতা চলে যাওয়ায় ঢাকা মেডিকেলে ডাক্তারের সংকট চলছিল। অবশ্য ঢাকা মেডিকেলে যোগদানের পরেও তিনি গয়না নৌকায় চড়ে শ্রীনগর গিয়ে বিক্রমপুরবাসীর চিকিৎসা অব্যাহত রেখেছেন। শ্রীনগর শ্রীনাথ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক থাকাকালে ডা. নন্দী এলাকায় ২০০ জন নারী-পুরুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নার্স ও কম্পাউন্ডার হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি সারাজীবন গরীব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। তাঁর চিকিৎসা সেবার মানও ছিল অনেক উন্নত। বর্ষাকালে নৌকায় চড়ে ও শুকনাকালে তিনি পায়ে হেঁটে অথবা বাইসাইকেলে চড়ে রোগীদের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা

করতেন। কিন্তু শ্রীনগর এলাকায় আশ্বিন-কার্তিক মাসে নৌকাও চলত না হেঁটেও যাওয়া যেত না; এ সময় তিনি কাদা-পানি ভেঙে গিয়ে রোগীদের দেখে আসতেন। বেজগাঁও গ্রামের মরহুম শেখ মুহ. নূরুল ইসলামের সহধর্মিনী রওশন আরা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন 'তার বাবা মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্ একবার কার্তিক মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ডা. নন্দী হাঁটু পর্যন্ত কাদা-পানি ভেঙে তাদের বাড়িতে এসে হাজির হন। ডা. নন্দী দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। তিনি বাবাকে পরীক্ষা করলেন এবং মাকে ডেকে নিয়ে বাবার সেবা-শুশ্রূষার নিয়মকানুন সব বুঝিয়ে দিলেন। মা তাঁর সামনে যাননি, আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন; আড়াল থেকে ডা. নন্দী এমনভাবে সব নিয়ম-কানুন বুঝিয়ে দিলেন যে মার বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি।' শেখ মুহ. নূরুল ইসলাম একবার আমাকে ডা. নন্দী সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি যখন খুব ছোট তখন একদিন হঠাৎ তার যেন কী হয়! সবাই ভেবেছেন তিনি মরে গেছেন। এ সময় তাদের বাড়িতে একমাত্র মা ছাড়া কেউ ছিলেন না। পাড়ার এক মুরুব্বী নেওয়াজ শেখকে সাথে নিয়ে তার মা ছুটলেন ডা. নন্দীর হাসপাতালে। হাসপাতাল তখন ছুটি হয়ে গেছে। ডা. নন্দী উপরের তলায় চিলেকোঠায় গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। নিচে ডাক্তারকে না পেয়ে মা নূরুল ইসলামকে কোলে নিয়েই দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলেন। সে সময় ডা. নন্দীও উপর থেকে নিচে নামছিলেন। সিঁড়িতে শিশু কোলে মাকে দেখেই তিনি দ্রুত মার কোল থেকে নূরুল ইসলামকে নিজের কোলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে দিলেন। ঔষধ দিলেন। যে মা কান্না নিয়ে এসেছিলেন সেই মা হাসিমুখে ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।' ডা. নন্দী কখনও কোন রোগী বা রোগীর আপনজনের সাথে খারাপ আচরণ করেননি। অধিকাংশ সময়ে পয়সার বিনিময়ে চিকিৎসা করেননি। ১৯৫০ সালে শ্রীনগর ছেড়ে ঢাকার ওয়ারিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকালে নিয়মিত রোগী দেখতেন। তখন অবশ্য ফি নিতেন ২/৩ টাকা। তাঁর সম-সাময়িক কালেও তাঁর ছাত্রতুল্য অনেকেই ৮ টাকা করে ফি নিতেন। স্ত্রী শান্তি নন্দী মাঝেমধ্যে ফি বাড়ানোর জন্য বললে তিনি বলতেন, 'আমি ডাক্তার হয়েছি মানুষের সেবা করার জন্য, ফি বাড়িয়ে টাকা কামিয়ে ধনী হওয়ার জন্য নয়।'

ডা. এম.এন. নন্দী চিকিৎসা সেবা দান ছাড়াও শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন। শ্রীনগর শ্রীনাথ হাসপাতালের বড় ডাক্তার থাকাকালীন তিনি দীর্ঘ সময় ষোলঘর এ কে এস কে উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত ষোলঘর এ কে এস কে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা লেখাপড়া ও খেলাধুলায় যে ভালো ফল করেছে– তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন ডা. এম.এন. নন্দী।

মানুষের সেবা করাই ছিল তাঁর ধর্ম। ১৯৪২-৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে নিজের জমানো টাকা ব্যয়ে তিনি শ্রীনগরে লঙ্গরখানা খুলে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষকে খাওয়া দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছেন। মানবদরদি এ মানুষটি তখন আরো একটি কাজ করতেন– তা হল সমাজ বদলের জন্য সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক কর্মীদের আশ্রয় দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন, সাহায্য করতেন।

ডা. এম. এন. নন্দী জন্মভূমি বাংলাদেশ ছেড়ে কখনও পশ্চিমবঙ্গে যেতে চাননি। ঢাকা ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান। ১৯৬৫ সালে সড়কপথে লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে লাহোরে তার ছেলে, ছেলের স্ত্রী ও কন্যা সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। খবর পেয়ে তিনি ছুটে যান লাহোরে। নিজে চিকিৎসা দিয়ে তাদের সুস্থ করে ঢাকা আসার সময়ে বর্ডার ক্রস করার সময় জানতে পারেন আইয়ুব সরকারের কুখ্যাত গভর্নর মোনায়েম খান তাঁকে দেশে ঢুকতে দেবেন না– তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কলিকাতায় ফিরে গিয়ে বারবার চেষ্টা করতে থাকেন স্বদেশে ফেরার জন্য। ওয়ারির বাড়িতে তখন সকল জিনিসপত্র ও শান্তি নন্দীর শাড়ির ভাঁজে রাখা ছিল তখনকার দিনের ৩০ হাজার টাকা। ঢাকার শ্রেষ্ঠ হারমোনিয়াম, পিয়ানোটি নন্দীর বাসায়। তাঁর দু'কন্যা ইনিরো ও মনিরো ছাড়া ঢাকার কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জমে উঠত না। ঢাকার বাসা থেকে এসব লুঠ করে নিয়েছিল বদমাশ মোনায়েম খানের অফিসাররা। এসব ঘটনা আমি শুনেছি দেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ফয়েজ আহম্মদ-এর নিকট থেকে। ফয়েজ আহমদ ছিলেন ডা. নন্দীর পুত্রতুল্য ও ভাবশিষ্য। ডা. এম.এন. নন্দী শত চেষ্টার পরেও যখন আর ঢাকায় ফিরতে পারলেন না তখন বাধ্য হয়েই তিনি শিলিগুড়িতে বসবাস শুরু করে গরিব-দুঃখীর সেবা শুরু করলেন। কলিকাতায় তাঁর নিজস্ব ফ্লাট ছিল তবুও শিলিগুড়িতে বসবাস করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবা দেয়া । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দু'একবার ঢাকায় আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই খবর পেয়ে শিলিগুড়ির মানুষেরা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করেছিলেন এ জন্য যে, তারা ভাবতেন নন্দী ঢাকায় গেলে আর ফিরবেন না– তাই নন্দীকে ঢাকায় যেতে দিতে চান না। শিলিগুড়ির জনতার সেই দাবির মুখে তিনি আর ঢাকা আসতে পারেননি।

১৯৯৪ সালে আমি এম.এন. নন্দীকে কুমিল্লা থেকে একটি পত্র লিখি। উত্তরে তিনি প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন 'বিক্রমপুরের একজন নৌকার মাঝির সাথে আলাপ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়।' মনের আয়তন কত বড় হলে এ ধরনের কথা লেখা যায়। কত বড় মনের মানুষ ছিলেন ডা. নন্দী।

ডা. নন্দীর মতো জনহিতৈষী চিকিৎসক, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যানুরাগী ও দেশ প্রেমিক মানুষের আজ বড়ই অভাব। এমন এক চিকিৎসকের সেবাদান থেকে ঢাকা তথা বাংলাদেশের মানুষকে বঞ্চিত করেছে মোনায়েম খান নামক এক অমানুষ শাসক। শাসকেরা যদি অমানুষ হয় তা হলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বিপদ হয়ে পড়ে আসন্ন। এবং এ বিপদের কারণেই ১৯৬৫ সালের পরে ঢাকাবাসী হারিয়েছিল ডা. এম.এন নন্দীর মতো মানবপ্রেমিক চিকিৎসক। তাতে ডা. নন্দীদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নি; তিনি চিকিৎসা সেবা ঠিকই চালিয়ে গেছেন, হয়তো ঢাকায় নয়, অন্যত্র।

তিন

আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী

আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী ছিলেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজসেবক ও রাজনীতিক। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন। এর আগে তিনি মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি এন্ট্রান্স পাস করে ঢাকা কলেজে আই.এ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। বিক্রমপুরের মুসলমান সমাজ ছিল সে যুগে সবদিক দিয়ে পিছিয়ে। সে কারণে তিনি শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে আসেন মুসলমানদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ১৯২৪ সালে তিনি গঠন করেন মুন্সীগঞ্জ মুসলিম সমিতি। উদ্দেশ্য ছিল পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের লেখা পড়ায় সহায়তা করা। ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় আইন পরিষদের' নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির প্রার্থী হিসেবে আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী প্রবল প্রতাপশালী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পরাজিত করে পার্লামেন্ট সদস্য হন। ১৯৫৪ পর্যন্ত একটানা ১৮ বৎসর তিনি পার্লামেন্ট মেম্বার ছিলেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পরে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৬৩ সালের নির্বাচনে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বৃহত্তর ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। ঢাকা জিলা বোর্ডের সদস্য ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রায় ২৫ বৎসর। তিনি ছিলেন নীতির মানুষ। শেরেবাংলার সাথে তিনি রাজনীতি শুরু করলেও পরে নেতার নির্দেশে মুসলিম লীগে আসেন। কিন্তু আর দল বদল করেননি। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হওয়ার জন্য শেরেবাংলা পত্র দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ হেরে যাবে এটা জেনেও তিনি দল বদলিয়ে যুক্তফ্রন্টে যাননি। ১৯৭১ সালে তিনি মুন্সীগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখন প্রকৃত শান্তির জন্য কাজ করেছেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও কাণ্ডের তিনি বিরোধিতা করেছেন। বহু মুক্তিযোদ্ধার জীবন বাঁচিয়েছেন। তাঁর বাড়ির অন্দরমহলে শহরের অনেক হিন্দু মেয়ে আশ্রয় নিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানী সেনা অফিসার ঘোষণা করেন, আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী শান্তিকমিটির লোক নন, তিনি আসলে মুক্তিবাহিনীর লোক । তখন তিনি আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করেন। তিনি শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন মূলত মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য।

আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীর রাজনীতি ছিল দেশ ও দশের সেবার জন্য – নিজের জন্য নয়। তিনি ক্ষমতার রাজনীতি করেছেন– কিন্তু ক্ষমতাকে এক মুহূর্তের জন্যও ব্যক্তিগত স্বার্থে খাটাননি। তিনি মূলত ছিলেন সমাজসেবক ও সাহিত্যসেবক। এম পি, এম এন এ, উপদেষ্টা ছাড়াও তিনি দীর্ঘকাল ২৫টি জাতীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য, পরিচালক ও সভাপতি ছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। সমবায় সমিতি ও চিনিকলের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ছিলেন পরিচালক। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের ধনী হিন্দুরা তাঁকে

বিশ্বাস করে তাদের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিনা পয়সায় তাঁকে দিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নির্লোভ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী কারও সম্পত্তি গ্রহণ না করে সকলকে হাসিমুখে বিদায় করেছেন এই কথা বলে যে, 'সম্পত্তি, টাকা-অর্থ-বিত্ত দিয়ে আমি কী করব?' তাঁর সুপারিশ নিয়ে ১৯৪৭-৪৮ সালে এলাকার লোকজনেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিত্তশালী হয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রাদেশিক প্রাইমারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সদস্য, টেক্সট বুক বোর্ডের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, হরগঙ্গা কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন ৩০ বৎসর। তিনি যতদিন মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন ততদিন অন্যকেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসেন নি।

সওগাত, মোহাম্মদী, প্রবাসী, মানসী, মর্মবাণী, সাম্যবাদী, ছোলতান পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। তিনি সম্পাদনা করতেন পাকিস্তানী আমলে মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'মাসিক গ্রামের কথা' পত্রিকাটি ।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৩৫০) সময় তিনি ছিলেন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য। তাঁর প্রচেষ্টায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সর্বত্র লঙ্গরখানা, জরুরি হাসপাতাল ও দুর্গতদের নিবাস স্থাপিত হয়। তার প্রচেষ্টায় বিক্রমপুরের সর্বত্র বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, হাসপাতাল, মা-শিশুকল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ কে. কে. ইনস্টিটিউশন ও মুন্সীগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। মুন্সীগঞ্জ মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোধা তিনি। সারা জীবন সমাজ ও মানবসেবা করে গেছেন আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী। নিজে ঘর-সংসার করেননি।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে যেখানে শান্তি কমিটির নেতারা আত্মগোপন করে বা জেলে গিয়ে জীবন বাঁচাতে শুরু করে– মুন্সীগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটির সভাপতি আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীর ক্ষেত্রে ঘটে এর বিপরীত ঘটনা। তিনি মুক্তিবাহিনীর সাথে একত্রে বিজয় উৎসব করেন। ১৯৭২ সালে তাঁকে সরকারী প্রতিনিধি করে হজ্বব্রত পালন করতে মক্কানগরীতে পাঠানো হয়। জনহিতৈষী আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী ১৯৮৭ সালে ৯৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পরে তাঁর রেখে যাওয়া সহায়-সম্পত্তির মূল্য হিসাব করে দেখা যায় টাকার অংকে তা ৫০,০০০/= মাত্র।

চার

বিশ্বরঞ্জন সেন

১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালিতে দাঙ্গা-বিরোধী শান্তি মিশন নিয়ে আসেন। এই মিশনের অগ্রগামী দলের সদস্য ছিলেন বিশ্বরঞ্জন সেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের স্নাতক বিশ্বরঞ্জন সেন এম.এ পড়াকালে মহাত্মা গান্ধীর আহবানে– লেখাপড়া ছেড়ে অহিংস রাজনীতিতে যোগ দেন। সেদিন থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অহিংস নীতিতে অটল ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন কলকাতা সংস্কৃত

কলেজের অধ্যাপক এবং বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য। পিতা ছিলেন ঘোরতর গান্ধীবিরোধী। পুত্রের গান্ধীবাদী হওয়াকে পিতা গ্রহণ করেননি। তাই বিশ্বরঞ্জন সেন স্বেচ্ছায় পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে নিজের অংশ ত্যাগ করার ঘোষণা দেন।

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি শান্তি মিশন শেষ করে চলে যাওয়ার সময় কয়েকজন সহকর্মীকে নোয়াখালিতে থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের ফলে যে কয়জন গান্ধীর শিষ্য নোয়াখালিতে থেকে যান তাদের অন্যতম বিশ্বরঞ্জন সেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলেও বিশ্বরঞ্জন সেন শান্তি মিশন নিয়ে নোয়াখালিতেই থেকে যান। এ সময়ে নোয়াখালি অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। জয়াগের জমিদার তাঁর সকল স্থাবর সম্পত্তি মহাত্মা গান্ধীকে দান করেন। এ সম্পত্তি দিয়ে জয়াগে গড়ে তোলা হয় গান্ধী আশ্রম। গান্ধী আশ্রমের মাধ্যমে বিশ্বরঞ্জন সেন অন্যান্য সাথীদের নিয়ে নোয়াখালি এলায় বিদ্যালয়, শিশু আশ্রম ও স্বাস্থ্যসেবার কাজ চালিয়ে যান। জনগণের চলাচলের সুবিধার জন্য তাদের প্রচেষ্টায় কয়েকটি সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করা হয়।

১৯৫৮ সালে আইয়ূব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। এ সময়ে বিশ্বরঞ্জন সেনকে কারাবরণ করতে হয়। গান্ধী আশ্রমের স্থাবর সম্পত্তি এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তিগতভাবে গ্রাস করার উদ্যোগ নেয়। বিশ্বরঞ্জন সেন সাথীদের নিয়ে তার প্রতিবাদ করলে প্রভাবশালী মহলটি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাঁকে সাজানো চুরির ঘটনার আসামী করে। আদালতে বিশ্বরঞ্জন সেন নিজের পক্ষে উকিল না রাখার অনুরোধ জানিয়ে বিচারককে উদ্দেশ্য করে বলেন যে সাক্ষ্যপ্রমাণে যেহেতু আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তাই আমি স্বেচ্ছায় কারাবরণ করতে সম্মত। দয়া করে আমাকে কারাগারে পাঠান। অথচ নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেই তিনি মুক্তি পেতেন। স্বেচ্ছায় এই কারাবরণে মানুষ তাঁকে দেখার জন্য আদলতে ভিড় জমায়। স্বেচ্ছায় কারাভোগের পরে বিশ্বরঞ্জন সেন মুক্ত হয়ে আবার মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বেচ্ছায় কারাভোগের কারণ জানতে চাইলে বিশ্বরঞ্জন সেন আমাকে বলেছিলেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে সাজানো মামলা করেছিল তারা জানে যে তিনি নির্দোষ। স্বেচ্ছায় কারাভোগ করায় হয়তো মিথ্যা অভিযোগকারীদের মনে অনুশোচনা হবে যাতে ভবিষ্যতে আর কারো বিরুদ্ধে এরূপ সাজানো মামলা আর করবেনা– এ বোধ থেকেই তিনি স্বেচ্ছায় কারাভোগের সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে তাঁকে নিরাপত্তাবন্দী হিসেবে কারাগারে রাখা হয়। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি চট্টগ্রাম প্রবর্তক সংঘের স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি শরণার্থী শিবিরে কাজ করেন। স্বাধীনতার পরে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে গড়ে তোলেন খাদি-কুটির শিল্প। এখানে ৬০০ তাঁতে প্রায় ১০০০ অসহায় দরিদ্র মহিলার কর্মসংস্থান করেন। খাদি-কুটির

শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে বিশ্বরঞ্জন সেনের সততা ও নিষ্ঠার ফলে। তখন বিশ্বরঞ্জন সেনকে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক কমিটির বিশেষ উপদেষ্টা করা হয়।

এরশাদের আমলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান খাদি ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা চালায়। এ সময়ে কতিপয় স্বার্থপর কর্মচারির সহায়তায় উক্ত চেয়ারম্যান বিশ্বরঞ্জন সেনের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। এমনকি এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ১০০০ দরিদ্র অসহায় মহিলার শ্রমে গড়ে-ওঠা খাদি-কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করার জন্য বিশ্বরঞ্জন সেন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি ব্রাকের চেয়ারম্যান ফজলে হাসান আবেদকে অনুরোধ করেন খাদি-কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে ব্রাকের সাথে একীভূতকরণের জন্য। সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে জনাব আবেদ বিশ্বরঞ্জন সেনকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নিয়ে আসেন এবং ব্রাকের তত্ত্বাবধানে তাঁকে মানিকগঞ্জে বাসা ভাড়া করে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন।

মানিকগঞ্জে অবস্থানকালে তিনি দেশের দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয় নিয়ে সর্বদা চিন্তা করতেন। এ সময়ে তিনি নিজস্ব স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, বিরোধীদলীয় নেত্রী, মন্ত্রীবর্গ, দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ চিন্তাবিদদের নিকট পত্র দিয়ে অনুরোধ করতেন। অনেকে পত্রের উত্তর দিতেন অনেকে উত্তর দিতেন না। মানিকগঞ্জে অবস্থানকালে তিনি তাঁর পালিতা এক কন্যাকে বিয়ে দেন। শুধু চা-বিস্কুট দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করেন। চিরকুমার বিশ্বরঞ্জন সেন তাঁর চোখ 'সন্ধানী'কে ও দেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দান করেন। মানিকগঞ্জে হঠাৎ করে স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তখন ফজলে হাসান আবেদ উদ্যোগ নিয়ে তাঁকে তাঁর পৈত্রিক নিবাস কলিকাতায় ভাই সর্বরঞ্জন সেন-এর নিকট পৌছে দেন। সেখানে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পরে ১৯৯৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই ও ভাতিজা মৃতদেহ ঢাকায় এনে মেডিকেল কলেজে দান করার উদ্যোগ নেন এবং এ ব্যাপারে আমার সাথে তাঁরা যোগাযোগ করেন। আমার পরামর্শে তাঁরা বিশ্বরঞ্জন সেনের মরদেহ কলকাতা মেডিকেল কলেজে ও চোখ চক্ষুব্যাংকে দান করেন। অহিংসমতবাদী বিশ্বরঞ্জন সেন ছিলেন ১০০% অসাম্প্রদায়িক, মানবপ্রেমিক, গরিব মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও মানবহিতৈষী মহান ব্যক্তিত্ব।

পাঁচ

আবদুশ শহীদ

আবদুশ শহীদ ছিলেন সমাজ বদলের সৈনিক। ১৯৪৩ সালের স্নাতক আবদুশ শহীদ স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং সমাজ বদলের শপথ নেন। বি.এ পাশ করার পরে শেরেবাংলা এ.কে.ফজলুল হক তাঁকে ডেকে নিয়ে কলকাতা পোর্টে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার চাকরিতে যোগ দিতে বলেন। কিন্তু দৃঢ়চেতা আবদুশ শহীদ শেরেবাংলার প্রস্তাবে সম্মত হননি। আবদুশ শহীদের গ্রামের বাড়ি ছিল চাখার-এর উত্তর দিকের গ্রাম বলহার। তাই শেরেবাংলা আবদুশ শহীদকে ভীষণ স্নেহ করতেন। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে একাধিকবার কারানির্যাতন ভোগ করেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বেশির ভাগ ভারতে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানে যারা কমিউনিস্ট আন্দোলন এগিয়ে নিতে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে আসেন আবদুশ শহীদ তাদের অন্যতম। ১৯৪৮ সালে তিনি পাকিস্তানের পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন। ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলার খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দীদের ওপর গুলি করে পুলিশ যে বর্বরতার স্বাক্ষর রাখে তার নজির বিশ্বেও বিরল। খাপড়া ওয়ার্ডের গুলিতে বহুজন শহীদ হয় এবং আবদুশ শহীদ হন মারাত্মকভাবে আহত। তাঁর বাঁচার কথা ছিল না– কপালগুণে বেঁচে ওঠেন। তবে সেই আঘাতের চিহ্ন তিনি বহন করেন আজীবন। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে আবদুশ শহীদ আত্মগোপন করেন। এ সময়ে তিনি বিক্রমপুরের ষোলঘর এ.কে. এস. কে উচ্চ বিদ্যালয়, রুসদী উচ্চ বিদ্যালয় ও লৌহজং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতার মাধ্যমে ছাত্রদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সমাজসচেতন করে গড়ে তুলতে আবদুশ শহীদ আত্মনিয়োগ করেন। রুসদী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে তাঁর প্রচেষ্টায় বিক্রমপুরে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে এনে তিনি রুসদী স্কুল মাঠে কৃষক সমাবেশ করেন।

ষোলঘর এ.কে. এস. কে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে শীতের এক রাতে এক কমরেড আসেন তাঁর সাথে দেখা করতে। রাতে শোবার সময় একটিমাত্র লেপ তিনি পার্টির সদস্যকে দিয়ে নিজেরা শুধু কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমান। এ নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটি হয় এবং পরে এই সামান্য কথা থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটে। আবদুশ শহীদ জীবনে নীতির প্রশ্নে কখনও আপোষ করেননি। সারাজীবন তিনি মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। সেটা করতে গিয়ে স্ত্রী, কন্যা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনও চিন্তা করার সুযোগ পাননি। নীতির প্রশ্নে আপোষ না করায় শেষ জীবনে কোনো দলের সাথেই তাঁর সম্পর্ক ছিল না। এ সময় তিনি নিজেকে 'ব্যক্তি কমিউনিস্ট' হিসেবে পরিচয় দিতেন। সর্বস্বত্যাগী আবদুশ শহীদ সাংবাদিকতাও করেছেন। লিখেছেন অনেকগুলো বই। তাঁর 'কারাস্মৃতি' এক অমূল্য রচনা। আত্মকথা

লিখেছেন তিন খণ্ডে, যা সমকালীন রাজনীতির এক বিশেষ দলিল। তাঁর 'মেকং থেকে গঙ্গা' বইটিও মূল্যবান। অনুবাদ করেছেন বেশ কিছুসংখ্যক বই। আবুল হাশিমের-এর 'আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলার রাজনীতি' তাঁর অনুবাদকৃত গ্রন্থের অন্যতম।

আবদুশ শহীদ স্ত্রী-কন্যা-পুত্রের এমনকি নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেননি এক মুহূর্তের জন্যও। দেশের মানুষের মুক্তির মধ্য দিয়েই স্বজনদের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন তিনি। যদিও জীবনের শেষ সময়ে দারুণ অর্থসংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সময়ে তাঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে এমন সুহৃদদের থেকে অবশ্য হাসিমুখে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। নিজের লেখা বই বাংলা একাডেমীর বইমেলায় ঘুরে ঘুরে নিজেই বিক্রি করতেন। যারা তাঁকে চিনত না, তারা অনেকে তাকে পাগল ভেবে এড়িয়ে যেত। যাঁরা চিনতেন তাঁরা শ্রদ্ধা করে ১০০ টাকার বই ৫০০ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে তাঁকে সহায়তা করতেন। সর্বত্যাগী আবদুশ শহীদ ১৯৪৩ সালে শেরেবাংলার দেওয়া কলিকাতা পোর্টের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার চাকরিতে যোগদান করলে, তাঁর অর্থনৈতিক জীবন হত সুজলা সফলা। কিন্তু সকলের সুখের মধ্য দিয়ে নিজের সুখ খুঁজতে গিয়ে আজীবন বামপন্থী রাজনীতি করে জীবনে দুঃখ-নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই পাননি আবদুশ শহীদ।

ছয়

অধ্যক্ষ বি. রহমান

কৃষক ও ছাত্রপ্রেমিক বিক্রমপুরের কুসুমপুরের অধ্যক্ষ বি, রহমান আরও একজন জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব। বিক্রমপুরে আলুর আধুনিক ফলনের পেছনে রয়েছে জনহিতৈষী বি, রহমানের বিশেষ অবদান। তিনি বৃটিশ আমলে কৃষি বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক কারণে দেশভাগ হলে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন। আলু চাষের আধুনিক কলাকৌশলের ওপর তিনি হল্যান্ডে এক প্রশিক্ষণে যান পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে তিনি চেষ্টা করেন আলু চাষের আধুনিক কলাকৌশল চাষীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে। তিনি সাপ্তাহিক ছুটিতে প্রায়ই গ্রামের বাড়ি সিরাজদিখানের কুসুমপুরে যেতেন। গ্রামের কৃষকদের তিনি আধুনিক উপায়ে আলু চাষের জ্ঞান হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিখানো পদ্ধতিতে আলু চাষ করে ২/৪ জন কৃষক প্রথমবারেই আলু চাষে অধিক ফলন লাভে সক্ষম হন। ঐ পদ্ধতি অনুসারে অধিক ফলন দেখে অন্যান্য চাষীরাও উদ্বুদ্ধ হন এবং ৪ জন থেকে পরের বারে ৮ জন, তার পরের বছর ১৬ জন– এভাবে আলু চাষে আগ্রহীদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। বিক্রমপুরে আলু চাষের ব্যাপক উন্নতির ফলে পাকিস্তান আমলেই এখানে গড়ে ওঠে একাধিক কোল্ড-ষ্টোরেজ। এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সৃষ্টি হয়েছে কয়েক লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছে ব্যাপক হারে। হল্যান্ড থেকে অর্জিত জ্ঞান বি. রহমান

হাতে-কলমে গ্রামের কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে যে জনহিতকর কাজটি করেছেন, তার পেছনে বি. রহমানের কোনো রকম ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না।

বি. রহমান সরকারের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বৃদ্ধবয়সে নিজ এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন ইছাপুরা কে.বি কলেজ। তিনি হন এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। তাঁর ত্যাগ, সাধনা ও ইচ্ছাশক্তির ফলেই বর্তমানে ওই কলেজ বিক্রমপুরের অন্যতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জন করেছে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মিজানুর রহমান শেলী। জনহিতৈষী কৃষক ও ছাত্রদরদী বি, রহমান ৮১ বৎসর বয়সে ২৭.০৯.১৯৯০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

সাত

বিন্দু ফকির

দলিল দস্তাবেজে নাম মীর বিন্দু জালাল, পিতা কালু মীর। কিন্তু নিজ এলাকায় বিক্রমপুরের শ্রীনগরে তিনি 'বিন্দু ফকির' নামে পরিচিত ছিলেন। পেশাগত জীবনে ছিলেন ভেষজ চিকিৎসক। গাছ-গাছালি দিয়ে মানুষের নানা রোগের চিকিৎসা করতেন। ফি নিতেন অতি সামান্য। ১ টাকা সোয়া পাঁচ আনা ও এক প্যাকেট ক্যাপসটেন সিগারেট ও একটি দিয়াশলাই ছিল তাঁর সম্মানী। প্রত্যহ দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন নানা বালা-মুসিমত নিয়ে হাজির হত শ্রীনগর–বেজগাঁও গ্রামের ফকিরবাড়িতে। বিন্দু ফকির মনোযোগ দিয়ে লোকজনদের সমস্যা শুনতেন এবং সমাধানের পথ বাতলে দিতেন। তিনি বুঝতে পারতেন কার সমস্যা শারীরিক আর কার সমস্যা মানসিক। শারীরিক রোগীদের চিকিৎসা দিতেন গাছ-গাছালির নির্যাস থেকে প্রস্তুতকৃত ঔষধ দিয়ে। আর মানসিক রোগীদের চিকিৎসা দিতেন মনোবল দৃঢ় করার জন্য উপদেশ দিয়ে। তাঁর কাছে আগত লোকজনদের বেশির ভাগ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। বিশেষ করে উচ্চবর্ণের অগণিত হিন্দুদের তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু। মুসলমান শিষ্যও তাঁর ছিল অগণিত। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে উচ্চবর্ণের হিন্দু ভক্তরা পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়। এ সময়ে তাঁরা বিন্দু ফকিরকে তাদের সাথে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ করেন। কিন্তু জন্মভিটা ত্যাগ করে তিনি ধনী শিষ্যদের অনুরোধ রাখতে সম্মত হননি। পশ্চিমবঙ্গে গিয়েও তাঁরা নিয়মিত গুরুর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। প্রতি বছর ডাকযোগে ধুতি, গেঞ্জি, চটি জুতা পাঠাতেন। পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বিন্দু ফকির সর্বদা সাদা ধবধবে ধতি ও হাতাওয়ালা গেঞ্জি পরতেন। পায়ে থাকতো চটি জুতা– শীতকালে কালো রং-এর একটি ফতুয়া পড়তেন। প্রতিমাসে কমকরে একবার শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি ভ্রমণ করতেন। এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট বাড়িতে রাত্রিযাপন করতেন। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি আগত শিষ্যদের উপদেশ দিতেন, সৃষ্টির রহস্য নিয়ে আলোচনা করতেন। শিষ্যদের প্রতি তাঁর প্রধান বাণী ছিল 'জীবনে শান্তি বা সুখ পেতে হলে লোভকে বাড়তে দিবে না, অল্পতে তুষ্ট থাকবে।'

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরে তাঁর ধনী শিষ্যরা কলিকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে চলে যাওয়ার সময় তাদের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা বিনা পয়সায় তাঁর নামে লিখে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি শিষ্যদের এ আবেদন হাসিমুখে প্রত্যাখান করেছেন। তার বক্তব্য ছিল 'মানুষের বসতভিটা ও ডালভাত খাওয়ার সঙ্গতিই যথেষ্ট। অনেক সম্পত্তি মানবজীবনের উদ্দেশ্য নষ্ট করে। তাই আমার জমি-জমা-ধন-দৌলতের প্রয়োজন নেই।' ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত তাঁর কাছে ভারত থেকে আসা শিষ্যদের প্রেরিত চিঠির সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ হাজার। বিন্দু ফকির শুধু নাম দস্তখত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তিনি ধর্মীয় কোনো আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন না। শুধু ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় জামাতে ঈদের নামাজ পড়তেন। নিজ হাতে তৈরি করা এক ধরনের সুস্বাদু খাবার (আতপ চাউল, কলা, দুধ ও চিনি দিয়ে তৈরি) ঈদ জামাতে আসা সকলকে খাওয়াতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভালো-মন্দের বিচার আল্লাহ্ দুনিয়াতেই করেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন বিশ্বে মানুষ দু'প্রকারের– নর ও নারী, এর বাইরে মানুষের মধ্যে আর কোনো ভাগ নেই। আর একমাত্র মানুষের সেবাকে তিনি ধর্ম মনে করতেন।

বিন্দু ফকির নিজে কৃষি কাজ করতেন। কৃষি কাজকে তিনি বলতেন 'ইবাদত'। নিজ বাড়ির বাইরের দিকে তিনি লাউগাছের আবাদ করতেন। লাউয়ের ডগা কেটে নিজ হাতে পাড়া-প্রতিবেশীদের বিতরণ করতেন। মৌসুমি ফল আম, কাঁঠাল, বড়ই পাড়া-প্রতিবেশীদের আগে দিয়ে পরে নিজে খেতেন। ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে বাড়িতে জাঁক-জমকের সাথে কলাগাছের ওপর নির্মিত লঞ্চ ভাসাতেন– যাকে 'ভেলা ভাসানো' বলা হত। অগ্রহায়ণ মাসে করতেন 'খোদাই সিন্নি'। আর পহেলা বৈশাখে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতেন। তাঁর ভেলা ভাসানো ও খোদাই সিন্নিতে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্ত ও নানা স্তরের মানুষ আসত। সামাজিক কর্মকাণ্ডে সর্বদা নিজেকে জড়িত রাখতেন তিনি। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে মারা যাওয়া প্রায় ৫০০ মানবসন্তানকে নিজে গোসল দিয়ে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেছেন। এলাকার বিয়ে-সাদি, জেফতের হাজার হাজার মানুষকে রান্না করে খাওয়ানোর সব কাজ তদারকি করতেন নিজে। এ জন্যে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না, মানুষের উপকার করা ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

১৯৭১ সালে শ্রীনগর বাজারে কেনা-কাটা করে বাড়িতে ফেরার সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁকে হিন্দু মনে করে থানায় নিয়ে যায়। পরে পরিচয় জানতে পেরে সম্মান দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। নিজ নাতি (নিবন্ধলেখক) মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম করতে গেলে– মাথায় হাত রেখে বলেন 'দেশের জন্য যুদ্ধে যাচ্ছে যাও, খেয়াল রাখবে, বিনা কারণে যেন কোনো আদমসন্তান তোমার হাতে মৃত্যুবরণ না করে'। তিনি সকল মানুষকে এক আদমের সন্তান মনে করতেন। প্রতিমাসে বাড়িতে মিলাদ পড়াতেন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ছিল তাঁর কাছে অতি পবিত্র বিষয়। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা পড়ে কেউ শোনালে তিনি খুশি হতেন। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীকে তিনি খুব

সম্মান করতেন– ভলোবাসতেন। গান্ধীকে অনুসরণ করতে গিয়েই নিজ হাতে চরকায় পাট দিয়ে এক ধরনের মোটা সুতা তৈরি করতেন– যা দিয়ে ঘর-গেরস্থালির কাজ সারতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকের কাছে শেখ মুজিবের খোঁজ-খবর জানতে চাইতেন। জনহিতৈষী পরোপকারী এই মানুষটি একশত বছর বেঁচে ছিলেন। ১৯৭৭ সালের ১১ সেপ্টম্বরে মৃত্যুবরণ তিনি করেন।

ফিল্যানথ্রপি এবং বাস্তবতা

ফে র দৌ সী সু ল তা না

ছোটবেলা থেকেই জেনেছি গুনাহ্ দুই প্রকার: কবিরা গুনাহ্ আর সগিরা গুনাহ। ভয়ংকর গুনাহ্গুলো হল কবিরা গুনাহ্, যার কোনো মাফ নেই। আল্লাহর দরবারে যতই কান্নাকাটি করো না কেন ৯৯% সম্ভাবনা মাফ না হওয়ার। যেমন: খুন, খুনের চেষ্টা , ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি, ধর্ষণ, অন্যের সম্পত্তি দখল, মিথ্যা বলা এসব কবিরা গুনাহ। সগিরা গুনাহ্গুলো ছোট-খাট গুনাহ। খাস দিলে আল্লাহর কাছে পানা চাইলে আবশ্যই আল্লাহ মাফ করে দেবেন। আমার আলোচ্য বিষয় কবিরা গুনাহ; আমি এ-জীবনে প্রচুর মিথ্যা কথা বলেছি; অর্থাৎ হাবিয়া দোজখ! এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজব সেটাই তো স্বাভাবিক। দূরাত্মার ছলের অভাব হয় না। আমি ফরমুলা আবিষ্কার করে ফেলেছি। কেউ যদি অন্যের উপকারের জন্য অথবা যে কোনো ভালো কাজের নিয়তে মিথ্যা বলে তাহলে তার কবিরা গুনাহ্ সগিরা গুনাহ্ হিসেবে গণ্য হবে। আমি অতঃপর কান্নাকাটি করে হয়তো গুনাহ্ মাফও করিয়ে নিতে পারব আশা করি। আর এসব উপক্রমণিকা এজন্য করলাম যেন পাঠক আমাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন। তবে একটা কথা আমি ঠিক বলিনি। বলেছি, আমি এ-জীবনে প্রচুর মিথ্যা কথা বলেছি ; কথাটা হবে এখনো বলছি ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। আমার প্রথম চাকরি রাইফেলস পাবলিক কলেজে লেকচারার হিসেবে। এখানে দু'বছর কাজ করার পর আমি এডভোকেট হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করি। বছরখানেক প্র্যাকটিস

করার করার পর যোগ দিই ডেল্টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে জনসংযোগ প্রধান হিসেবে। এসময় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন সাফাত আহমেদ চৌধুরী। চৌধুরী সাহেবের দুই মেয়ে। একমাত্র ছেলে ১৮ বছর বয়সে অকালপ্রয়াত হওয়ায় তিনি আমূল বদলে যান। ছেলের মৃত্যুর আগে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে চাকরিরত ছিলেন। ছেলের মৃত্যুর পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং কয়েকজন প্রত্যাগত প্রবাসী মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি। এ কোম্পানির ধরনটাই ছিল তৃণমূল পর্যন্ত বীমা সুবিধা পৌঁছে দেয়া। এজন্য যে বিপুলসংখ্যক মাঠকর্মী দরকার হয় তার অধিকাংশই ছিল নারী। মেয়েদের তিনি যথেষ্ট সুবিধা দিতেন, এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিতও করতেন। মেয়েরা যেন অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয় তার জন্য তিনি প্রশাসনকেও প্রভাবিত করতেন। প্রধান কার্যালয়েও ছিল উল্লেখ করার মতো মহিলা কর্মকর্তা। কী করে যেন ধীরে ধীরে আমি এই মহিলা কর্মীদের মুখপাত্র হয়ে উঠলাম। কারো বাচ্চার অসুখ, কারো স্বামীর সাথে গোলমাল, কারো ঋণ নেয়া দরকার স-অ-ব আমাকেই এমডি'র কাছে পাড়তে হত।

এই যখন অবস্থা তখন এমডি সাহেবের অনেক গোপন কাজও করতে হত আমাকে। তাঁর ছিল এক গোপন খাতা। সেখানে প্রায় ৫০টির মতো নামের তালিকা। নামের ডানে থাকত টাকার অংক। তার ডানে থাকত ইউনিভার্সিটি, কলেজ বা মেডিক্যাল অথবা বুয়েটের নাম। আমার কাজ ছিল প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ঐ সব ঠিকানায় নির্দিষ্ট অংকের টাকা পাঠানো। আমি গুণে দেখলাম সাফাত সাহেবের বেতনের অধিকাংশই এখানে ব্যয় হত। আমার খুব অবাক লাগত। একদিন জিজ্ঞেস করলাম- স্যার, আপনি তাহলে কিভাবে চলেন? উনি বললেন, আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছেন। যা সারাজীবন ব্যয় করলেও ফুরোবে না। কিন্তু নিয়েও গেছেন; সে যে পরবর্তী জীবনে ভোগ করত এসব; তাই আমি এখন যা পাই তা মানুষের জন্য ব্যয় করছি, যারা আমার ছেলের মতো ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি তৈরি করছে। মনে হয় এটি আল্লাহরই ইশারা। তিনি এক ছেলে নিয়ে অনেক ছেলে-মেয়ে দিয়েছেন আমাকে।

আমি বলি, কিন্তু ওদের সাথে তো আপনাকে কখনো কথা বলতে দেখিনি। এরা কেউ কি আসেন এখানে? তিনি বলেন, বলে কী মেয়ে? ওরা আসলে তো আমি টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেব। এটি এক ধরনের পূর্বশর্ত।

আমি বলি, স্যার, কী করে জানবেন ওরা ঠিকমতো পড়ছে, টাকা নষ্ট করছে না?

তিনি হাসেন। বড় পবিত্র সেই হাসি। বলেন, সে জানবার জন্য আমার কাছে মেকানিজম আছে। তুমি নিশ্চিন্তে টাকা পাঠাও।

তাঁর কথামতো এরকমই চলছিল। একদিন সাত সকালে ৯টা বাজতে না বাজতেই ডেকে পাঠালেন আমাকে তাঁর চেম্বারে। গিয়ে দেখি দৈনিক সংবাদটি টেবিলের ওপর। হাত বাড়িয়ে পত্রিকাটি দিয়ে বললেন, এই ফিচারটি পড়। পড়া হয়ে গেলে মন্টু খানসহ আমার কাছে আস।

মন্টু খান সম্পর্কে একটু বলি; মন্টু ভাই উত্তরা ব্যাংকে চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর দারুণ অর্থকষ্টে ছিলেন। কারো কাছে হাত পাতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এটি জানতেন বলেই একদিন ডেকে এনে আমার পাশে বসিয়ে দেন। আমাকে বলেন, ও তোমার সাথে জনসংযোগ বিভাগে কাজ করবে। মানে কাজ আর কী, তুমি যদি কিছু কাজে লাগাতে পার, করবে নইলে বসে থাকবে। তুমি খেয়াল রেখ। মন্টু ভাইকে অনেকে চিনবেন হয়তো। সাংবাদিক আবেদ খানের বড় ভাই। ৭১ সালে পাকসেনারা ধরে নিয়ে গিয়ে অনেক নির্যাতন করেছিল। স্বাধীনতার পর ছাড়া পেয়ে একটি বই লেখেন তিনি বন্দী জীবন নিয়ে। 'হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন' বইটির পরতে পরতে বীভৎস নির্যাতনের চিত্র অংকন করেছেন তিনি। একেবারে চাঁছাছোলা। আমি তো এক পাতার বেশি পড়তেই পারিনি একবারে। কতদিন যে লেগেছে এটি শেষ করতে। যাহোক , আমি আর মন্টু ভাই মিলে ফিচারটি পড়লাম। একটি বস্তিবাসী মেয়ের সাফল্যের কাহিনী। মেয়েটি ঐ বছর এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। তার উচ্চশিক্ষা নেয়ার ইচ্ছা এবং আর্থিক কারণে পড়তে না পারার আশঙ্কা।

ফিচার পড়া শেষ করে সাফাত সাহেবের কাছে গেলাম দু'জনে মিলে। তিনি আদেশ করলেন, একে খুঁজে বের করো আজই। তারপর আমাকে রিপোর্ট করো। পুলের গাড়ি নিয়ে যাও।

আমরা রওনা হলাম। ভুলটি করলাম এখানে যে, সংবাদ অফিসে ফোন করে মেয়েটির অবস্থান সহজে জেনে নেয়া যেত। কিন্তু আমরা তা করিনি। ফিচারে লেখা ছিল শ্যামলীর আদাবর বস্তির মেয়ে। কিন্তু আদাবরে যে এত বস্তি আমাদের ধারণা ছিল না।

আমরা মেয়েটিকে খুঁজতে শুরু করলাম। খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতো। এক বস্তিতে যেয়ে খবর মিলল, পাশের বস্তিতে একটি মেয়ে এসএসসি পাশ করেছে। পত্রিকায় তার ছবি এসেছে আজ। আমরা হাতে চাঁদ পেলাম।

আমরা বস্তির লোকদের নির্দেশনা অনুযায়ী পাশের বস্তিতে গেলাম। এসময় আদাবর বড় রাস্তাটি তৈরি হচ্ছে। দেখলাম রাস্তার পাশে ঐ নিচুতে কতগুলো ছাউনি-দেয়া ঘর। ওখানে অনেক ধোঁয়া উড়িয়ে এক মেয়ে জবুথবু হয়ে বসে রান্না করছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটির কথা। ঘাড় উঁচু করে শুনল সে। ওই অবস্থায় বসে বসেই জিজ্ঞেস করল, কী দরকার তাকে? আমরা বললাম, তার কলেজে পড়ার ব্যাপারে আমরা সাহায্য করতে চাই, জবুথবু অবস্থান ছেড়ে সে নড়েচড়ে উঠল। কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। বরং মুখটি গুঁজে নিল নিজের বুকের কাছে। ওখান থেকে সঙ্কুচিত গলা শোনা গেল, আমিই সেই মেয়ে। মেয়েটির নাম অবশ্য মনে পড়ছে না এ মুহূর্তে।

আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম তার শতছিন্ন কাপড়। এবার উঠে না দাঁড়ানোর কারণ বোঝা গেল। মন্টু ভাই বললেন, আচ্ছা তুমি

এখানেই থাক। আমরা আধাঘণ্টার মধ্যে আসছি। তিনি আমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। আমি অবাক । কী ব্যাপার মন্টু ভাই? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি! মন্টু ভাই বলেন, চল আগে ওর জন্য কাপড়-চোপড় কিছু কিনে আনি। সঙ্গে টাকা আছে তো তোমার? আমি মাথা নাড়লাম। আমরা কাছের বাজার থেকে কোনোরকম সস্তায় এক সেট জামাকাপড় কিনে এনে মেয়েটিকে দিলাম। মেয়েটির চোখে পানি টলমল করে উঠল। সে ওগুলো নিয়ে চেঞ্জ করে আমাদের সামনে এল। ততক্ষণে আমাদের আশেপাশে ভিড় জমে গেছে। মন্টু ভাই'র সাদা চুল-এর কারণে কেউ সাহস করে কিছু বলছিল না। কিন্তু তাদের দুচোখে কৌতূহল ছাপিয়ে দেখা যাচ্ছিল সন্দেহের ঝিলিক। মেয়েটিকে বললাম, তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে। তোমার মা-বাবা কোথায়? মেয়েটি জানায় মা বাসায় কাজে গেছে। বিকেলে ফিরবে। আর বাবা তো নেই।

আমরা বলি, ভাই-বোন? একটি ছেলে ১৪-১৫ বছরের, দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের পাশেই। এগিয়ে এসে বলল, আমি ওর ছোট ভাই। ক্লাস এইটে পড়ি। আমাকে বলেন।

আমরা এতেই স্বস্তি পেলাম। ওকে বুঝিয়ে জোরে জোরেই বললাম আমাদের উদ্দেশ্য। মেয়েটি ইডেন কলেজে পড়তে চায়, হোস্টেলে থেকে। এই পরিবেশে পড়ার মতো পরিবেশ নেই। আমরা সব ব্যবস্থা করব। তাই ওকে নিতে এসেছি, কী কী দরকার আলাপ করব বলে। ছেলেটিকে বলি, তোমার বোনের সঙ্গে চল। উপস্থিত জনতা সহজ হয়ে যায়। তারা সমস্বরে সায় দেয়-হ্যাঁ,তুই তোর বোনের সঙ্গে যা। ছোট হোক, শত হলেও ছেলে তো! বড় বোনের ক্ষুদে গার্ডিয়ান আর কি।

আমরা ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিই। অফিসে যখন পৌঁছাই তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়া হয়নি আমাদের। আমাদের চেম্বারে মেয়েটি এবং তার ভাইকে বসিয়ে রেখে সাফাত সাহেবকে রিপোর্ট করি আদ্যোপান্ত। তিনি ওদের খাবার ব্যবস্থা করতে বলেন। খাবার পরে আবার ডাক । আমি আর মন্টু ভাই এমডি সাহেবের সামনে বসা। আমাদের কী করতে হবে তখন নির্দেশ দেন তিনি । সেই সঙ্গে কয়েক হাজার টাকা বাড়িয়ে দেন।

আমি বলি, স্যার মেয়েটিকে ডেকে আনি? আপনি একটু কথা বলেন। উনি না না করে উঠলেন, বললেন, ওকে আমার কাছে আনবে না। যা করার তোমরাই করো। আমি আর মন্টু ভাই মিলে লিস্ট করলাম; কী কী লাগবে এখন; কী লাগবে ভবিষ্যতে। ইতোমধ্যে আমাদের একাউন্ট চীফ আসলেন মেয়েটিকে দেখতে। আমার মাথায় কী খেলে গেল, আমি বললাম, স্যার মেয়েটিকে তো এমডি স্যার পড়াবেন। আপনি এই ছেলেটির ভার নেন। ভালো কাজও মানুষকে প্রভাবিত করে। তিনি রাজি হয়ে গেলেন ছেলেটির ভার নিতে। উল্লেখ্য এই একাউন্ট চীফ বর্তমানে প্রগ্রেসিভ লাইফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ. করিম।

মেয়েটিকে সময়মতো ইডেন কলেজে ভর্তি করা হল। লেপ-তোষক-বালিশ, বই-খাতা-পেন্সিল, জামা-কাপড় স-অ-ব আমি কিনে দিলাম। ওরা দু'জন ভাই-বোন

আসত, আমি দু'জনের মাসিক খরচ দুই দাতার কাছ থেকে তুলে দিতাম। যথারীতি সে প্রথম বিভাগে পাশ করল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির শখ ওর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সিলেক্ট হল না। জাহাঙ্গীরনগরে চান্স পেল। আবার বই-খাতা-পেন্সিল, থাকা-খাওয়া, হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হল। সাফাত সাহেব বলেছিলেন, পাশ করে বের হলে ডেলটা লাইফে চাকরি দেবেন মেয়েটিকে। ছেলেটিও ব্রিলিয়ান্ট ছিল, কলেজে পড়ছিল।

মেয়েটি পড়তে পড়তে তার বিয়ে হয়ে যায়। এরপর তার আর খবর জানতাম না। অনেকদিন পর যখন আমি প্রাইম ব্যাংকে তখন ঠিক খুঁজতে খুঁজতে আমার কাছে সে হাজির হয়। সে সুখে আছে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করছে। বড় ভালো লাগল দেখে। বাচ্চারা একটু বড় হলে যে-কোনো কাজে ঢুকবে, এটাও জানাল।

যাওয়ার সময় আবেগে আমার পা ছুঁয়ে সালাম করল। ছলছল চোখে বলল, আপনি না হলে আমি এতদূর আসতে পারতাম না। আমি বলি, আমি তো শুধু মাধ্যম। সহযোগিতা তো করেছেন অন্য একজন। কিন্তু ও মাথা নাড়ে, বলে আপনিই সে ব্যক্তি। তখন বয়স কম ছিল, বুঝিনি। নিজেকে লুকানোর জন্য আপনি নিজে নিজেকে আমার কাছ থেকে আড়াল করছেন।

আমি তাকে সত্য ঘটনা কী সেটা বোঝাই । সে বলে বেশ, তার নাম বলুন। আমি নাম বলতে পারি না। নিষেধাজ্ঞার কথা মনে পড়ে। সে তখন মৃদু হাসে। বলে, আমি আপনাকেই দেবতা জানি। আমি স্তম্ভিত! কিন্তু লা-জওয়াব।

সাফাত সাহেবের আরেকটি কীর্তি না বলে পারছি না। সিলেটের ছাতকছড়ার 'নূরজাহান'-এর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে সবার। তাকে গ্রাম্য শালিশে দের্রাা মারা হয়েছিল প্রকাশ্যে। এ অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে নূরজাহান। এ-সময় বাংলাদেশের বিবেকবান সব মানুষ সরব সোচ্চার ছিল প্রতিবাদে।

এ ঘটনাটি খুব গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল সাফাত সাহেবকেও। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, কী করা যায়? আমি চুপ। বুঝলাম কিছু একটা ঘুরছে মাথায়। অপেক্ষা করছি। তিনি বললেন, শোন নূরজাহানের বাড়ির ঠিকানা বের কর। তার বাবা বা ভাইকে খবর দাও। তথাস্তু। হুকুমমতো কাজ হল। নূরজাহানের বাবার বয়স তখন ৬০-এর উপরে। নড়বড়ে স্বাস্থ্য। সাফাত সাহেব স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলেন নূরজাহানের বাবার দিকে। ধীরে ধীরে তার স্বাস্থ্যের খবর, পারিবারিক খবর, অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বললেন।

আমি বললাম, ওনার ছেলে এসেছে সাথে। ডেকে আনব? তিনি মাথা নাড়লেন, দরকার নেই। এরপর একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা প্রতিমাসে আজীবনের জন্য বরাদ্দ হল নূরজাহানের পিতার নামে। নূরজাহানের ভাইটি যেহেতু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নয় তাই তাকে চাকরি দেয়া সম্ভব হয়নি, তাকে কয়েকটা ছাগল কেনার টাকা দেয়া হল।

আর গণসচেতনতার জন্য 'নূরজাহান স্মৃতি পুরস্কার' নামে একটি পুরস্কার প্রবর্তন করলেন ডেলটা লাইফ থেকে। যেসব সাংবাদিক নারী-নির্যাতন রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে তাদের লেখনীর মাধ্যমে– তারা এই পুরস্কার পাবে। আমার মনে

আছে, প্রথমবার পুরস্কারটি পেয়েছিলেন 'বাংলাবাজার পত্রিকা'র রিপোর্টার ফজলুল বারী। তিনি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া আছেন। এই পুরস্কারটি তৎকালীন সময়ে নারী-নির্যাতন রোধে সহায়ক শক্তি হিসেবে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল।

সাফাত সাহেবের এ ধরনের প্রতিটি কাজের সাথে যুক্ত হয়ে আমি সমাজের অনেক ক্ষয়িষ্ণু ইতিবৃত্ত জেনেছি। আমার মধ্যে তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখনো কাজ করে।

একবার 'জনকণ্ঠ'র ফিচার সাংবাদিক শুভ রহমান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভারতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছিল তিনি খুব আর্থিক সংকটে আছেন। রিপোর্টটি পড়ে আমি সাফাত সাহেবকে কিছু করার অনুরোধ জানাই। তিনি একবাক্যে রাজি হয়ে যান। আমি চেকটি 'জনকণ্ঠে' পৌঁছে দেই শুভ ভাই-এর পরিবারকে দেয়ার জন্য। সুস্থ হয়ে ঢাকায় ফিরে বিস্মিত শুভ ভাই কতবার যে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তার হিসেব রাখা সম্ভব হয়নি।

কর্মজীবনে তিনি আমাদের শুধু অভিভাবক ছিলেন না, পিতার মতো মনও ছিল তাঁর। ডেলটায় অসংখ্য মহিলা কর্মকর্তা ছিলেন, আগেই বলেছি। কিন্তু অফিসের ট্রান্সপোর্ট না থাকায় স্বল্প আয়ের কর্মীদের সবারই খুব কষ্ট হত। সবাই মিলে ঠিক করলাম অফিসের 'বাস'-এর কথা এমডি সাহেবকে বলতেই হবে। কিন্তু কে বলবে? কিভাবে বলা হবে? সাত-পাঁচ করতে করতে বলা আর হয় না।

বার্ষিক পিকনিকে অনেক গান-বাজনা হয়। সবাই জানে। আমার মাথায় খেলে গেল , একটা গান করা যাক, প্যারোডি– যাতে এসব দুঃখ-কষ্ট তুলে ধরা হবে। আমি লিখলাম 'শুনেন শুনেন এমডি সাহেব, শুনেন সুধী সবজনা, শুনেন বলি নতুন করে পুরাণ ঘটনা'–এর মধ্যে যাতায়াতের সমস্যা, অর্থকষ্ট সবই সবিস্তারে ছিল। যথারীতি পিকনিকে আমরা এই প্যারোডি পরিবেশন করলাম সব ছেলে-মেয়ে মিলে।

পরদিন সকালে অফিসে গিয়ে দেখি চীফ একাউন্টেন্ট ইভিপি করিম সাহেব। আমাকে দেখেই বললেন, গানের কপি দেন তাড়াতাড়ি। আমি তো হতবাক। তিনি বলেন, সক্কালবেলাতেই চেয়ারম্যান সাহেব (কাজী ফজলুর রহমান, পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সচিব এবং পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা) এসে বসে আছেন এমডি সাহেবের আমন্ত্রণে। কী গান করেছেন দেন তাড়াতাড়ি, ওনারা চাইছেন।

দিলাম। তটস্থ হয়ে বসে আছি। না জানি কী শাস্তি আছে কপালে! কেন যে এসব লিখতে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে খবর এল ডেলটা লাইফ এবং গ্রীন ডেলটা মিলে ৪টি বাস নামাবে সামনের মাস থেকে। শুনে কী যে ভালো লাগল!

মনে পড়ে, একদিন বিকেলের দিকে ইডেন কলেজের বেশ কিছু ছাত্রী আমার চেম্বারে আসে বার্ষিক ম্যাগাজিন ছাপানোর জন্য আবেদনপত্র নিয়ে। আমি কথা দেই বিজ্ঞাপন পাইয়ে দেয়ার। মেয়েদের মধ্যে একজন, নামটি ডালিয়া, আমাকে বলল, ম্যাডাম আপনার সাথে একটি কথা বলতে চাই। বললাম– হ্যাঁ, বলো। সে জানায়

তারা ৮ বোন। বাবা স্কুলশিক্ষক। দুটো বোনের বিয়ে হয়েছে। বাকীরা পড়ছে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর প্রত্যেকে টিউশনি করে পড়া-লেখা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন ওর পড়া শেষ, হোস্টেলে থাকা তাই আর সম্ভব নয়। একটি চাকরি খুবই দরকার। ডালিয়া ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে থাকার জায়গা না পেয়ে ইডেনে বিএ শ্রেণীতে ভর্তি হয় হোস্টেলে থাকার জন্য। আশা ছিল এর মধ্যে চাকরি হবে। কিন্তু বিএ পরীক্ষাও হয়ে যাচ্ছে। চাকরি হয়নি। এখন কী করবে সে? ঢাকা শহরের অসংখ্য মেয়ের এরকম সমস্যা তো রয়েছেই।

তবু আমি শুনে বলি, দেখি কী করতে পারি। তোমার বায়োডাটা দিয়ে যেও। নরমালটাই দেবে, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডাটা এখানে কাজে লাগবে না। পরদিন ডালিয়া তার কাগজপত্র, সার্টিফিকেট জমা দিয়ে গেল। আমি সাফাত সাহেবের চেম্বারে গিয়ে বললাম, স্যার আজ একটি মেয়ে এসেছিল, সে ইডেন কলেজে পড়ে। সে কোথায় যেন শুনেছে আপনার মতো দয়ালু, ভালো মানুষ আর এই পৃথিবীতে নেই। তাই আপনার কাছে একটি চাকরি প্রার্থনা করছে। তার পারিবারিক অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললাম, মেয়েটি আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, থাক থাক দেখা করতে হবে না। বায়োডাটা দেখি? তিনি বায়োডাটা হাতে নিয়ে দেখলেন। ফোন করলেন আইটিতে। আইটি চীফ এলে তার হাতে বায়োডাটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ইমিডিয়েট এ্যাকশন চাই। আমি থ।

আমার এক মিথ্যা কথায় এতবড়ো ম্যাজিক! নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। ডালিয়ার যথারীতি চাকরি হল। ডেলটার আইটি-তে বছর পাঁচেক কাজ করার পর যুব মন্ত্রণালয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার চাকরি হয়। এখনো সে ওখানেই আছে।

এরকম আরো অসংখ্য ছোট-খাট মিথ্যা দিয়ে আমি সাফাত সাহেবের কাছ থেকে অনেকের জন্য বেনিফিট করিয়ে দিয়েছি। তিনি হয়তো বুঝতেন, কিছু মিথ্যের মিশেল আছে তবুও এর আলটিমেট গোল (লক্ষ্য) যখন অন্যের জন্য ভালো কিছু করা– তাই হয়তো তিনি এসব ঘাটাতেন না। বরং খুশিই হতেন।

আমি, ৯৯ সালে প্রাইম ব্যাংকে যোগ দিই। ব্যাংকে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন থাকায় ডেলটা লাইফের মতো এখানে আমি চাকরিতে কাউকে সাহায্য করতে না পারলেও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। কতরকম যে মহিলা আছে; নির্যাতিতা, স্বামী-পরিত্যক্তা, তালাকপ্রাপ্তা... হাজারো সমস্যা এদের। যতখানি পারি এদের– সে যে পত্রিকাই হোক কিছু না কিছু দিতে চেষ্টা করি। আমার এখন যিনি এমডি এম. শাহজাহান ভূঁইয়া, তাঁর হৃদয়টাও বিশাল সমুদ্রের মতো। তিনি অন্তরেও খুব সংবেদনশীল। সাধারণত এসব মেয়েরা কোনো প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় কাজ করে না। অনামী, অখ্যাত অথবা মফস্বলের পত্রিকাগুলো থেকে তারা বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি হয়ে আসে। এদের অধিকাংশই অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত। নিয়ম অনুযায়ী এদের বিজ্ঞাপন পাওয়ার কথা নয়। তবু আমি এমডি সাহেবকে অনুরোধ করি, কখনো বলি

সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা, কখনো বলি ইয়েলো জার্নালিজমের কথা। কখনো-বা শুধুই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা। উনি হাসেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়ে দেন। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ আমার এমডি'র প্রতি।

সেজন্য গোড়াতেই বলেছিলাম, কখনো মিথ্যা বলে, কখনো সত্যি-মিথ্যের মিশেল দিয়ে এই যে কাজগুলো করি তার আলটিমেট গোল হল সমাজের কিছু লোকের ভালো করা। এই মিথ্যের জন্য আমার যে কবিরা গুনাহ্ বা সগিরা গুনাহ্ হচ্ছে তার জন্য আমি প্রতিদিন খাস দিলে ক্ষমা চাই আল্লাহর কাছে। আবার পরদিন সেই গুনাহ্ই করি। জানিনা পরকালে আমার জন্য কী নির্ধারিত আছে।

আমি ফিল্যানথ্রপি বুঝি না, তত্ত্বের কচকচানি আমার ভালো লাগে না। তবে আমি অন্যের দুঃখের খানিকটা লাঘব করতে চাই যখন যে অবস্থায় থাকি যখন যেভাবে সম্ভব। এবং চেষ্টা করি খানিকটা হলেও সুখ অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে।

প্র ব ন্ধ

ফিল্যানথ্রপি: লোকসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রভাবনা

মা সু দু ল হ ক

লোকহিত বা লোকহিতৈষণা বলতে এমন এক জীবনধারাকে বুঝি, যা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সুনির্দিষ্টভাবে পালন করেও মানবসেবায় আত্ম-নিয়োগ করে। এ-প্রসঙ্গে সবার আগে ধর্ম বিষয়টি চলে আসে; সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীর বদ্ধমূল ধারণা, তার ধর্ম ঐশী ইচ্ছায় জাত এবং তার সকল কর্মের জন্যে সে ঈশ্বরের কাছে দায়ী, তার ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের ফল শাস্তি বা পুরস্কার লাভের অধিকারী। এ-জাতীয় ধারণা-বিশ্বাস প্রধানত কয়েকটি বড় ধর্মের কাঠামোর মধ্যে আছে; সেগুলো হল ইহুদি, খ্রিস্ট, হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ আর বর্তমান পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ এইসব ধর্মের অনুসারী।

অবশ্যি এর অর্থ এই নয় যে, বাকি সব মানুষই ধর্মহীন। ধর্মের উপরিউক্ত ধারণার বিচারে পৃথিবীতে ধর্মহীন কিছু মানুষও অবশ্য রয়েছে। কিন্তু তাদের বাইরেও আছে বহু মানুষ, যারা ধর্মহীন নয়। তারা উল্লিখিত ধর্মগুলোর অংশত অনুসারীও নয়। বরং তারা ভিন্ন কোনো ধর্মের অনুসারী– যেসব ধর্ম স্থানীয় কিংবা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা উপজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ধর্ম আমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত।

আমাদের পরিচিত গণ্ডীর বাইরের এই ধর্মগুলোকে আমরা বলি লৌকিক ধর্ম। এ-ধর্ম লোকসংস্কৃতির এক বড় অঙ্গ। আবার এই লোকধর্ম ও অভিজাত ধর্মের বহু মানুষ এবং ধর্মহীন মানুষের মধ্য থেকে কিছু মানুষ লোকসেবায় নিয়োজিত। এরা লোকসেবাকেই জীবনের ব্রত ধরে নিয়ে এক স্বতন্ত্র্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন, লোকসেবার এক সংস্কৃতি নির্মাণ করেছেন। এ দিক থেকে লোকহিতৈষণা লোকসংস্কৃতির একটি অংশ। লোকহিতৈষণা কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Philanthropy'। এই 'Philanthropy' টার্মটি এসেছে গ্রিক 'Philanthropia' থেকে। 'Philanthropia' কথাটি গ্রিক শব্দ 'Philos' এবং anthropos-এর মিলিত রূপ। গ্রিক 'Philos' শব্দটির মানে হচ্ছে 'Loving'; এবং anthropos শব্দটির মানে হচ্ছে 'a man'। তাহলে শব্দগত অর্থ দাঁড়াচ্ছে– Love of mankind। বাংলায় যাকে লোকহিতৈষণা বলে অভিহিত করা যায়।

দুই

প্রসঙ্গ: লোকহিতৈষণামূলক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস

লোকমানুষ বা গণমানুষের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আইনি ও সামাজিক সহায়তামূলক প্রতিষ্ঠান প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। লোকহিতৈষী প্রতিষ্ঠান প্রথমে দেখা যায় প্রাচীন মিশর, গ্রিক আর রোমে। সেখানে শিক্ষা, স্বাধীনতা ও সাম্যের চেতনা লক্ষণীয়।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় লোকহিতৈষী প্রতিষ্ঠানে সন্ন্যাসীদের মঠ, দরিদ্রাবাস, অনাথ আশ্রম এবং বিদ্যালয় থাকত। রেনেসাঁ সময়কালেও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। সেখানে দরিদ্রসেবা ও শিক্ষা প্রদান করা হত। মধ্যযুগে এমনি কতগুলো ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেগুলো বড় বড় কোনো উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হত। ঊনবিংশ শতাব্দী অর্থাৎ ১৮৪৬ সালে আমেরিকাতে এমন একটি লোকহিতৈষী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যার নাম 'Smithsonian institution'. যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী ঔধসবং ঝসরঃযংড়হ . যার মূল উদ্দেশ্য ছিল 'সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটানো'।

১৮৬৭ সালে আমেরিকাতে 'Peabody Fund' গড়ে তোলা হয়েছিল শিক্ষা-কার্যক্রম প্রসারের জন্যে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন George peobody. এভাবে আমেরিকাতে লোকহিতৈষী নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে বিশ্বমানবতার সেবায়।

এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উল্লেখযোগ্য উদ্যোক্তা হচ্ছেন−Andrew Carnegie এবং John D. Rockefeller. যাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্থক কার্যক্রমের কারণে পরবর্তীকালে কানাডা এবং ইংল্যান্ডে আরো বেশকিছু লোকহিতৈষী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তার পরে আমেরিকাতে এই ধরনের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য Ford Foundation (১৯৩৬)। এ-ছাড়াও বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লোকহিতৈষী প্রতিষ্ঠান হচেছ: Russell Sage Foundation (১৯০৭); The Commonwealth Fund (১৯১৮); Twentieth Century Fund, Inc. (১৯১৯); The Duke Endowment (১৯২৪); John Simon Cuggenheim Memorial Foundation (১৯২৫); Danforth Foundation (১৯২৭); W.K. Kellogg Foundation (১৯৩০); Alfred P. Sloan Foundation (১৯৩৪); Lilly Endowment, Inc-(১৯৩৭); John A. Hartford Foundation (১৯৪২);।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জার্মানিতে 'Philanthropinum' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। যে স্কুলটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্যে মানবপ্রেম জাগিয়ে তোলা এবং গোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা। এই প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র এবং ধনী ছেলেমেয়েদের একত্রে ধর্ম ক্লাশ নেয়া হত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিক্ষাবিদ Johann Bernhard Basedow. তার প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন দার্শনিক Kant, Lessing এবং Moses Mendelssohn. Basedow শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রয়োগমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তিনি ধ্রুপদীভাষাকে কথোপকথন ও খেলার মাধ্যমে প্রয়োগ করে শিক্ষায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন ঘটান। এই পদ্ধতিতে ইতিহাস, শরীরবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এমনকি কাঠের কাজ, সাঁতার, বিভিন্ন রকম খেলাধূলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শিক্ষা-পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকহিতৈষী চেতনা গড়ে তোলা। এই স্কুলটি শেষ পর্যন্ত লোকহিতৈষী আন্দোলনে পরিণত হয়।

তিন.

লোকসাহিত্য ও লোকহিতৈষীমূলক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইউরোপীয় লোকহিতৈষণার সঙ্গে আমাদের লোকহিতৈষণার ভাবগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণ ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূগোল, রুচি আর অর্থনৈতিক কাঠামো। আমাদের লোকহিতৈষীমূলক চেতনাকে স্পষ্ট করবার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের লোকহিতৈষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। কেননা দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি লোকহিতৈষণার মূল্যায়ন করেছেন। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থের 'লোকহিত' প্রবন্ধে লেখেন:

'আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব, সে জানায়, তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের

নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি ঝোঁকে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকহিতৈষী চিন্তার পাশাপাশি একই প্রবন্ধে লোকমানুষের মধ্যে বিদ্যমান লোকসাহিত্যের চরিত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন: 'সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতর অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, এইসব সাধারণ লোকের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতালার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা অর্থাৎ ইহাতে ভালোমন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিস আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো– জগতের কোনো রসিকসভায় তাহার বিন্দুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রিধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা-কিছু রচিয়াছেন। যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড়ো আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।'

লোকসংস্কৃতি নির্ভর লোকসমাজের লোকহিতৈষণার জন্যে রবীন্দ্রনাথ পথের দিশা দিয়েছেন এই 'লোকহিত' প্রবন্ধে। তিনি আরও লেখেন:

'আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতিসহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলেই চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোক-সাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে

বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদের আহত করি। নিজেদেরও হিত করি না।'

হিত করিবার একটি মাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না-করা। রবীন্দ্রনাথ প্রীতির সঙ্গে লোকমানুষের কল্যাণ বিধানের জন্যে শিক্ষার প্রতিও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন: 'আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এই জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিশ তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়োজোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্তব্য করো, মহাজনকে বলি তোমার সুদ কমাও, পুলিশকে বলি তুমি অন্যায় করিয়ো না– এমন করিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কতদিন ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও– সে হয় না; তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি। অতএব সর্ব-প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটি যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই। লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞানশিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাষাভুষারা যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় জ্ঞান-শিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চশিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে– সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত। আমি কিন্তু সবচেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি, কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে তাহা কেবলমাত্র রাস্তা–সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্য-যোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পারি, তাহার আঙিনায় হরিনামসংকীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে কিন্তু একথা তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে, সে একা নহে, তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে, একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ। দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অনুভবশক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।'

লোকমানুষের লোকহিতের জন্যে শিক্ষার প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেছেন; কিন্তু তিনি আরো জানান, 'দয়া করে নাইট স্কুল খুলে তাদের প্রতি দায়সারা কাজ

করলে লোকহিতৈষী কাজ সম্পন্ন করা যায় না। এই জন্যে প্রয়োজন লোকমানুষকে লোক হিসেবে নিশ্চিত করা এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিশ্চিত ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।' তিনি লেখেন:

'লোকহিতৈষীরা বলিবেন, আমরা তো সেই কাজেই লাগিয়াছি– আমরা তো নাইট স্কুল খুলিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি– সেটা আমাদিগকে দান করা অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এই জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো খর্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবি করি। সেই দাবি ঠিক গায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্মের জোরের কিন্তু লোকসাধারণেরও সেই জোরের দাবি আছে; যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি একথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোকসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা। কিন্তু সমস্যাটা এই যে দয়া করিয়া গণ্য করাটা টেকে না। তাহারা শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেইদিনই সমস্যার মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে তাহাদের নাই তাহার কারণ তাহারা অজ্ঞতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মতো হইবে।'

রবীন্দ্রনাথ প্রচল ধারার লোকহিতৈষীদের প্রতি কোনো আস্থা পোষণ করেননি, তাঁর বিশ্বাস লোকমানুষকে প্রকৃতপক্ষে লোক বা মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে রাষ্ট্রব্যবস্থাই পারে 'লোকহিত' সাধন করতে। তিনি আরো মনে করতেন অভিজাত স্তরে থেকে নিচের স্তরের প্রকৃত হিত-সাধন সম্ভব নয়। তবে লোকমানুষের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃতিচর্চার মধ্য থেকে যে লোকহিতৈষণার জন্ম নেয় তার প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিলেন তিনি।

চার

লোকসংস্কৃতি চর্চায় লোকহিতৈষণা

লোকসম্প্রদায়, ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস ও আচার-আচরণ, জীবন-যাপন প্রণালী, চিত্তবিনোদনের উপায় ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি। এটা সম্পূর্ণই তাদের নিজস্ব সম্পদ। এটা তারা লালন, পালন ও চর্চা করে থাকেন। এই চর্চার মধ্যে লোকহিতৈষণামূলক চেতনা গভীর বন্ধনে আবদ্ধ।

যেমন, লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। মূলত এটি একটি মানসিক ব্যাপার। মানুষের মানসিক দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা, শুভাশুভ বোধ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ইত্যাদি থেকে এর উদ্ভব। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে ব্যক্তিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আমাদের এই লোকবিশ্বাস ও সংস্কারে আবহমানকাল ধরেই লোকহিতৈষণামূলক চেতনা ক্রিয়াশীল। যেমন, আদিম স্তরের মানুষ শিকার করতে গিয়ে বহিরাগত শক্তিকে আয়ত্তে আনার প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রজাল উদ্ভাবন করে। পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানীদের মতে ইন্দ্রজাল আদিম ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত। ধর্ম মানবসমাজের বহুত্ববাদ থেকে শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদে রূপ নেয়। ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাস ধর্মের আবির্ভাবের পরে তার মধ্যে অলৌকিকতার মোড়কে টিকে যায় এবং তার বাইরেও অনুকরণমূলক ও সংক্রামক ইন্দ্রজাল হিসেবে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। মানুষের গোষ্ঠীগত অর্থাৎ পরিবারভিত্তিক রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধনযুক্ত যে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তাকে নৃবিজ্ঞানীরা টোটেম নামে অভিহিত করেছেন। শিকার স্তরে এর উদ্ভব এবং প্রধানত বিভিন্ন পশুর নামে একেকটি গোষ্ঠী নামাঙ্কিত হত। প্রাথমিক পর্যায়ে টোটেম পশু ছিল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর জীবনধারণের একমাত্র উপায়। পরবর্তীকালে বিকল্প খাদ্যের সংস্থান নিশ্চিত হলে টোটেমটি ওই গোষ্ঠীর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তখন টোটেম হয়ে ওঠে তাদের পূর্বপুরুষ এবং স্ব-গোষ্ঠীর এক অত্যন্ত আপনজন ও কল্যাণকামী। এর ফলে টোটেম গোষ্ঠীতে দুটি ক্ষেত্রে ট্যাবু বা বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। অভিন্ন টোটেম নামাঙ্কিত গোষ্ঠীতে টোটেম পশু আহত, হত্যা এবং ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। একই টোটেম গোষ্ঠীতে সমপর্যায়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহ এবং যৌনসম্পর্কও নিষেধের আওতায় পড়ে। প্রাচীন এই লোকবিশ্বাসের মধ্যে আমরা লোকহিতৈষণার বীজমন্ত্র লক্ষ্য করি। মানবপ্রজাতির অভিন্ন কল্যাণকামনা ও মানবিক চেতনার বিকাশে এই লোকহিতমূলক প্রচেষ্টাটি সভ্যতার ক্রমবিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। লক্ষণীয় লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে লোকহিতৈষণামূলক চেতনা সংযুক্ত হয়ে আমাদের বিভিন্ন লোকউৎসবগুলো লোকসমাজের ইহজাগতিক সুবিধা লাভের উপায় হয়ে উঠেছে। যেমন, অম্বুবাচী। এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশেষ লোকউৎসব। আষাঢ় মাসের সাত তারিখ থেকে তিনদিন এটি পালিত হয়। এ সময় হিন্দু মহিলারা নানা ধরনের ক্রিয়াচার পালন করে। তাদের বিশ্বাস, এ তিনদিন আকাশ ও পৃথিবীর মিলন হয় এবং এতে ধরিত্রী সিক্ত হয়ে কৃষিকাজের উপযোগী হয়। এ সময় মাটি খোঁড়া, হল চালনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। উৎসবটি যদিও সংস্কার ও বিশ্বাসনির্ভর তবু এখানে লোকহিতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

গাশ্বি উৎসব হৈমন্তিক ধানের শীষে দুধসঞ্চয়নমূলক একটি অনুষ্ঠান। আশ্বিনের শেষ রাত থেকে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। ফসল যাতে ভালো হয় সে উদ্দেশ্যে পরের দিন পয়লা কার্তিক প্রত্যুষে কাঁচা হলুদ এবং শুন্দি একত্রে বেটে সরিষার তেলসহ ধানগাছে মাখিয়ে দেওয়া হয়। নীরোগ স্বাস্থ্যের জন্য লোকেরা এ রাতে তেলকুচার পাতা, আমগুরুজের লতা, হলদি, পান ইত্যদি বেটে গায়ে মেখে স্নান করে। এ অনুষ্ঠানে তারা আশ্বিনের শেষদিন রান্না করে এবং পরের দিন খায়। তাই জনশ্রুতি আছে, 'আশ্বিনে রান্ধে-বাড়ে, কার্তিকে খায়। যে যেই বর মাগে সেই বর পায়। 'এই গাশ্বি উৎসব যদিও

ফসল সংক্রান্ত কিন্তু এর পেছনকার দার্শনিক ভিতটি হচ্ছে সামগ্রিক লোকমানুষের হিত সাধনের জন্যে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা আর সুস্বাস্থ্য কামনা।

কৃষিসংক্রান্ত একটি বিশেষ লোকউৎসব বৃষ্টি-আবাহন। যথাসময়ে বৃষ্টি না হলে কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে সমাজে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে নানা ধরনের ক্রিয়াচার পালন করা হয়। সেসবের মধ্যে ব্যাঙ বিয়ে, বদনা বিয়ে, মেঘারানী, হুদমাদেও সম্পর্কিত বৃষ্টি-আবাহন অনুষ্ঠান এবং পুণ্যিপুকুর ব্রত ও বসুধারা ব্রত উল্লেখযোগ্য। এই ব্রত আর উৎসবগুলোর মধ্যে লোকমানুষের হিতসাধনের প্রবল প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের লোকসংস্কৃতিতে বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে লোকসঙ্গীত প্রচলিত রয়েছে। সাধারণ পল্লীর অনক্ষর জনগণ এর প্রধান ধারক। বাংলার লোকসঙ্গীত নাম ও প্রকারভেদে বিচিত্র; অঞ্চলভেদে এর প্রায় শতাধিক নাম রয়েছে এবং প্রকারভেদে প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব শ্রেণীর গান চিহ্নিত করা যায়। কেউ কেউ আঞ্চলিক বা সর্বাঞ্চলীয়, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, সাধারণ ও তত্ত্বপ্রধান, তালযুক্ত ও তালহীন এরূপ স্থূলভাবে ভাগ করে সেগুলোর আবার নানা উপভাগ করেছেন। এই গানগুলোতে নর-নারীর প্রেম অবলম্বন করে রচিত পার্থিব প্রেম এবং তত্ত্বভক্তিমূলক গানে অপার্থিব প্রেম প্রকাশিত। আবার ধর্ম-সংস্কার-আচার-ব্যবহারমূলক বিচিত্র লোকসঙ্গীতও প্রচলিত রয়েছে। লক্ষণীয় এইসব গানগুলোতে সব চেতনার উর্ধ্বে লোকহিতৈষীমূলক চেতনা গভীরভাবে প্রতিফলিত। যেমন– 'আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই' গানে বৃষ্টির জন্য স্রষ্টার নিকট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে জাতির চিরন্তন লোকহিতৈষণার স্বরূপ প্রকাশিত।

হিন্দুসমাজে দেবদেবীর উদ্দেশে ব্রতের গানে যেমন লোকহিতৈষীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত, তেমনি মুসলমান সমাজেও পীর-পীরানির উদ্দেশে গাওয়া গানগুলোতেও লোকহিতৈষীমূলক চেতনার উল্লেখ লক্ষণীয়। যেমন গাজী পীর, মাদার পীর, খোয়াজ-খিজির, মানিকপীর, সোনাপীর ও বদরপীর লোকদৃষ্টিতে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তারা সন্তানহীনাকে সন্তান দান, রোগব্যাধি দূরীকরণ, ধনসম্পদ দান এবং গরু-বাছুর রক্ষা করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হয়। মূলত এসব গান লোকমানুষের ধর্মচিন্তার সঙ্গে বৈষয়িক চেতনা ও কল্যাণবৃদ্ধির লোকহিতের প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। কবিগানে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক কাহিনী বা সমস্যাদি স্থান পায়। এই বিষয়গুলোর সঙ্গে সার্বিকভাবে লোকহিতের প্রেরণাটিও বাংলার লোককবিদের মানসে লক্ষণীয়। আবহমানকাল ধরে আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী এবং পৃথক পৃথক সামাজিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী লোকসম্প্রদায় নামে বিরাজমান। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান– এ চারটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাশাপাশি এরাও বহুকাল যাবৎ এদেশে বসবাস করে আসছে। হিন্দুরা পৌত্তলিকতার মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্বে, বৌদ্ধরা নির্বাণতত্ত্বে, মুসলমানরা তৌহিদবাদে এবং খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু বিভিন্ন লোকসম্প্রদায়ের ধর্মীয় মতামত, জীবনাচরণ ও সংস্কার-সংস্কৃতি তাদের থেকে

অনেকটাই ভিন্নধর্মী। মূল ধর্ম থেকেই এদের উদ্ভব, কিন্তু এরা শাস্ত্রের প্রতি অনুগত না থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ধ্যান-ধারণা পোষণ করে এবং সেভাবেই এদের জীবনধারা গড়ে ওঠে। এদের এই উদ্ভবের মূল চেতনাটি হচ্ছে লোকহিতৈষণা। লোকসম্প্রদায়গুলো একই সময়ে একই স্থানে জন্মলাভ করে নি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদ্ভূত হয়েছে। সম্প্রদায়গুলো প্রধানত উৎসভূমির মধ্যেই সীমিত থেকেছে এবং কোনো কোনো সম্প্রদায় কালের সীমা অতিক্রম করে আজও টিকে আছে। বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে কর্তাভজা, কিশোরী ভজন, জগোমোহিনী, ন্যাড়া, বলাহাড়ি, বাউল, মাতুয়া, সাহেবধনী প্রভৃতি লোকসম্প্রদায় রয়েছে। লোকহিতৈষীমূলক চেতনাকে কেন্দ্র করে এদের ধর্মমতে সাধন-ভজন, প্রেম-ভক্তি ও গুরুবাদের স্থান থাকায় অক্ষয়কুমার দত্ত এদের উপাসক বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার শাস্ত্রবর্জিত লোকায়ত ধ্যান-ধারণা, দর্শন ও আচরণবিধির প্রাধান্য থাকায় এদের লোকসম্প্রদায় বলেও অভিহিত করা হয়। যেমন, কর্তাভজা সম্প্রদায়। এদের আদিগুরু আউলচাঁদ। তার শিষ্য রামশরণ পাল (মৃত্যু:১৭৮৩) গুরুর আদর্শকে ভিত্তি করে কর্তাভজা সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। ভক্তের নিকট তিনি 'কর্তা' ও তার স্ত্রী সরস্বতী দেবী 'কর্তামা' নামে অভিহিত হন। রামশরণ পালের পর সরস্বতী দেবীই এ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেন। রামশরণের পুত্র দুলালচাঁদ (১৭৭৬-১৮৩৩) এ সম্প্রদায়কে সাংগঠনিক শক্তি দান করেন। তিনি বহু পদ রচনা করে কর্তাভজা ধর্মমতকে একটা তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। এই পদগুলোর মূল চেতনা হচ্ছে লোকহিত। কর্তাভজারা কোনো জাতিভেদ মানে না, তারা লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধকে নৈতিক পাপ বলে মনে করে। সৎপথে থেকে ও মিথ্যাকথা পরিহার করে নৈতিকভাবে ধর্মকর্ম করা তাদের প্রধান লক্ষ্য।

বাউল বাংলার লোকসম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও বহুল আলোচিত একটি সম্প্রদায়। প্রাচীনকাল থেকেই বাউল শব্দের প্রচলন থাকলেও সম্প্রদায় হিসেবে বাউলরা কখন থেকে স্বীকৃত হয় তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। চৈতন্যদেবের পার্ষদ নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র সহজিয়া মতের যে নেড়ানেড়ি দল গঠন করেন, তার রূপান্তরিত ধারার সঙ্গে মুসলমান ফকির শ্রেণীর মিলনে বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব বলে সাধারণ মত প্রচলিত আছে। বাউলশ্রেষ্ঠ লালনের পূর্বে বাউলদের অস্তিত্ব থাকলেও সম্প্রদায় হিসেবে তারা তখন আত্মপ্রকাশ করে নি। লালন কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় আস্তানা স্থাপন ও সাধন-ভজন করে, গান রচনা করে ও গেয়ে এবং শিষ্যদের দীক্ষা দিয়ে বাউলদের প্রথম সংগঠিত করে তোলেন। তার সময়ে শিষ্য ও ভক্ত মিলে প্রায় দুই লক্ষ বাউল ছিল বলে ধারণা করা হয়। সাধারণত কৃষক, তাঁতি ও যুগী শ্রেণীর দরিদ্র, বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানুষেরাই বাউল সম্প্রদায়ের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। তিনি তাদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে জমিদারের বিরোধিতা করেন এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে লাঠিয়াল দল গঠন করেন। এই চর্চার মূল প্রেরণাতেও লোকহিতৈষীমূলক চেতনা লক্ষণীয়। আমরা যা জার্মানে 'Philanthropinum' প্রতিষ্ঠানটিতে লক্ষ্য করেছি Johann Bernhard Basedow -এর দর্শনে। ঠিক একই ধারা লালনের মধ্যেও লক্ষণীয়।

বাউল ধর্মমতে গুরুবাদ ও দেহতত্ত্বের কথা আছে। গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে দেহবাদী আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় বলে বাউলরা বিশ্বাস করে। তারা গেরুয়া বসন পরে, চুল-দাড়ি কাটে না এবং ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করে। গান রচনা করা ও গান গাওয়া ধর্মসাধনার অঙ্গ বলেই তারা মনে করে। তারা জাত-পাতের বিচার করে না; গান গেয়ে মিলনের আহ্বান ও মানবপ্রেমের বাণী প্রচার করে। মানবদেহে ঈশ্বর বাস করেন, অতএব দেহকে জানলে ঈশ্বরকে জানা যায় এরূপ বিশ্বাস নিয়েই বাউলরা মানবদেহ ও মানবজীবনের মূল্যায়ন করে থাকে। গুরুকে সারবস্তু জেনে প্রেম-সাধনা ও যোগসাধনা উভয় পথেই তারা সত্য ও মুক্তির সন্ধান করে। উল্লেখ্য এই বাউল মতবাদের মূল দর্শনই হচ্ছে লোকহিতৈষণা।

পাঁচ
উপসংহার

মানবসমাজে লোকহিতৈষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাষ্ট্রের চরিত্রানুযায়ী কোথাও ধর্ম কোথাও নৈতিকতার আশ্রয়ে লোকহিতৈষণা সমাজে সত্য সুন্দর ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াশীল। ইউরোপে যেভাবে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লোকহিতৈষণা একটি সামাজিক ভিত্তি পেয়েছে আমাদের দেশে তেমনটি ঘটেনি। তাছাড়া পাশ্চাত্য দেশগুলোতে মানুষের সামাজিক স্তর একটি কাঠামোবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে বলেও লোকহিতমূলক কর্মে রাষ্ট্রসমাজ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে। যে-কারণে সে দেশের দর্শনচর্চায় ও রাষ্ট্রচর্চায় দার্শনিকেরা লোকহিতৈষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। আমাদের দেশে নানামাত্রিক সামাজিক স্তর-বিন্যাস থাকায় লোকহিতৈষণার দার্শনিক প্রেক্ষাপটটি সর্বস্তরে সমান দৃষ্টিভঙ্গিতে গৃহীত নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখি, তিনি শিক্ষিতশ্রেণীর লোকহিতৈষণার চেতনা দিয়ে লোকমানুষের লোকহিতৈষণার চেতনা মূল্যায়নে পক্ষপাতী নন। প্রসঙ্গটি অত্যন্ত যৌক্তিক। আমাদের দেশের রাষ্ট্রদর্শনে লোকহিতৈষণার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য নয় বলেই সামাজিক অন্য দশটি কর্মের সঙ্গে এর চর্চার তেমন প্রসারণ ঘটে নি। অধুনা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রবণতা অবশ্য লক্ষণীয়। তবে লোকসংস্কৃতি চর্চায় লোকহিতৈষণার বিষয়টি ঐতিহ্যগতভাবেই চলে এসেছে। এক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রের চেয়ে লোকসমাজ ও মানুষের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে লোকহিতৈষণার চর্চায় লোকসংস্কৃতির এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে বৈশিষ্টসম্পন্ন এবং গৌরবমণ্ডিত।

বি ভা নূ র   মু ন্সী

'রমেশের আর সহ্য হইতেছিল না, তথাপি সে প্রাণপন নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনীতভাবে বলিল, ভেবে দেখুন বড়দা আমাদের তিন ঘর দু'শ টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে, পাঁচ-সাত হাজার টাকা ওদের ক্ষতি হবেই'।

'দাসী কহিল, পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই দিদিমা, ছোট বাবু এমনি রাস্তা বাঁধিয়া দিয়েছেন যে সিঁদুর পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যাবে। ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। গরীব দুঃখী সাপের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেছে'।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পল্লীসমাজ' বইয়ে এভাবেই এদেশের সমাজের চিত্র এঁকেছেন। আমাদের প্রাচ্যদেশীয় যে সমাজ তার শাশ্বত রূপ এরকমই। প্রতিবাদ ও প্রতিকারের। আমরা এদেশীয় লোকেরা যে আমাদের হাজার বছরের গৌরব ঐতিহ্য বা ইতিহাস নিয়ে কথা বলি তার মূল সুরই অন্যায়ের প্রতিবাদ ও সাথে সাথে তার প্রতিকারেরও। সার্বজনীন বাংলাদেশের যে সমাজ তা মানবতাবোধ উজ্জীবনকারী ও প্রখর গভীরতাসম্পন্ন । এ দেশের মানুষ সবাই সবার সুখে-দুঃখে সমসুখী ও দুঃখী হয়। এগুলোই এ জনপদের মানুষের জীবন ও আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন, 'একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। এই রকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল, লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী আপনার ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ করত'।

খুব দূর অতীতে নয় নিকট অতীতেও এ অঞ্চলের মানুষ এককভাবে কোনো কিছু ভোগবিলাস করতে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হত। অগৌরব বোধ করত নিজের অর্জিত ধনসম্পদ এককভাবে ভোগ করতে। আনন্দ বোধ করত নিজের অর্জিত সম্পদ আশ-পাশের দশজনের সাথে বিলি-বণ্টন করে ভোগ করতে। আর সে কারণে এ দেশের প্রায় প্রতিটি জনপদ, প্রান্তরে অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় সাধারণ ও ধনবান লোকদের উদ্যোগে গড়ে উঠত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রাস্তা-ঘাট। এতে এলাকার লোকজন উপকৃত হত এবং এসব সেবামূলক ক্ষেত্রগুলোর কারণে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন। সমাজের সাধারণ ও ধনবান লোকদের জনহিতকর কর্মচেতনা থেকেই এ ধরনের উদ্যোগ গড়ে উঠত, যেহেতু স্থানীয় মানুষের

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠত সে কারণে সমাজে মানুষের বৈষম্য ও অসাম্যের চিত্র খুব প্রকট আকার ধারণ করত না, ফলে মানুষের জীবন হয়ে উঠত সরল।

পরিতাপের সাথে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্র যে সমাজ দেখে গিয়েছেন কিংবা যে সমাজের কথা লিখে গিয়েছেন, আজ আর সে সমাজ নেই। সমাজ, সমাজের মানুষ অনেক বদলে গিয়েছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ অনেক অন্য রকম। এখন সমাজে মানুষে মানুষে এত প্রভেদ হয়ে গিয়েছে যে সচেতনভাবে মানুষ অন্য মানুষের জন্য প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। স্বার্থহীনভাবে গড়ে তোলে না কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

তবে কি ধরে নেব এদেশের সংস্কৃতি বদলে গিয়েছে? কিন্তু আমি মনে করি কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ সমাজে এখনও প্রচুর লোক লোকচক্ষুর অন্তরালে মানুষের জন্য দেশের জন্য জনহিতকর কল্যাণকর কাজ করে যাচ্ছে।

ফিল্যানথ্রপি বা জনহিতকর ভাবনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সব মানুষের মাঝে এ চেতনা কম বা বেশি আছেই। কোনো মানুষের এ চেতনার মাত্রা হয়তো প্রখর আর কারো-বা পরিপ্রেক্ষিতের কারণে কম বা লুপ্ত। আমি আমার জীবনে এ চেতনার অনেক মানুষের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি, জনহিতকর চেতনার মূল কথাই মানুষের জন্য সমাজের জন্য প্রকৃতির জন্য ভালো কাজ করা, প্রচার বা খ্যাতি নয়; তবে সে কারণে আবার এ দেশে এ সমাজে প্রকৃত জনহিতকর কর্মপ্রচেষ্টাগুলো থেকে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে।

আমাদের এদেশীয় যে জীবন বা জীবনাচার তা অনেকটাই জনহিতকর চেতনা থেকে উদ্ভূত। আমরা আমাদের সমাজে বাবা-মা-ভাই-বন্ধু-স্বজন-পড়শী নিয়ে একতাবদ্ধভাবে জীবনযাপন করি, পরস্পরের সুখ-আনন্দ-দুঃখ-কষ্ট সমানভাবে ভাগ ও ভোগ করি। এই ধারণাটি অনেক বড়– সামাজিক ও মানসিকভাবে জনকল্যাণকর। আমাদের এই যে জীবনাচার আমরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বহন করে চলেছি এটি আগামী প্রজন্মের জন্যও হবে কল্যাণকর। প্রবৃত্তিগতভাবেই মানুষ সংবেদনশীল। তার প্রমাণ বেদনায় মানুষ কাঁদে, আনন্দে মানুষ হাসে, হাসি-আনন্দ-বেদনা-কষ্টের পৃথিবী যতদিন থাকবে ফিল্যানথ্রপি বা জনহিতকর কর্মচেতনা ততদিন পৃথিবীতে থাকবেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের যে চেতনা সেটাও ফিল্যানথ্রপিক ভাবনা থেকে উদ্ভূত। সাতচল্লিশে এ দেশের মানুষ ধর্মভিত্তিক স্বাধীন দেশ পেয়েছিল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এদেশের মানুষ উপলব্ধি করেছিল, যে স্বাধীনতা তারা পেয়েছে এ স্বাধীনতা তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা নয়। তাদের প্রয়োজন তাদের নিজেদের ধ্যান-ধারণা-সংস্কৃতি সম্পৃক্ত স্বাধীনতা। এ দেশের মানুষ বহু আন্দোলন সংগ্রাম ত্যাগ আর আত্মদানের বিনিময়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মেনে নেয়নি সাতচল্লিশের অনাকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এবং এটা সম্ভব হয়েছিল এ জন্য যে, এ দেশের

বড় অংশ মানুষ নিঃস্বার্থ ও কল্যাণময়। এখন প্রশ্ন দেশে বা সমাজে এমন কি অরাজকতা এল যে সমাজের মানুষ মানুষের সহজাত যে প্রবৃত্তি বা বোধ তা ভুলে যাচ্ছে বা হারিয়ে ফেলছে? অবশ্য বিশ্বায়নের আজকের যে পৃথিবী তার সামাজিক রূপ এরূপই হবার কথা। কারণ বাজারভিত্তিক অর্থনীতি কিংবা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মূল কথাই পুঁজি, বাজার, পণ্য, বেচাকেনা মুনাফা এসব। আর এসব সূচকগুলোই বদলে দিচ্ছে মানুষের জীবন ও সভ্যতা।

আজকের বিশ্বব্যবস্থা মানুষকে অচলায়তনে বন্দি করে ফেলেছে। আজকের সমাজের মানুষ শুধু ভাবে আমি আর আমার ভাইবন্ধু কতটুকু অর্থ অর্জন করতে পারব আর কতটুকু ভোগ করতে পারব। আমি আর আমরা ছাড়াও যে বিশাল একটা পৃথিবী আছে এই বোধটাই সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের মানসিক সহজাত বোধগুলো ক্ষুদ্র বা ছোট হয়ে যাচ্ছে। যা দেশ সমাজ ও পৃথিবীর জন্য অমঙ্গলের এবং ভয়ের। পৃথিবীর বা মানুষের প্রয়োজনেই মানুষকে এখান থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। কেননা পুঁজি, মুনাফা, ভোগ এগুলো মানুষকে করে তুলছে অসুস্থ ও ক্ষুদ্র। মানুষের প্রয়োজন বড় মানুষ হওয়া, কিন্তু সমাজে মানুষ আজ তার কর্মচেতনার জায়গাগুলোতে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষ খাটো হয় কোথায়, যেখানে সে দশ জনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না'। 'আমাদের দেশে কলাপাতায় খাওয়া তো কোনদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর। সেই কলাপাতা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোন আরাম পরিত্যাগ করিতে পারি না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে'।

আমাদের এদেশীয় মানুষের মন ও মনন কোমল ও ধর্মানুরাগী। এ কারণে এ দেশের সমাজ বা সংস্কৃতি বরাবরই বহুমাত্রিক। আমরাই পৃথিবীতে প্রথম জাতি যারা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের স্বাধীনতার জন্য, ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি এবং অর্জন করেছি নিজস্বতা। আমাদের নিজেদের যে অর্জনগুলো, আমাদের যে জীবনাচার লোকায়ত জ্ঞান তাতো আমাদের জন্য অকল্যাণীয় নয়। তবে তা হলে আমরা কেন আমাদের নিজেদের ঐতিহ্য-ইতিহাস-নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র নূতনকে ধরার জন্য দৌড়াব। নিজস্বতা পরিহার করে সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া কোনো দেশ ও জাতির জন্য গৌরবের নয়। বরং নিজস্ব জাতিকে অতীতের ধারণা ও বর্তমানের জ্ঞানের আলোতে উজ্জ্বল করে তোলাই আধুনিক ও যুগোপযোগী কাজ।

দৈন্যতা জীর্ণতার মাঝেও আমাদের আছে অনেক বড় জীবনাচার 'বাঙালিত্ব'। কল্যাণের জন্য শান্তির জন্য এগুলোই আমাদের অনুকরণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের পরে ফিল্যানথ্রপি বা জনহিতকর কর্মচেতনাই পারে দেশ থেকে অমঙ্গল আর অকল্যাণ দূর করতে।

অ নু বা দ

পাশ্চাত্য ফিল্যানথ্রপির প্রাচীন উৎস

বা র্জা র এ. পি য়া র স ন/ অনুবাদ শওকত হোসেন

[**বার্জার এ. পিয়ারসন,** পি.এইচডি. সান্তা বারবারার ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোনির্য়ার ধর্মবিষয়ক প্রফেসর এমিরিতাস। তিনি ইউসি বার্কলির খণ্ডকালীন প্রফেসর এবং রিলিজিয়াস স্টাডিজ-এর ইন্টেরিম ডিরেক্টর। প্রাচীন ক্রিশ্চানিটি, নস্টিকবাদ ও কপ্টিক সাহিত্যের ওপর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে ব্যাপক বক্তৃতা দিয়ে থাকেন।]

সূচনা

সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে আমাদের চেনা 'ফিল্যানথ্রপি' উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। যে চিন্তাধারাটি আসলে আমাদের 'ইহুদি-ক্রিশ্চান' ট্র্যাডিশন থেকে প্রণোদনা পেয়েছে। কিন্তু এইসব ট্র্যাডিশন আসলে কী সেটা খুব কমই ব্যাখ্যা করা হয়। পাশ্চাত্য ফিল্যানথ্রপি যে গ্রেকো-রোমান 'প্যাগান' বিশ্বের অ-ইহুদি, প্রাক-ক্রিশ্চান উৎস ধারণ করে এটা আমজনতার তেমন একটা জানা বিষয় নয়। সেদিক থেকে খোদ 'ফিল্যানথ্রপি' অর্থাৎ গ্রিক 'ফিল্যানথ্রপিয়া' (আক্ষরিকভাবে, 'মানুষের জন্যে ভালোবাসা') শব্দটাই স্পষ্ট উদাহরণ।

এই রচনায় আমি গ্রেকো-রোমান প্যাগানিজম, হিব্রু স্ক্রিপ্চার ও আদি ক্রিশ্চান সাহিত্যে আমাদের পরিচিত 'ফিল্যানথ্রপি'র সঙ্গে মিলে যাওয়া বিভিন্ন ধারণা অনুসন্ধানে আগ্রহী। ধর্মের ইতিহাসবিদ হিসাবে আমার পর্যবেক্ষণসমূহ ফিল্যানথ্রপির ধর্মীয় মাত্রার ওপর গুরুত্ব দেবে। এই অনুসন্ধানে আমরা সংস্কৃতি আর ট্র্যাডিশন পরস্পরের সাথে মিশে গিয়ে অনেক সময় কীভাবে নতুন 'সিন্থেটিক' ট্র্যাডিশন সৃষ্টি করে তাও দেখব। তৃতীয় সহস্রাব্দের দোরগোড়ায় আমরা এখন যে বৈশ্বিক সভ্যতায় বাস করছি এটা তার একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতারও, বিশেষ করে আলেক্জান্দার দ্য গ্রেটের (মৃত্যু: ৩২৩ বিসিই) সময় থেকে শুরু করে চতুর্থ শতকে রোমান সাম্রাজ্যের খ্রিস্টিয়করণ পর্যন্ত সময়কালেরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এটা ।

পরবর্তী পর্যায়ে আমার পদ্ধতি হবে ফিল্যানথ্রপিয়া এবং এর অন্যান্য অনুষঙ্গ কীভাবে পেগান, ইহুদি আর ক্রিশ্চান ট্র্যাডিশনে ব্যবহৃত হয়েছে তার কিছু প্রাসঙ্গিক

উদাহরণ অনুসন্ধান করা এবং ফিল্যানথ্রপিয়াকে ধারণ করে এমন কিছু বাস্তব প্রতিষ্ঠান আর রেওয়াজ সম্পর্কে আলোচনা করা।

গ্রিক শব্দ 'ফিল্যানথ্রপিয়া' এবং এর সংশ্লিষ্ট বিশেষণ 'ফিল্যানথ্রপোস'র দীর্ঘ ও বিভিন্নমুখী প্রয়োগের ইতিহাস রয়েছে। আদিতে এটা ছিল ধর্মীয় বুলি, কারণ প্রথম দিকে মানুষের জন্যে দেবতাদের ভালোবাসা বোঝাতে এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছিল। এই প্রয়োগের ভেতর দিয়েই অর্থাৎ প্রাচীন গ্রিকদের জগত থেকেই শুরু হবে আমাদের অনুসন্ধান।

ফিল্যানথ্রপির পেগান উৎস

বিসিই পঞ্চম শতাব্দীর অ্যাথেনিয় নাটক, একাধারে কমেডি ও ট্র্যাজিডিতে বিশেষণ ফিল্যানথ্রপোস-এর প্রাচীনতম প্রয়োগ দেখা যায়। 'ক্ষমতা' (ক্রাতোস)-এর মুখে টাইটান দেবতা প্রমিথিউসের নিয়তি আর তার কারণ বর্ণনা করে অ্যাকিলাস তাঁর বিখ্যাত ট্র্যাজিডি প্রমিথিউস বাউন্ড-এর শুরু করেন। মরণশীলদের কাছে আগুন পৌঁছে দেয়ার দায়ে প্রমিথিউসকে পাহাড়ের ওপর বেঁধে রেখেছেন যিউস:

> তার অপরাধ এমনই ছিল যে দেবতাদের কাছে ক্ষতিপূরণের জন্যে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে যাতে তিনি যিউসের সার্বভৌমত্ব ভাঙার শিক্ষা পান আর মানুষের প্রতি দরদ (ফিল্যানথ্রপো ত্রোপো) প্রদর্শন থেকে বিরত থাকেন।[১]
>
> পরে হেপাস্তাস প্রমিথিউসের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন, মানুষের জন্যে দরদের (ফিল্যানথ্রপো ত্রোপো, লাইন, ২৮)– একেবারে আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করা হলে দাঁড়ায় 'ফিল্যানথ্রপিক প্রবণতা'–বিনিময়ে এটাই পুরস্কার হিসাবে পেয়েছেন তিনি।

কমেডি কবি অ্যারিস্তোফেন্স ৪২১ বিসিই-তে ৪৩১ থেকে ৪০১ বিসিই পর্যন্ত সংঘটিত পেলোপোনিশিয় যুদ্ধের সময় রচিত তাঁর পিস কবিতায় ফিল্যানথ্রপো'র প্রায় সমসাময়িক ব্যবহারের নজীর দেখিয়েছেন। কোরাস দেবতা হারমিসকে 'সবচেয়ে মানবদরদী' (ফিল্যানথ্রপোটেট) এবং দেবতাদের ভেতর সবচেয়ে 'দয়ালু' বলে সম্ভাষণ করছেন তিনি। এই অ্যারিস্তোফেন্সকেই প্লেটোর বিখ্যাত সংলাপ সিম্পোজিয়ামে ডিনারের সঙ্গী হিসাবে দেখানো হয়েছে। অ্যারিস্তোফেন্স তাঁর ভাষণে ইরোসকে (ভালোবাসাকে) দেবতাদের ভেতর সবচেয়ে প্রেমময় বলে উল্লেখ করেছেন। (১৮৯ সি)।

প্লেটোর শেষ জীবনের (৩৪৭ বিসিইতে মারা যান তিনি) অন্যতম রচনা আইন গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে এক নামহীন অ্যাথেনিয়র মুখে ক্রেনোসের কাল (গ্রিক মিথলজিতে যিউসের বাবা)-কে মানবজাতির প্রাচীন সুবর্ণ-সময় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মানুষের প্রতি প্রবল ভালোবাসার কারণে দেবতা (ফিল্যানথ্রপোস নামে বর্ণিত, ৪.৭১৩ ডি) মানবজাতিকে শাসন করার জন্যে মানুষের বদলে দিমনদের (আধা-স্বর্গীয় সত্তা) হাতে

দায়িত্ব দিয়ে শান্তি আর এক ন্যায়বিচারের রাজ্য নির্মাণ করেছিলেন। সে কারণেও 'স্বর্ণ যুগের' ধারণা প্রাচীন বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু ছিল।

এসব উদাহরণ থেকে আমরা দেখি, গ্রিকরা পঞ্চম-চতুর্থ শতক থেকে দেবতাদের গুণ হিসাবে 'ফিল্যানথ্রপোর' প্রয়োগ করেছে, যারা মানবজাতিকে আশীর্বাদ হিসাবে নানা উপহার আর সুবিধা দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এই শব্দটি বিশেষ কোনও দেবতা বা সামগ্রিকভাবে সকল দেবতাদের নামে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে, তবে আস্তে আস্তে তা পরম অর্থে নিরাময়ের দেবতা ও চিকিৎসকদের পৃষ্ঠপোষক অ্যাসক্লিপিওসের নামে প্রয়োগ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পরে আমরা আরও জানব।

প্লেটো তাঁর একটি আদি সংলাপ ইউথিপ্রো-তে সতীর্থ নাগরিকদের প্রতি সক্রেতিসের মনোভাব প্রসঙ্গে বিশেষ্য হিসাবে 'ফিল্যানথ্রপিয়া' ব্যবহারের নজীর দেখিয়েছেন। ইউথিপ্রোতে সক্রেতিসকে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

> আমার ভয় এই কারণে যে মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসার (ফিল্যানথ্রপিয়ো) কারণে তারা ভাবে আমি বিনামূল্যে যে কারও জন্যে বা সবার জন্যে নিজেকে কেবল উজাড় করেই দেব না বরং কেউ আমার কথা শুনলে তাকেই হয়তো সবকিছু দিয়ে দেব।[২]

সক্রেতিস নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন। সাধারণভাবে 'ফিল্যানথ্রপিয়ো' (বা এর কোনও অনুষঙ্গ) প্রথম দিকে কেবল এ ধরনের অসাধারণ ব্যক্তি, বিশেষ করে রাজা বা সম্রাটদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। এভাবে যেনোফোন (মৃ. পধ ৩৫৭ বিসিই) তাঁর সাইরাস, দ্য গ্রেট অভ পারসিয়া'র শিক্ষা-সম্পর্কিত নিবন্ধে জানাচ্ছেন:

> ব্যক্তি হিসাবে সাইরাস ছিলেন সবচেয়ে সুদর্শন, অনেক দয়ালু (ফিল্যানথ্রপোতাতোস) মনের, শিক্ষার প্রতিনিবেদিত প্রাণ এবং দারুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যে কারণে তিনি সব ধরনের পরিশ্রম সহ্য করেছেন, তারিফ লাভের জন্যে সব ধরনের বিপদ মোকাবিলা করেছেন।[৩]

> সক্রেতিস সাইপ্রাসের রাজা ইভাগোরাসের (পধ. ৩৬৫ বিসিই) প্রশংসা করতে গিয়ে বলছেন যে রাজা:

> এত শ্রদ্ধা আর মানবিকভাবে (ফিল্যানথ্রপোস) নগর পরিচালনা করেছেন যে দ্বীপে আগত অতিথিরা ইভাগোরাসকে তাঁর দরবারের কারণে যতটা না ঈর্ষা করেছে তার চেয়ে বেশী ঈর্ষা করেছে নাগরিকদের তাঁর সরকারের শাসনাধীনে থাকার কারণে।[৪]

আরেক অ্যাথেনিয় বক্তা বিখ্যাত দেমোসথেনেস (মৃ. ৩২২ বিসিই) আদালতে দেওয়া তাঁর বেশ কয়েকটি বক্তৃতায় 'ফিল্যানথ্রপিয়া' আর 'ফিল্যানথ্রপোস' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এক উদাহরণে সংসদে রাষ্ট্রের কল্যাণকারীদের দেয়া 'লিটার্জি'থেকে বিশেষ 'নিষ্কৃতি'র বিধান বিলুপ্ত করার প্রস্তবকারী জনৈক লেপ্তাইনের বিরুদ্ধে দেমোসথেনেস তাঁর উপসংহারে যোগ করেন যে, এটা এমন একটা বিষয় যেখানে 'ঈর্ষার বিরুদ্ধে মানবজাতি (ফিল্যানথ্রপিয়ো), বৈরিতার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার আর সকল খারাপের

বিরুদ্ধে শুভ একত্র হয়েছে।'[৫] এখানে উল্লেখ করা অন্য উদাহরণে দেমোসথেনেস রাষ্ট্রের কল্যাণের বিনিময়ে নিজের সোনার মুকুট লাভের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে নিজের প্রতি এই যুক্তিতে 'ফিল্যানথ্রপোস' এবং ফিলোদোরোস ('উদার') বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন (অর. ১৮.১১২) যে, তিনি জনগণের উপকারের জন্যে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন।

'ফিল্যানথ্রপিয়া' কথাটির বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রয়োগ জনপ্রিয় দার্শনিক-নীতিমালা বিশেষ করে রাজ্যের স্টয়িকবাদকে প্রভাবিত করেছে। খোঁড়া স্টয়িক যাজক এপিকতেসাস একজন নীতিবান বিখ্যাত সিনিক দার্শনিক হিসাবে দিয়েজিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন: যিউসের একজন প্রকৃত সেবক যিনি সবাইকে ভালোবেসেছেন এবং 'এত ভদ্র আর কোমল হৃদয়ের ছিলেন (ফিল্যানথ্রপোস) যে সাধারণ মঙ্গলের জন্যে তিনি সব রকম বিপদ আর দৈহিক কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিতেন।'[৬] আরেক সারমনে এপিকতেতাস সিনিক যাজকদের মনোভাব বর্ণনা করছেন, যারা জাগতিক সম্পদের সাথে জড়িত নন: এটা একাধারে 'মানবিক (ফিল্যানথ্রপোন) আর মহান প্রবণতা'[৭] যা আসলে যিউসেরই অবদান।

এইসব উদাহরণে 'ফিল্যানথ্রপিয়াকে' মানবিক গুণ হিসাবে দেখা হয়েছে বলে লক্ষ করি, তবে এই গুণের উৎস ঈশ্বর বা দেবগণ। আদি রাজকীয় দর্শনে এটা একটা সাধারণ ধারণায় পরিণত হয়েছিল। এভাবে প্লুতার্ক বলতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর কেবল 'অমর আর আশীর্বাদপ্রাপ্তই নন, বরং মানবিক (ফিল্যানথ্রপোস), রক্ষক এবং দানশীলও।'[৮] এই প্রয়োগ, আমরা যেমন দেখেছি, ক্লাসিকাল গ্রিক পরিভাষা 'ফিল্যানথ্রপিয়া' এবং 'ফিল্যানথ্রপোস'-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তবে মূল শব্দ 'ফিল্যানথ্রপ'-এর আরেকটি প্রয়োগ উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষায়িত বিশেষণ সাধারণভাবে ক্লীববাচক বহুবচনে পাওয়া যায়: তা 'ফিল্যানথ্রপা' (যেমন ফিল্যানথ্রপোনকে)। এই প্রয়োগ প্রধানত প্রামাণ্য টেক্সট, যেমন বিসিই তৃতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন খোদাইকর্ম এবং প্যাপিরিতে পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে এর অর্থ 'সুবিধা'। কোনও শহুরে বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা কোনও ব্যক্তিগত ক্লাব বা সমিতিকে[৯] দেয়া আর্থিক সুবিধার বিপরীতে পাওয়া সুবিধা বা ছাড় এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রয়োগ প্রাচীন গ্রিক সমাজের একটি মৌল ধারণা প্রকাশ করে: যা বিনিময়। উপহার ছিল একটা দ্বিমুখি ব্যাপার, যদিও সাধারণ মানুষের চোখে তা বিমূর্ত 'সম্মান' কিংবা মূর্ত কিছু যেমন, উপহারের কথা উল্লেখ করে দেয়া কোনও ফলক, কিংবা দাতার সম্মানে আয়োজিত কোনও ভোজের মতো ব্যাপার ছিল । খোদ উপহারকে বলা হত ফিল্যানথ্রপোন, একইভাবে বিনিময়ে দেয়া সম্মান বা স্বীকৃতিও ছিল 'ফিল্যানথ্রপোন'।[১০] তবে লক্ষ্য অবশ্যই ফিলোতিমিয়া (সম্মানের প্রতি ভালোবাসা), খোদাই আর সাহিত্যকর্মে ব্যাপক ব্যবহৃত ইতিবাচক গুণ হিসাবে বিবেচিত পরিভাষা।

গ্রিক নগররাষ্ট্রে, বিশেষ করে সম্রাটের আমলে, 'ফিল্যানথ্রপো' আদান-প্রদান তত্ত্বগতভাবে স্বেচ্ছামূলক হলেও রেওয়াজের দিক থেকে অস্বেচ্ছামূলক ছিল। এটাই

'লিটার্জ্রির' (আক্ষরিকভাবে লেইতারজিয়া, 'সাধারণ মানুষের জন্যে কাজ') প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটিয়েছে । শব্দটি নিজের খরচে সাধারণ নাগরিকদের 'সাধারণ সেবা' দেওয়ার কথা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্লাসিকাল অ্যাথেন্সে (৫ম থেকে ৪র্থ বিসিই শতক) সম্পদশালী পরিবারের লোকদের পালা করে বছরে একবার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্ব নিতে হত। এই লিটার্জ্রিরা ধর্মীয় মন্দির আর উৎসবের খরচ মেটাতেন, কিংবা নৌবাহিনীর জন্যে জাহাজ নির্মাণ করতেন, অথবা নাটক অনুষ্ঠান বা এজাতীয় কোনও কাজের জন্য অর্থ যোগাতেন। এই প্রতিষ্ঠান বহু শতাব্দী ধরে হেলেনিস্টিক এবং রাজকীয় আমল জুড়ে গ্রিক নগরসমূহের (পোলিস) প্রশাসনের মূল উপাদান ছিল। এভাবে সমাজে যেসব কাজ করা হত বা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদায় সারা হত সেগুলো এইসব 'লিটার্জি' দিয়ে সংস্থান করা হত, কার্যত সচ্ছল নাগরিকদের উপরই তা আরোপ করা হত।

ক্লাসিকাল অ্যাথেন্সে লিটার্জির বিনিময়ে পাওয়া সম্মান বা সুবিধাকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ মনে করা হত। তবে রাজকীয় আমলে এই ব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রসারিত করা হয়েছিল যে এটা সমাজের সকল পর্যায়েই বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিল। রোমান মিশরের ক্ষেত্রে এর পূর্ণাঙ্গ নথি রয়েছে।[১১] বিশেষত বিপর্যস্ত তৃতীয় শতকে মিশরের নগর আর শহরবাসীর ওপর লিটার্জি আর কর হিসাবে চাপিয়ে দেয়া ভার এত চড়া হয়ে গিয়েছিল যে পালানো ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না। আর্থিক দায়িত্ব এড়ানোর ক্ষেত্রে অ্যানাকোরেসিস অর্থাৎ 'প্রত্যাহার' কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত মিশরে কোনও কোনও 'অ্যানকোরাইট' মঙ্কের মরুভূমিতে পালিয়ে যাওয়ার পেছনে ধর্মীয় কারণের চেয়ে অধিক ব্যাপার ছিল!

যাক গে, আবার 'ফিল্যানথ্রপি'র প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। গ্রেকো-রোমান সমাজে অভাবীদের জন্যে খাবার আর তেলের যোগান, শিক্ষার বিস্তার এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রসারসহ কল্যাণসাধনের সরকারী আর ব্যক্তিগত উল্লেখযোগ্য নজীর রয়েছে। এখানে এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারছি না,[১২] তবে দেবতা অ্যাস্ক্লেপিয়োসের উপাসনার সঙ্গে গ্রিকো-রোমান বিশ্বে 'ফিল্যানথ্রপিক' কর্মকাণ্ডের একটা বিশেষ নজির তুলে ধরতে চাই।

অ্যাস্ক্লেপিয়োস ছিলেন নিরাময়ের গ্রিক দেবতা ও চিকিৎসকদের পৃষ্ঠপোষক উপাস্য। সারা গ্রেকো-রোমান জগতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মন্দিরে কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁর কাল্ট এবং নিরাময় কর্মকাণ্ড। সবচেয়ে বিখ্যাত এবং প্রাচীন ছিল গ্রিসের এপিদোরোসের মন্দির। দেবতার দেয়া নিরাময় মন্দিরের একটা কামরায় 'ঘুমানো' রোগির কাছে 'ইনকিউবেশন' নামে পরিচিত প্রক্রিয়ায় নিশিভ্রমণ রূপে ঘটত। অ্যাস্ক্লিপিওস-এর নিরাময়ের পক্ষে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।[১৩] দেবতার প্রত্যক্ষ হস্ত ক্ষেপের পাশাপাশি চিকিৎসকদের চিকিৎসাও ছিল।

অ্যাস্ক্লিওপিওসের সামাজিক অবস্থান আমাদের কাছে বিশেষ কৌতূহলের বিষয়।[১৪] নিম্নবর্গের কাছে রোগবালাইয়ের অর্থনৈতিক হুমকি ছিল মারাত্মক, চিকিৎসা ছিল

ব্যয়বহুল। দেবতা অ্যাস্কেপিওসকে বিনা খরচে চিকিৎসা দানকারী দেবতা হিসাবে প্রশংসা করা হয়েছে। ছোটখাট উপহারেই সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে টাকা-পয়সা দিতে অক্ষম লোকজনকে সারিয়ে তোলার জন্যেই প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেবতার ব্যবস্থাপত্রে মন্দিরের লাগোয়া স্যানিটোরিয়ায় চিকিৎসার উল্লেখ থাকত। যাদের দেয়ার মতো টাকা-পয়সা ছিল না তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হত। ফলে অ্যাস্কিপিওস দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে ফিল্যানথ্রপিক (ফিল্যানথ্রপোতাতোস) হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।[১৫] অ্যাস্কিপিওসের যাজকরা তাদের সুবিধাসমূহ কেন দরিদ্রদের কাজে লাগিয়েছিলেন সেটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে, তবে ধরে নেয়া যায়, তা নিরাময় দেবতা আর তাঁর মন্দিরের সুনাম বয়ে আনত, ফলে অধিকতর সচ্ছল লোকদের কাছ থেকে কর পাওয়া যেত।

রোমান আমলে স্টয়িক দর্শনের প্রভাবে সম্পদশালীদের মধ্যে আরও উদার একটা মনোভাব জাগিয়ে তোলা হয়, দেবতা সেটাকে আরও জোরালো করে তোলেন। অ্যাস্কেলিপিওসের একজন বিশেষ ভক্ত দ্বিতীয় শতকের অরেটর ঈলিয়াস অ্যারিস্তাইদস একটা কৌতূহলোদ্দীপক নজীর উল্লেখ করেছেন। দেবতার মন্দিরে সফরের সময় দেবতা তাঁকে তীর্থযাত্রীদের মাঝে টাকা-পয়সা বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন (অর ৪৮.২৭)।

অ্যাস্কেলিপিওসের ভক্ত প্রাচীন টেস্টিমোনিয়ার সম্পাদকগণ এভাবে দেবতার ফিল্যানথ্রপিক ভূমিকার সার করেছেন:

> দরিদ্রদের যেখানে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়তির হাতে সোপর্দ বা সাধারণভাবে সমাজের হাতে হাওলা করে দেয়া হয়, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ ওষুধ অসহায়দের জন্যে কোনও বাড়তি ব্যবস্থা রাখেনি, সেখানে অ্যাস্কেলেপিয়া [অ্যাস্কেলিপিওস মন্দির] আর ধর্মীয় ওষুধ নিম্নশ্রেণীর চিকিৎসা সংক্রান্ত কল্যাণের পক্ষে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১৬]

ফিল্যানথ্রপির প্যাগান উৎস সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করার আগে গ্রেকো-রোমান সমাজের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা সংক্ষেপে বলতে চাই যা সম্পদ আর দারিদ্র্যের প্রতি ইহুদি আর ক্রিশ্চান দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এর বিশাল পার্থক্য তুলে ধরবে।

সম্পদ কিংবা অন্ততপক্ষে পর্যাপ্ত সম্পত্তিকে সৎ জীবন যাপনের পূর্বশর্ত বলে মনে করা হত। নিকোমোচিয়ান এথিকস-এ (বিসিই চতুর্থ শতাব্দী) অ্যারিস্টটলের মন্তব্যসমূহ একেবারেই টিপিক্যাল। চতুর্থ খণ্ডের শুরুতে অ্যারিস্টটল 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এটা এমন এক গুণ যার জন্যে সম্পদ আর তার ব্যবহারের দিক হতে সংযমের (উপায়) প্রয়োজন পড়ে (৪.১.১)। উপায় হচ্ছে 'অপব্যয়' (আসোতিয়া) আর 'নীচতা'র (অ্যানেলিউথেরিয়া ৪.১.২)-র মাঝামাঝি পর্যায়। জীবনের জন্যে সম্পদ শুধু অপরিহার্যই নয় (৪.১.৫), বরং সৎভাবে জীবন যাপন করার জন্যে খুবই জরুরি (৪.১.৬–৪৫), যেখানে সম্পদের সঠিক ব্যবহারের বিষয় রয়েছে।[১৭]

দায়োজিনিস দ্য সিনিকের বিখ্যাত বচন 'টাকার জন্যে দরদই সব অশুভ কাজের উৎস,'[১৮] একটা নিয়মের ব্যতিক্রম তুলে ধরছে যে সিনিক মতবাদ পাল্টা সাংস্কৃতিক

অবস্থানের জন্যে এক ধরনের স্বেচ্ছামূলক দারিদ্র্যের পক্ষে কথা বলছে। কিন্তু সিনিকও 'দারিদ্র্য'কে গুণ হিসাবে তুলে ধরেননি।

গ্রেকো-রোমান বিশ্বে দারিদ্র্যকে সাধারণভাবে মর্যাদার অভাব হিসাবে এড়ানোযোগ্য বলে মনে করা হত। সম্পদের নাশের ফলে সৃষ্ট দারিদ্র্য ছিল ভয় করার মতো একটা ব্যাপার, কারণ তারও মানে ছিল মর্যাদা হারানো, নিজের মূল্য ফুরিয়ে যাওয়ার একটা বোধ।

গ্রিক প্রয়োগে 'দারিদ্র্য' ছিল দুই ধরনের: পেনিয়া আর তোচিয়া। পেনিয়া হচ্ছে 'দারিদ্র্য' বা 'প্রয়োজন': পেনেস এমন এক ব্যক্তি যে কিনা কোনওমতে বেঁচে থাকার মতো সম্বলের অধিকারী। প্রকৃতই এটা ছিল প্রাচীন বিশ্বের অধিকাংশ লোকের অবস্থা: নীরব জনতা, প্রাচুর্যের ভেতর বেড়ে ওঠা শিক্ষিতদের রচনায় যাদের কথা উঠে আসত না, যারা উত্তরসূরিদের জন্যে লিখেছেন। আসলে বেঁচে থাকার জন্যে যে-ই নিজের হাতে কাজ করত তাকেই এই দলভুক্ত মনে করা হত। গ্রিক সমাজে দৈহিক পরিশ্রম গ্রহণযোগ্য ছিল না।

অন্য ধরনের দারিদ্র্য, তোচিয়া, ছিল ঢের বেশী ভয়ঙ্কর। তোচিয়া সেই ব্যক্তি যে কিনা একেবারেই দুস্থ, ভিক্ষা করা ছাড়া যার কোনও উপায় নেই।[১৯] ভিখেরিদের সাধারণত ভয় আর ঘৃণার চোখে দেখা হত। প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে ভিখেরিদের এই কারণে বাদ দিতে চেয়েছেন যে, তারা সম্ভবত চোর, ডাকাত, পকেটমার, মন্দির লুঠকারী আর অন্যান্য অপরাধে লিপ্ত থাকবে।[২০] লাতিন কমিক কবি প্লাতিয়াস (৩য়/২য় শতক বিসিই) বলেছেন: 'ভিখেরিকে খাবার আর পানি দিয়ে আপনি তার ক্ষতি করছেন।'[২১] এই ধরনের লোক করুণার অতীত, যা পেনারিয়াসদের, অর্থাৎ যাদের অপর্যাপ্ত রসদ আছে, সাহায্য করতে স্বচ্ছলদের অনুপ্রাণিত করবে। সংক্ষেপে, ভিখেরিরা–তোচোইরা–সাধারণভাবে গ্রেকো-রোমান 'ফিল্যানথ্রপি'র আওতার বাইরে ছিল।

ফিল্যানথ্রপির ইহুদি উৎস

প্রথমে আমরা গ্রেকো-রোমান ডায়াসপোরায় গ্রিকভাষী ইহুদিবাদে গ্রিক শব্দ ব্যবহার থেকে লক্ষ করি যে মোটামুটি প্যাগান গ্রিক সাহিত্যের মতোই এর প্রয়োগ 'ফিল্যানথ্রপিয়ার' করা হয়েছে। এভাবে উদাহরণ স্বরূপ, প্রজাদের প্রতি দয়া-দেখানো শাসকদের বেলায় দয়াবান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রিক বাইবেলের (সেপটুয়াজিন্ট) ৩য় ম্যাকাবিতে রাজা টলেমি চতুর্থ ফিলোপতকে প্রজাদের 'ব্যাপক উদারতার (ফিল্যানথ্রপিয়া) সঙ্গে শাসন করেন' (৩ ম্যাকাবি ৩.১৫) বলে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সাধারণভাবে সিই প্রথম শতকের রচনা বলা হলেও ঘটনাবলী থেকে মনে হয় সেগুলো বিসিই তৃতীয় শতকের। ম্যাকাবি ২-এ ইসরায়েলিদের কাছে লেখা একটা চিঠিতে কুখ্যাত অ্যান্তিওকাস চতুর্থ এপিফেন্সকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে তিনি তাঁর প্রজাদের 'উদারতা আর দয়ার সঙ্গে শাসন করেন (ফিল্যানথ্রপোস)' (২ ম্যাকাবি

৯.২৭)। জোসেফাস এমনকি রোমানদের শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন (অ্যান্ট. ১২.১২৪)!

উইজডম অভ সলোমন-এ (সিই প্রথম শতকের গোড়ার দিকের) ব্যক্তিরূপ স্বর্গীয় প্রজ্ঞা (সোফিয়া)-কে বলা হচ্ছে 'এক দয়াময় (ফিল্যানথ্রপোস) আত্মা।'(১.৬; সিএফ ৭.২৩) যিনি ন্যায়পরায়ণদের 'দয়ালু' (ফিল্যানথ্রপোন-২.১৯) শিক্ষা দেন। এভাবে সোফিয়া খোদ ঈশ্বরের নিজস্ব ফিল্যানথ্রপিক প্রকৃতির অংশীদার হয়ে যান এবং তাঁর জাতির মতো একই গুণাবলী প্রকাশ করেন।

মানবীয় গুণ হিসাবে ফিল্যানথ্রপিয়ার সবচেয়ে সেরা উদাহরণ মেলে ফিলো অফ আলেকজান্দ্রিয়ার (সিই প্রথম শতাব্দী) নিবন্ধ অন দ্য ভার্চুজ-এ। এই নিবন্ধে ফিলো চারটি গুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন: সাহস (অন্দ্রেইয়া), মানবতা (ফিল্যানথ্রপিয়া), অনুশোচনা (মেতোনোইয়া) এবং আভিজাত্য (ইউজেনিয়া)। তাঁর সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে রাখা হয়েছে ফিল্যানথ্রপিয়ার জন্যে। তিনি একে বলছেন 'ধার্মিকতা'র (ইউসেবিয়া) 'যময বোন'। মোজেসের আইনে (তোরাহ), খোদ মোজেসের আচরণ (৫২-৭৯) আর ইসরায়েলকে দেয়া তাঁর বিধানে এই গুণের নজীর পেয়েছেন ফিলো। মোজেসের আইনে ফিল্যানথ্রপিয়া সুদের বিরুদ্ধে (যাত্রা. ২২:২৫; লেভ ২৫:৩৬ এফ; ডিউট ২৩:১৯-ভার্ট ৮২-৮৭), শ্রমিকদের মজুরি মেটানো (লেভ ১৯:১৩; ডিউট ২৪:১৪ এফ-৮৮), অন্যায়ভাবে ঋণ আদায় (ডিউট ২৪:১০এফ-ভার্ট. ৮৯), ফসলের মাঠ থেকে গরীবদের শস্য কুড়োনো (লেভ ১৯:১৯; ২৩:২২-ভার্ট. ৯০-৯৪), প্রথম ফসল পুরোহিতদের প্রদান (ডিউট ১৬:১-১১-ভার্ট. ৯৫), হারিয়ে যাওয়া পশু মালিককে ফিরিয়ে দেয়া (ডিউট ২২:১- ভার্ট.৯৬), সাব্বাতিয় বছর (যাত্রা ২৩:১০এফ; লেভ ২৫:৩এফএফ-ভার্ট. ৯৭-৯৮) এবং জুবিলি বছর (লেভ ২৫:৮এফএফ-ভার্ট. ৯৯), ইত্যাদি নির্দেশনায় উঠে এসেছে। ইসরায়েলিদের সতীর্থ ইসরায়েলিদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই আইনগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু একইভাবে আগন্তুকদের সঙ্গে আচরণ (লেভ ১৯:৩৩এফ-ভার্ট. ১০২-১০৪), সফর (ডিউট ২৩-ভার্ট. ১০৫-১০৮), এবং এমনকি শত্রুদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেও ইসরায়েলিদের ওপর মানবীয় আইনকানুনও আরোপ করা হয়েছিল। এই উদাহরণগুলো দেখায় যে মোজেসের আইনের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের ভেতর শান্তি আর সৌভ্রাতৃত্ব জাগিয়ে তোলা। ফিলো আইনে দাস (১২১-২৪), এমনকি পশু (১২৫-৪৭) আর গাছপালার (১৪৮-৫৯) ফিল্যানথ্রপিয়ার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। এই গুণ সম্পর্কিত আলোচনার সমাপনী মন্তব্যে (১৬১-৭৪) ফিলো এমন কিছু দোষের কথা বলেছেন 'ফিল্যানথ্রপিয়া' যার প্রতিষেধক।

'ফিল্যানথ্রপিয়ার' পরম উৎস অবশ্যই ঈশ্বর বটে, যিনি আবার গ্রেকো-জুইশ সাহিত্যে 'ফিল্যানথ্রপোস' হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। এভাবে জোসেফাস তাঁর মহান সৃষ্টি দ্য এন্টিক্স অফ দ্য জুজ ইহুদিদের আইনদাতা মোজেসের ভূয়সী প্রশংসা দিয়ে শুরু করেছেন, যিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে 'ঈশ্বর গুণের একেবারে নিখুঁত রূপের

মালিক'; জোসেফাস এরপর 'ঈশ্বরের মাহাত্ম্য আর মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা (ফিল্যানথ্রপিয়ান)'র কথা উল্লেখ করেছেন।[২২]

এইসব উদাহরণ অবশ্যই গ্রিকভাষী ইহুদিদের কাছ থেকে এসেছে। হিব্রু স্ক্রিপ্‌চারের গ্রিক অনুবাদে 'ফিল্যানথ্রপিয়া' শব্দের কোনও উল্লেখ নেই, কারণ হিব্রুতে এর সঠিক কোনও প্রতিশব্দ নেই। এভাবে ফিল্যানথ্রপির হিব্রু উৎসের খোঁজ পেতে আমাদের অবশ্যই আগে হিব্রু স্ক্রিপ্‌চারের শরণাপন্ন হতে হবে যা ফিল্যানথ্রপির ইহুদি আর ক্রিশ্চান ধারণার উৎস। বিশেষ করে এইসব স্ক্রিপ্‌চার ইসরায়েলের ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের কী বলছে সেটা দেখতে হবে।

সম্ভবত যাত্রা পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ের সুপরিচিত অনুচ্ছেদ দিয়ে শুরু করাটাই বেশি ভালো হবে। মোজেস প্রভুকে তাঁর মহিমা দেখাতে বলছেন, কিন্তু ঈশ্বর বলছেন, 'তুমি আমার চেহারা দেখতে পাবে না' (৩৩:২০)।[২৩] তা সত্ত্বেও প্রভু মেঘের আড়ালে তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় নিজের নাম আর গুণাবলী ঘোষণা করেন–[২৪]

'সদা প্রভু, সদা প্রভু,
স্নেহশীল আর কৃপাময় ঈশ্বর,
ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান;
সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্যাপ্ত দয়ারক্ষক,
অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী;
তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন;
পুত্র পৌত্রদের ওপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত,
তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্তান।' (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭)

ইনিই ইসরায়েলের ঈশ্বর এবং তিনি দেখতে কেমন; তিনি কী করেন আর কী নির্দেশ দেন? তোরাহর অসংখ্য অনুচ্ছেদে ঈশ্বর নিজেকে দরিদ্র আর বহিরাগতদের রক্ষক বলে দাবি করেছেন আর আপন জাতিকে যথাযথ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন:

তুমি বিদেশীর প্রতি অন্যায় করিও না, তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা মিশর দেশে তোমরা বিদেশী ছিলে। তোমরা কোনও বিধবাকে কিম্বা পিতৃহীনকে দুঃখ দিও না। তাহাদিগকে কোনো মতে দুঃখ দিলে যদি তাহারা আমার নিকটে ক্রন্দন করে, তবে আমি অবশ্য তাহাদের ক্রন্দন শুনিব; আর আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, এবং আমি তোমাদিগকে খড়্গ দ্বারা বধ করিব, তাহাতে তোমাদের স্ত্রীরা বিধবা আর তোমাদের সন্তানগণ পিতৃহীন হইবে। তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোনো দীন দুঃখীকে টাকা ধার দাও, তবে তাহার নিকট সুদগ্রাহীর ন্যায় হইও না; তোমরা তাহার ওপর সুদ চাপাইবে না। যদি তুমি আপন প্রতিবাসীর বস্ত্র বন্ধক রাখ, তবে সূর্যাস্তের পূর্বে তাহা ফিরাইয়া দিও, কেননা তাহা তাহার একমাত্র আচ্ছাদন, তাহার গাত্রের বস্ত্র; সে

কিসে শয়ন করিবে? আর যদি সে আমার কাছে ক্রন্দন করে, তবে আমি তাহা শুনিব, কেননা আমি কৃপাবান। (যাত্রাপুস্তক ২২:২১-২৭)
দরিদ্র প্রতিবাসীর বিচারে তাহার প্রতি অন্যায় করিও না। মিথ্যা বিষয় হইতে দূরে থাকিও, এবং নির্দোষের বা ধার্মিকের প্রাণ নষ্ট করিও না, কেননা আমি কখনও দুষ্টকে নির্দোষ করিব না। আর তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিও না, কেননা উৎকোচ মুক্তচক্ষুদিগকে অন্ধ করে, এবং ধার্মিকের ওয়াদাকে উল্টায়। আর তুমি বিদেশীর প্রতি উপদ্রব করিও না, তোমরা তো বিদেশীর হৃদয় জান, কেননা তোমরা মিশর দেশে বিদেশী ছিলে। (যাত্রাপুস্তক ২২:৬–৯)
আর তোমরা যখন আপন আপন ভূমির শস্য কাট, তখন তুমি ক্ষেত্রের কোণস্থ শস্য নিঃশেষে কাটিও না, এবং তোমার ক্ষেত্রে পতিত শস্য কুড়াইও না। আর তুমি আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পরিত্যক্ত দ্রাক্ষাফল চয়ন করিও না, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পতিত দ্রাক্ষাফল কুড়াইও না; তুমি দুঃখী আর বিদেশীদের জন্য তাহা ত্যাগ করিও। আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর। তোমরা চুরি করিও না, এবং আপন আপন স্বজাতিকে বঞ্চনা করিও না, এবং মিথ্যা কথা কহিও না। আর আমার নাম লইয়া মিথ্যা দিব্য করিও না, করিলে তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করা হয়; আমি সদাপ্রভু।...তোমরা বিচারে অন্যায় করিও না। তুমি দরিদ্রকে মুখাপেক্ষি করিও না উপরন্তু ধনবানের সমাদর করিও না, তুমি ধার্মিকতায় স্বজাতির বিচার নিষ্পন্ন করিও। ...তুমি আপন জাতির সন্তানদের ওপরে প্রতিহিংসা কি দ্বেষ করিও না; বরং আপন প্রতিবাসীকে আপনার মতো প্রেম করিবে; আমি সদাপ্রভু। (লেবীয় ১৯: ৯–১৮)

তৃতীয় বৎসরের শেষে তুমি সেই বৎসরে উৎপন্ন আপন যাবতীয় শস্যাদির দশমাংশ বাহির করিয়া আনিয়া আপন নগরদ্বারের ভিতরে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে; তাহাতে তোমার সহিত যাহার কোনো অংশ বা অধিকার নাই, সেই লেবীয় এবং বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবা, তোমার নগরদ্বারের মধ্যবর্তী এই সকল লোক আসিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে; এইরূপে যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্মে তোমাকে আশীর্বাদ করেন। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪: ২৮-২৯)

তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশের কোনো নগরদ্বারের ভিতরে যদি তোমার নিকটস্থ কোনো ভ্রাতা দরিদ্র হয়, তবে তুমি তাহার হৃদয় কঠিন করিও না, বা দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি আপন হস্ত রুদ্ধ করিও না; কিন্তু তাহার প্রতি মুক্তহস্ত হইয়া তাহার অভাবজনিত প্রয়োজনানুসারে তাহাকে অবশ্য ঋণ দিও...তুমি তাহাকে অবশ্যই দিবে, দিবার সময়ে হৃদয়ে দুঃখিত হইবে না; কেননা এই কার্যপ্রযুক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সমস্ত কর্মে, এবং তুমি যাহাতে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে, সেই সকলই তোমাকে আশীর্বাদ করিবেন।

কেননা তোমার দেশের মধ্যে দরিদ্রের অভাব হইবে না; অতএব আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি, তুমি আপন দেশে তোমার ভ্রাতার প্রতি, তোমার দুঃখী ও দীনহীনের প্রতি, তোমার হাত অবশ্যই খুলিয়া রাখিবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫: ৭–১১)

তোমার ভ্রাতা হউক, কিম্বা তোমার দেশের নগরদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী হউক, দীনদুঃখী বেতনজীবীর প্রতি উপদ্রব করিবে না। কার্যের দিবসে তাহার বেতন তাহাকে দিবে; সূর্যের অস্তগমন পর্যন্ত তাহা রাখিবে না; কেননা সে দরিদ্র এবং এই বেতনের ওপরে তাহার মন পড়িয়া থাকে; পাছে সে তোমার বিরুদ্ধে সদাপ্রভুকে ডাকে, আর এই বিষয়ে তোমার পাপ হয়। (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৪-১৫)

এমনি আরও অসংখ্য টেক্সট উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এখানে উল্লেখ করা উদাহরণসহ অন্যান্য উদাহরণ ফিলো অফ আলেকজান্দ্রিয়া 'ফিল্যানথ্রপিয়ার' আলোচনায় উল্লেখ করেছেন বা আভাস দিয়েছেন। এইসব টেক্সট মোটের ওপর এটাই তুলে ধরছে যে ইসরায়েলের ঈশ্বর দরিদ্র আর সমাজের অবহেলিতদের রক্ষক এবং তিনি তাঁর জাতিকে এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। এটাই তোরাহ'র মূল কথা এবং যুগে যুগে ইহুদি ফিল্যানথ্রপিক কর্মকাণ্ডের আবশ্যকীয় উৎস। এখানেই আমরা দরিদ্র, গরীব এবং সমাজের অচ্ছুতদের সম্পর্কে গ্রেকো-রোমান দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্যাপক পার্থক্য দেখি। এটা আরও বেশি লক্ষণীয় যে এখানে উদ্ধৃত ছয়টি অনুচ্ছেদের দুটিতেই ইংরেজি টেক্সট 'দরিদ্র' লেখা হয়েছে, সেখানে হিব্রু টেক্সটের গ্রিক অনুবাদে বিশ্লেষণ তোচোসের একটা রূপ রয়েছে যা (উপরে যেমন উল্লেখ করেছি) বৃহত্তর গ্রেকো-রোমান জগতে গ্রিক টেক্সটে দারিদ্র্যের চরম দশা, ভিক্ষাবৃত্তি তুলে ধরে।[২৫]

নিশ্চিতভাবে বলা যায় প্রাচীন ইসরায়েলিরা তোরাহর আরোপিত সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলত না। ফলে পয়গম্বরগণ ইসরায়েলি ও জুদার সমাজে দরিদ্রদের প্রতি আচরণসহ চুক্তির বরখেলাপের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতেন। এভাবে বাইবেলীয় পয়গম্বরদের ভেতর প্রাচীনতম আমোস, যার অরাকলসমূহ লিখিতভাবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে (বিসিই ৮ম শতাব্দী), বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে ইসরায়েলের উত্তর রাজ্যের নেতাদের সমালোচনা করেছেন:

সদাপ্রভু এই কথা কহেন,
ইস্রায়েলের তিনটা অধর্ম প্রযুক্ত ও চারিটা অপ্রযুক্ত
আমি তাহার দণ্ড নির্ধারণ করিব না;
কেননা তাহারা রৌপ্যের বিনিময়ে ধার্মিককে ,
ও একজোড়া পাদুকার বিনিময়ে দরিদ্রকে বিক্রয় করিয়াছে।

তাহারা দীনহীন লোকদের মস্তকে ভূমির ধূলির আকাঙ্ক্ষা করে, ও নম্র লোকদের পথ বক্র করে,

এবং পিতা ও পুত্র এক যুবতীতে গমন করে, যেন আমার পবিত্র নাম অপবিত্র হয়। (আমোস ২:৬–৭)[২৬]

একই শতকের কিছু সময় পরে ইশায়াহ একই ভাষায় জুদাহর দক্ষিণ রাজ্যের নেতাদের নিন্দা

জানিয়েছেন:

সদাপ্রভু বিবাদ করিতে উঠিয়াছেন,

তিনি জাতিগণের বিচার করিতে দাঁড়াইয়াছেন।

সদাপ্রভু আপন প্রজাদের প্রাচীনবর্গকে ও অধ্যক্ষগণকে বিচারে আনিবেন; [বলিবেন]

তোমরাই দ্রাক্ষাক্ষেত্র গ্রাস করিয়াছ, দুঃখী লোক হইতে অপহৃত বস্তু তোমাদের গৃহে আছে।

তোমরা কী জন্য আমার প্রজাদিগকে দলাইতেছ ও দুঃখীদের মুখ ঘষিতেছ?

প্রভু, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, এই কথা কহিতেছেন। (যিশাইয় ৩: ১৩–১৫)।[২৭]

আসলে দরিদ্রদের প্রতি ইসরায়েলের ঈশ্বরের বিশেষ উদ্বেগ গোটা হিব্রু বাইবেলে যেন সুতোর মতো ছড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় মন্দির ও এর পরবর্তীকালের উত্তর বাইবেলীয় কালের ইহুদিবাদে দরিদ্রদের জন্যে বিশেষ করে ফারিসাইক দলের পণ্ডিতদের ভেতর তোরাহর বিধিবিধানসমূহ আর বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়। তাদের হালাকাহ– আইনী শিক্ষা– দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে মিশনাহ সঙ্কলিত হয়। এতে আরও ব্যাখ্যা যোগ করার ফলে সৃষ্টি হয় জেরুজালেম ও বেবিলনিয় তালমুদের। মিশনাহর প্রাসঙ্গিক অধ্যায়গুলো হচ্ছে প্রথম ভাগের নয়টি অধ্যায়ের তিনটি: যেরাই'ম ('বীজ'): পি'আ ('কুড়োনো' আক্ষরিক অর্থে 'কোণ'), লেবীয় ১৯:৯এফ:২৩:২২: দ্বিতীয়. ২৪:১৯-২১; এবং দ্বিতীয় ১৪:২৮এফ; শেবা'ইত ('সপ্তম বছর'), যাত্রাপুস্তক ২৩:১০এফ; লেবীয় ২৫:২-৭, ২০-২; দ্বিতীয় ১৫:১-৩ এবং মা'আসেরত ('এক দশমাংশ'), গণনা পুস্তক ১৮: ২১; লেবীয় ১৮:২৬; দ্বিতীয় ১৪:২২এফএফ; দ্বিতীয় ১৪:২৮এফএফ; ২৬:১২- এর নির্দেশনার সম্প্রসারণ।

'শস্য কুড়োনো'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনার বিস্তার আর নির্দেশকরণের একটা ধরনের উদাহরণ এমন:

একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাত্রাকারী কোনও দরিদ্র ব্যক্তিকে এক পন্দিওনের [গমের দাম থেকে] চেয়ে কম দামের রুটি দেওয়া যাইবে না, চার সিআহর জন্য এক সেলো। সে যদি [এমন এক স্থানে] রাত্রি যাপন করে তাহাকে রাত্রির জন্য তাহার যাহা যাহা প্রয়োজন তাহাই দিতে হইবে। সে সাব্বাথের সময় অবস্থান

করিলে তাহাকে তিনবেলা খাদ্য গ্রহণ করিবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য দিতে হইবে। কোনও ব্যক্তির দুই বেলা খাইবার মতো যথেষ্ট খাদ্য থাকিলে তাহার [দরিদ্রের] ভাণ্ডার হইতে নেয়া উচিত হইবে না। [দরিদ্রের] ভাণ্ডার দুইজনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় এবং তিনজনের মাধ্যমে বণ্টন করা হয়। (এম. পি'য়া ৮.৭)[২৮]

এই অনুচ্ছেদ গ্রাম্য এবং শহুরে জীবন আর খাবার আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের ব্যবস্থা তুলে ধরে কৃষিপ্রধান প্রেক্ষাপট থেকে সামাাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। এখানে সিনাগগের কর্মকর্তাদের 'দরিদ্র ভাণ্ডার' দেখাশোনা করার ব্যাপার জড়িত রয়েছে।[২৯] অন্য কথায় প্রাথমিক ইহুদিবাদ তহবিল সংগ্রহ ও বণ্টনের একটা বিস্তারিত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল যার সুবিধাভোগী ছিল প্রধানত দরিদ্র আর অভাবীরা, কেবল স্থানীয়রাই নয়, বরং আগন্তুকরাও।

ব্যক্তিগত পর্যায়েও ইহুদিদের দরিদ্রদের দান অর্থাৎ ভিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। দান আর ভিক্ষা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে সেদাকাহ্, আক্ষরিকভাবে যার অর্থ 'ন্যায়পরায়ণতা' বা 'বিচার'। এই ব্যবহার দরিদ্রদের দিক হতে বিশেষ কিছু অধিকার আবার স্বচ্ছলদের দিক হতে সমান দায়িত্বের কথা বোঝায়।[৩০]

ব্যক্তিগত পর্যায়ে দান করা এবং সাদাকাহ শব্দের ব্যবহার বাইবেল-উত্তর সাহিত্যে প্রতিফলিত যা তুলনামূলকভাবে পরবর্তীকালের সংযোজন। ইয়েশু'য়া বেন সিরা (বিসিই দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে) তাঁর বহুল পঠিত তবে, জ্ঞানের অনুমোদিত গ্রন্থ না হলেও বিভিন্নভাবে গির্জাসংশিষ্ট বা সিরক[৩১] নামে পরিচিত গ্রন্থে দান সম্পর্কে বলছেন, 'প্রবল আগুনে যেমন পানি শুকিয়ে যায়, তেমনি দান পাপের বিনাশ ঘটায়।' (সির ৩:৩০)[৩২]

বেন সিরা ৪:১-১০-এ বর্ণিত এই ধারণাকেই আরও বিস্তৃত করেছেন। একইভাবে তোবিত গ্রন্থের রচয়িতা (বিসিই তৃতীয় শতক) নিচের উপদেশ দিচ্ছেন:

দান মৃত্যু থেকে রক্ষা করে আর তোমাকে অন্ধকারে পতন থেকে বাঁচায়। প্রকৃতপক্ষেই যারা চর্চা করে তাদের সকলের জন্য পরম পবিত্রের সত্তার প্রতি এক অসাধারণ উৎসর্গ। (তোবিত ৪: ১০-১১)[৩৩]

আদি ইহুদি সাহিত্যে দানকে প্রায়শই সর্বোচ্চ ইহুদি গুণ 'প্রেমময় দয়ার কর্ম' (জেমিরুত হাসাদিম)-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হত। এভাবে:

দান আর প্রেমময় দয়ার কর্ম আইনের সকল নির্দেশনার সমান। দান জীবিতদের উদ্দেশে পালন করা হয়; জীবিত ও মৃতদের উদ্দেশে প্রেমময় দয়াকর্ম; দরিদ্রদের প্রতি দান; দরিদ্র ও ধনীদের প্রতি প্রেমময় দয়াকর্ম; দান কারও অর্থ দিয়ে করা যায়, প্রেমময় দয়াকর্ম টাকা দিয়ে বা ব্যক্তিগতভাবে করা যেতে পারে।[৩৪]

সিমওন দ্য জাস্টকে মিশনাহর অন্যতম নিবন্ধ পিরকে অ্যবথ-এ ('দ্য সেইং অভ দ্য ফাদারস') উদ্ধৃত করা হয়েছে: 'তিনটি জিনিসের উপর এই জগত টিকে আছে: তোরাহ্, স্বর্গীয় সেবা আর প্রেমময় দয়ার কর্ম ।'[৩৫]

ফিল্যানথ্রপির ইহুদি উৎস সম্পর্কিত এই আলোচনা শেষ করার আগে ইহুদিবাদকে গ্রেকো-রোমান বিশ্বের (আদি ক্রিশ্চানধর্ম বাদে) অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদাকারী ভিন্ন একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে চাই: দারিদ্র্যের অতি-মূল্যায়ন এবং তার পাশাপাশি বিশেষ কিছু ইহুদি ও ইহুদি গ্রুপের ভেতর দ্বিতীয় মন্দির আমলে দারিদ্র্যকে আত্মমর্যাদা বোধের পরিচায়ক বলে ধরে নেওয়া। বর্তমানে ডেড-সী স্ক্রোলস নামে পরিচিত খিরবেত কামরানের ১১টি গুহায় পাওয়া দলিলে এসীনরা এই নজীর তুলে ধরেছে।[৩৬] কামরান থ্যাংকস গিভিং হাইমের লেখক নিজেকে এবং নিজের সমাজকে 'দরিদ্র' বলে উল্লেখ করছেন আর তাঁকে ও তাঁর সমাজকে শত্রুর বৈরী আচরণ থেকে রক্ষা করার জন্যে ঈশ্বরের প্রশংসা করছেন, জেরুজালেমের পুরোহিত সমাজকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। একইভাবে হাবাক্কুক গ্রন্থের ধারাভাষ্যে (১ কিউপিহাব) হাবাক্কুক ২:৭-এ সহিংসতা সম্পর্কে পয়গম্বরের বর্ণনা 'দরিদ্রের' প্রতি 'দুষ্ট যাজকদের' বৈরী আচরণ উল্লেখসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে=কামারান এসীন (১কিউপিহাব ১২ ৩,৬,১০)।

কামরানে আত্মমর্যাদার পরিচায়ক হিসাবে দারিদ্র্যের ভাষার এই আত্মীকরণের সঙ্গে ওই সমাজের গঠনের সম্পর্ক থাকতে পারে, কেননা সমাজের প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব ছিল ব্যক্তিগত সম্পদ সমাজের প্রশাসনের কাছে ন্যস্ত করা (আইকিউএস ৪)। এভাবে এই কামরান সম্প্রদায়কে তৃতীয় শতকের পর থেকে মিশর ও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ক্রিশ্চান মঠচারী সমাজের পূর্বসূরি বলা যেতে পারে ।

প্রাচীনকালের লেখকরা এসীনদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের একজন হলেন ফিলো অফ আলেকজান্দ্রিয়া। গ্রামবাসী এসীনদের কথা বলেছেন তিনি (কামরান সম্প্রদায় যাদের নেতৃত্বের উৎস ছিল): 'তারা সৌভাগ্যের অভাবের জন্যে নয় বরং স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে নেয়ার ভেতর দিয়ে বলতে গেলে গোটা মানবজাতির ভেতর একক হয়ে[৩৭] উঠেছিল।'

ঘরের কাছেরই আরেকটা গ্রুপ, থেরাপিউটদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলার ছিল ফিলোর। আলেকজান্দ্রিয়ার পশ্চিমে লেক মেরাওতিস আর ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী একচিলতে জমিনে বাস করত এরা, কৌমার্যব্রত পালনকারী এক ধরনের মঠচারী জীবন যাপন করত; যার যার সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, উপাসনা আর ধ্যানে মগ্ন ছিল এরা। ফিলো তাঁর অন দ্য কনটেম্প্লেটিভ লাইফ-এ এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।[৩৮]

এগুলো অবশ্যই ব্যতিক্রমী ঘটনা। সাধারণভাবে ইহুদিরা সম্পদকে ঘৃণা করত না। আমাদের উৎস সম্পদশালী ইহুদি ব্যক্তি, পরিবার আর প্রতিষ্ঠাকে প্রচুর প্রমাণ তুলে ধরে। তবে সম্পদ সংক্রান্ত ইহুদি আইন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সকল ইহুদির দায়িত্বে প্রোথিত এর উপযুক্ত ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব

আরোপ যাতে সতীর্থ মানবসন্তানের সঙ্গে আচরণে ঈশ্বরের করুণা আর 'প্রেমময় দয়া' (কিংবা 'অটল ভালোবাসা', হিব্রু: হেসেদ) প্রকাশ পায়।

ফিল্যানথ্রপির ক্রিশ্চান উৎস

শুরুতেই গুরুত্ব দেয়া দরকার যে ক্রিশ্চান ফিল্যানথ্রপির প্রাথমিক ধর্মীয় ভিত্তি এবং সম্পদ ও দারিদ্র্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদি প্রবণতার মতোই ছিল। এর কারণ খুবই সাধারণ: গোড়ার দিকের সব ক্রিশ্চানই ছিল ইহুদি; রোমান ক্রুসে মৃত্যুদণ্ডে ইহুদি গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। চার্চ পবিত্র ভূমির সীমানা পেরিয়ে ডায়াসপোরার ইহুদি সম্প্রদায়ের ভেতর প্রসার লাভ করে এবং অচিরেই এর 'হাউস চার্চে'জেন্টাইলদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। জেরুজালেম মন্দিরের ধ্বংস শেষ পর্যন্ত ইহুদিদের দিক থেকে ফারিসাইক দল কর্তৃক উদ্ভাবিত 'নরম্যাটিভ' বা 'বাব্বিনিক' ইহুদিবাদ গড়ে ওঠায় রূপ নেয়। ক্রিশ্চান তরফে ইহুদি ম্যাট্রিক্স থেকে ধর্মান্তরিত ইহুদি আর জেন্টাইলদের সমন্বয়ে গঠিত চার্চের বিচ্ছিন্নতা ত্বরান্বিত হয়। ইহুদিবাদের সঙ্গে জাতিগত সম্পর্ক আর রোমান আইনের অধীনে আইনী প্রতিরক্ষা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেকো-রোমান পরিবেশের সাথে চার্চের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রোমান আইন ইহুদিদের (এবং তুলনামূলক জাতিগত সম্প্রদায়সমূহকে) পূর্বপুরুষের প্রথা অনুযায়ী জীবনযাপনে উৎসাহ যুগিয়েছে। ক্রিশ্চানদের সেই জাতিগত পরিচয়ের অভাব ছিল। যদিও তারা ইহুদি স্ক্রিপ্চার প্রতীকীভাবে সেটা বজায় রেখেছিল। এইসব স্ক্রিপ্চার ক্রিশ্চান দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত 'নিউ টেস্টামেন্ট' অনুশাসনে পরিশীলিত হয়েছে।

আমাদের হাতের অধিকাংশ ক্রিশ্চান রচনা গ্রিক ভাষায় ধরে রাখা ছিল, এর বেশীরভাগ অংশই এখন নিউ টেস্টামেন্ট গড়ে তুলেছে।[৩৯] 'ফিল্যানথ্রপি' কথাটা নিউ টেস্টামেন্টে দুবার স্থান পেয়েছে: একবার রোমে যাবার পথে জাহাজডুবির পরে মাল্টার অধিবাসীদের পল আর তার সহচরদের প্রতি দেখানো দয়ার কথা বোঝাতে।[৪০] অন্য উল্লেখটি করা হয়েছে ত্রাতা হিসাবে জেসাস ক্রাইস্টকে পাঠানোয় ঈশ্বরের দয়া বোঝাতে (কার্যাবলী ২৮:২)। উভয় ক্ষেত্রেই শব্দটির অর্থ ইতিমধ্যে আলোচিত পেগান ও ইহুদি বিষয়বস্তুতে পেয়েছি। আদি ক্রিশ্চান সাহিত্যে এই শব্দটি তেমন একটা উল্লেখ পায়নি। তবে তৃতীয় শতকে ঈশ্বর, জেসাস ক্রাইস্ট আর ক্রিশ্চানদের আচরণ বোঝাতে ক্লিমেন্ট অফ আলেকজান্দ্রিয়া এবং অরিগেনের আবির্ভাবের পর অধিক হারে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪১] সম্পদ এবং দারিদ্র্যের প্রতি আদি ক্রিশ্চান দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদিদের মতোই ছিল এবং তা দরিদ্রদের রক্ষক হিসাবে ঈশ্বরকে দেখার প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিনির্ভর ছিল (উপরে আলোচিত)। নাযারথের জেসাসের শিক্ষাকে এই ইহুদি দৃষ্টিভঙ্গির এক চরম, প্রকৃতপক্ষে রেডিকাল দিক বলা যেতে পারে। তাঁর শিক্ষা নিউ টেস্টামেন্ট গস্পেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যদিও অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ইভাঞ্জেলিস্টরা তার পুনর্তরজমা করেছেন।

এভাবে বিখ্যাত 'স্বর্গসুখে' জেসাসকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে তিনি সবার আগে দরিদ্রের আশীর্বাদের

কথা বলছেন। ল্যুকের ভাষ্য সম্ভবত জেসাসের মূল ঘোষণার কাছাকাছি একটা কিছু ধারণ করে:

.তিনি আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,
ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।
ধন্য তোমরা, যাহারা এক্ষণে ক্ষুধিত,
কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হইবে। (ল্যুক ৬: ২০-২১)[৪২]

এইসব তোষামোদ 'বিলাপ'-এর ঘোষণা দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখেছেন ল্যুক:

কিন্তু ধিক তোমাদিগকে, হা ধনবানেরা,
কারণ তোমরা আপনাদের সান্ত্বনা পাইয়াছ।
ধিক তোমাদিগকে, যাহারা এক্ষণে পরিতৃপ্ত, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হইবে;
ধিক তোমাদিগকে, যাহারা এক্ষণে হাস্য কর, কারণ তোমরা বিলাপ ও রোদন করিবে।

ম্যাথুর ভাষ্যে, 'সারমন অন দ্য মাউন্টে' জেসাসের রেডিকাল বক্তব্য অনেকটা 'কোমল করা' হয়েছে:

ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।
ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। (ম্যাথু ৫: ৩,৬)।

ম্যাথু 'দারিদ্র্যের' অধিকতর সাধারণ ইহুদি আদর্শ তুলে ধরতে দরিদ্রদের ওপর স্বর্গসুখকে 'আধ্যাত্মিকতা'

দিয়েছেন[৪৩], ধার্মিকতার জন্যে আধ্যাত্মিক 'ক্ষুধা'কে বোঝাতে ক্ষুধার সৌন্দর্যকে বুঝিয়েছেন। তিনি

ধনীদের দুর্দশাকেও বাদ দিয়েছেন।

সম্পদ আর দারিদ্র্য সম্পর্কে উট আর সুঁই নিয়ে জেসাসের আরেকটি রেডিকাল বক্তব্য তিনটি সিনোপটিক

গস্পেলের সব কয়টিতেই পাওয়া যায় [ল্যুক ১৮: ২৪এফ] [মার্ক ১০:২৩-২৫] [ম্যাথু ১৯: ২৩-২৪]।

আমি ল্যুকের ভাষ্য উদ্ধৃত করছি:

যাহাদের ধন আছে তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! বাস্তবিক ঈশ্বরের রাজ্যে

ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের প্রবেশ করা সহজ।

আমার মতে সম্পাদকীয় 'নমনীয়করণের' আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় নিচে:

যাহারা শুনিল, তাহারা বলিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? তিনি কহিলেন, যাহা মনুষ্যের অসাধ্য,
তাহা ঈশ্বরের সাধ্য (ল্যুক ১৮: ২৬-২৭)।

সুঁই আর উট সম্পর্কে জেসাসের মন্তব্যটি এসেছে এক তরুণ সম্পদশালীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনার ঠিক
পরপরই। এটাও তিনটি সিনোপটিক গস্পেলেই পাওয়া যায় [ম্যাথু ১৯: ১৬-২২] [মার্ক ১০: ১৭-২২]
[ল্যুক ১৮: ১৮-২৩]। তরুণ জেসাসের কাছে জানতে চাইছে কেমন করে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী
হবে। টেন কমান্ডমেন্টস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে উত্তর দিয়েছেন জেসাস। তরুণ বলছে একেবারে ছোটবেলা
থেকেই সে এসব মেনে আসছে। জেসাসের শেষ বক্তব্য (ল্যুকের ভাষ্যে) বেশ কঠোর:
এখনও এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে; তোমার যাহা কিছু আছে, সমস্ত কিছু বিক্রয় কর, আর
দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে স্থান পাইবে, আমার পশ্চাদগামী হও।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে অক্ষম তরুণ বিদায় নিল। জেসাসের চ্যালেঞ্জ ভিন্ন এক বাণীতে সারসংক্ষেপ
করা হয়েছে।

কোনো ভৃত্য দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না, কেননা সে হয় একজনকে ঘৃণা করিবে, অন্যকে প্রেম
করিবে, নয়ত একজনে অনুরক্ত হইবে, অন্যকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব
করিতে পার না। (ল্যুক ১৬: ১৩)

এখানে গস্পেলসমূহের গ্রিক অনুবাদে ‘ধন’ বা ‘সম্পদে’র আরামীয় শব্দ অননূদিত রেখে দেওয়া হয়েছে

যাতে বাণীর গুরুত্ব অবিকৃত থাকে: সম্পদের প্রতি আসক্তি এক ধরনের বহুঈশ্বরবাদীতা ।[৪৪]

সম্পদের প্রতি জেসাসের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নিজস্ব জীবনধারায় প্রদর্শিত হয়েছে । তাঁর পারিবারিক পটভূমি–একজন কারুশিল্পীর বাড়িতে বেড়ে উঠেছেন তিনি–অবশ্যই নিদারুণ অভাবের ছিল না । তারপরেও গস্পেল ট্র্যাডিশনসমূহে ঈশ্বরের রাজ্যের এক ভবঘুরে পয়গম্বর হিসাবে তাঁকে দেখতে পাই আমরা, যার নিজের কোনও ঘর বা সম্পত্তি নেই । একবার তাঁর অনুসারী হতে ইচ্ছুক এক ব্যক্তিকে তিনি বলেছিলেন, ‘শৃগালদের গর্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষীগণের ডানা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই ।’ [ম্যাথু ৮: ২০] [ল্যুক ৯: ৫৮] [গস্পেল অভ টমাস] ।

তাঁর একান্ত শিষ্যরা এই অবস্থান মেনে নিয়েছেন বলে মনে হয় । এক পর্যায়ে পিটারকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ‘দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাদগামী হইয়াছি,’ [ম্যাথু ১৯: ২৭] [ল্যুক ১৮: ২৮: ‘দেখুন আমরা যাহা যাহা নিজের, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাদগামী হইয়াছি ।’] । জেসাসের জবাব তাকে আশ্বস্ত করছে যে ‘এমন কেহ নাই যে ঈশ্বরের রাজ্যের নিমিত্তে বাটী কি স্ত্রী কি ভ্রাতৃগণ কি পিতামাতা কি সন্তানসন্ততি ত্যাগ করিলে ইহকালে তাহার বহুগুণ এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন না পাইবে ।’[ল্যুক ১৮: ২৯-৩০] [ম্যাথু ১৯: ৩০] [মার্ক ২০: ২৮-৩০] । এরপর ম্যাথু আর মার্কের ভাষ্যে একটি প্রায়শ উদ্ধৃত বাণী যোগ করেছে, ‘কিন্তু যাহারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়িবে, ও যাহারা শেষের তাহারা প্রথমে পড়িবে ।’ [ম্যাথু ১৯: ৩০] [মার্ক ১০: ৩১] ।

এমনি চরমপন্থী শিক্ষার পেছনে ভিত্তি কী? ইতিমধ্যে উল্লেখিত উদাহরণে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এর সঙ্গে কোনওভাবে ‘ঈশ্বরের রাজ্যের’ সম্পর্ক আছে । জেসাস মনে করেছেন ইহুদিদের বহু প্রত্যাশিত ঈশ্বরের শাসন সমাগত এবং নিজেকে তিনি এর উদ্বোধনের একজন এজেন্ট বিবেচনা করেছেন । ঈশ্বরের রাজ্যের পটভূমিতে সহায় সম্পদ এমনকি পরিবারের গুরুত্ব দ্বিতীয় পর্যায়ে নেমে গেছে । কেবল প্রয়োজন এমন একটা জীবনধারা বেছে নেওয়া যা ঈশ্বরের শাসনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ।

গস্পেল বিবরণসমূহে কিছু স্ববিরোধিতা রয়েছে; সম্পদের প্রতি জেসাসের নিন্দাবাদ সম্পদশালীদের আতিথেয়তা গ্রহণ থেকে তাঁকে বিরত রাখেনি । প্রকৃতপক্ষে ভবঘুরে ক্যারিশম্যাটিক পয়গম্বর হিসাবে তিনি ঘরবাড়ি আর সম্পদশালী লোকদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন ।[৪৫] ক্যাপানিমামের পিটারের বাড়িটি এক অর্থে তাঁর মিনিস্ট্রির এক ধরনের হোমবেস ছিল বলে মনে হয় । এখানে তিনি এবং তাঁর শিষ্যগণ সময়ে সময়ে যাত্রা শেষে ফিরে আসতেন । একবার এখানে জেসাস পিটারের শাশুড়িকে জ্বর থেকে সারিয়ে তুলেছিলেন বলে উল্লেখ আছে । (মার্ক ১: ৩০ এফএফ) ।

এভাবে সম্পত্তি বিক্রি করে তা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, এমনকি জেসাসের নিজের চরমপন্থী বাণীতেও না। আসলে প্রয়োজন সম্পদ থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা আর ঈশ্বরের প্রতি সংশ্লিষ্টতা যা ঈশ্বরের ধার্মিক শাসনের প্রত্যাশায় দরিদ্রদের অবস্থা উন্নত করে তুলবে; বর্তমান অবস্থা তখন একেবারে বদলে যাবে।

জেসাস ঈশ্বরের রাজ্যের আসন্ন আবির্ভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু আসলে যা এসেছিল তা হল জেসাসের মৃত্যুর পর সংগঠিত চার্চ আর 'প্রভুর'(জেসাস) 'সভা'র (একলেসিয়া) পুনরুত্থান–ইসরায়েলের জমায়েতের বাইবেলীয় পরিভাষা থেকে নেয়া নাম।[৪৬] আদি ক্রিশ্চান বিভিন্ন দলের ভেতর জেসাসের বিভিন্ন বাণী আর কর্ম স্মরণ এবং হস্তান্তর করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত লিখিত দলিল হিসাবে সম্পাদিত হয়েছে। আমাদের ইতিমধ্যে আলোচিত জেসাসের চরমপন্থী ঘোষণার 'নমনীয়করণ' এই প্রক্রিয়ারই অংশ।

জেরুজালেমের আদি চার্চের সঙ্গে কামরান সম্প্রদায়ের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে (উপরে আলোচিত)। প্রেরিতদের কার্যে উল্লেখিত বিবরণ অবশ্যই আদর্শায়িত বিষয় হতে পারে, তবে এখানে ঐতিহাসিক সারবস্তু আছে হয়তোঃ

> আর যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সাধারণের রাখিত; আর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করিয়া, যাহার যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে সকলকে অংশ করিয়া দিত। আর তাহারা প্রতিদিন একাগ্রচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটীতে রুটি ভাঙিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত; তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত, এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হইল। (প্রেরিতদের কার্যাবলী ২: ৪৪-৪৭)

> আর যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা একচিত্ত ও একপ্রাণ ছিল; তাহাদের একজনও আপন সম্পত্তির মধ্যে কিছুই নিজের বলিত না; কিন্তু তাহাদের সকল বিষয় সাধারণে থাকিত। আর প্রেরিতরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন, এবং তাহাদের সকলের উপরে মহা অনুতপ্ত ছিল। এমনকি, তাহাদের মধ্যে কেহই দীনহীন ছিল না; কারণ যাহারা ভূমির অথবা বাটীর অধিকারী ছিল, তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়া, বিক্রিত সম্পত্তির মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিত; পরে যাহার যেমন প্রয়োজন, তাহাকে তেমনি দেওয়া হত। (প্রেরিতদের কার্যাবলী ৪: ৩২-৩৫)।

বার জনের একটি কাউন্সিল কর্তৃক পণ্যদ্রব্যের দেখভাল করার ব্যবস্থা কামরান সম্প্রদায়ের পরিবেশের স্মৃতিবাহী। কার্যাবলীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে জেরুজালেমের গ্রিকভাষী সিনাগগ থেকে আগত নবাগতদের মাঝে খাদ্য বণ্টন সম্প্রসারিত করা হয়েছে যাদের চাহিদা দেখাশোনার জন্যে সাত সদস্যের একটি

সমিতি ছিল। (কার্যাবলী ৬:১-৬)। 'হেলেনিস্টিক' (গ্রিকভাষী) নামে পরিচিত পরের দলটি মন্দির প্রশাসনের সন্দেহের নজরে পড়ে জেরুজালেম ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল (কার্যাবলী ৮:১)। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক একটা অংশ পিটার ও বাকি বারজনের নেতৃত্বে সিরিয়ার অ্যান্টিওকে হাজির হয়। শেষ পর্যন্ত সম্ভবত চল্লিশ দশকের গোড়ার দিক থেকে জেরুজালেম চার্চের নেতৃত্ব জেসাসের আপন ভাই জেমস ('জ্যাকব')-এর হাতে বর্তে।

জেরুজালেম চার্চে পণ্যের সাধারণ মালিকানা কতদিন স্থায়ী হয়েছিল বলা মুশকিল। সম্ভবত বেশি দিন টেকেনি। এর সাথে জেসাসের পারলৌকিক শিক্ষার সঙ্গে মানানসই পারলৌকিক মাত্রা সম্পর্কিত ছিল হয়তো। আদি ক্রিশ্চানরা মহিমান্বিত 'মনুষ্যপুত্র' হিসাবে স্বর্গের মেঘসহ জেসাসের আশু আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছিল। (ড্যানিয়েল ৭: ৯-১১)। গস্পেল ট্র্যাডিশনে এই জাতীয় বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে দেখুন ম্যাথু ১৬: ২৮:

> যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যাহারা কোনোমতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে আপনার রাজ্যে আসিতে না দেখিবে।

মার্ক ৯:১ এর সমান্তরাল বক্তব্য দিচ্ছে, যা জেসাসের ঘোষণার অনেক বেশি মূল ভাষ্য, 'যে পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সহিত আসিতে না দেখে।'

ক্রাইস্টের আসন্ন প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস শিষ্য পল গ্রহণ করেছিলেন (১ থেস ৪-৫; করিন্থ ১৫, ইত্যাদি)। এটা তাঁর মিশনের চালিকাশক্তি ছিল। তবে খানিক সময়ের জন্যে জেরুজালেম চার্চে ফিরে যাওয়া যাক: অতি উদারতার কারণে সৃষ্ট একধরনের অর্থনৈতিক চাপের কথা বলা হয়েছে আমাদের যা নিশ্চিতভাবে ক্লডিয়াসের সময় প্যালেস্টাইনে এক দুর্ভিক্ষের কারণে আরও খারাপ হয়ে উঠেছিল। (সম্ভবত সিএ. ৪৮ সিই-কার্যাবলী ১১:২৮)। বার্নাবাস এবং সল-এর('পল' নামেও পরিচিত- দেখুন কার্যাবলী ১১: ২৯) মারফত অ্যান্টিওক চার্চ থেকে পাঠানো ত্রাণ তাদের দুরবস্থার অবসান ঘটায়।

পরে শিষ্য পল জেরুজালেমের জেমস-এর সঙ্গে কোনও ধরনের সমঝোতার মাধ্যমে এশিয়া মাইনর আর গ্রিসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত চার্চসমূহ হতে তহবিল সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন। অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল জেরুজালেমের 'দরিদ্রদের' জন্যে (গ্যালাতীয় ২:১০; সিএফ। ১কর ১৬:১-৪; ২ কর ৮-৯; রম ১৫:২৫-২৯)। এই 'দরিদ্র' কথাটি সম্ভবত জেরুজালেম চার্চের স্ব-মর্যাদা বোঝানো হয়েছে (হিব্রু 'ইবোইনিম') যা আমাদের আবার কামরান সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেকটি মিলের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা স্মরণ করতে পারি, এই সম্প্রদায়টি একই রকম স্ব-মর্যাদা গ্রহণ করেছিল। এই ব্যবহার চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল এবং পরে ইহুদি ক্রিশ্চানদের বিশেষ কয়েকটি গ্রুপের ভেতর অব্যাহত থাকে যেমনটা আমরা তাদের

গোত্রের 'ইবিওনাইট' নামের ভেতর দেখতে পাই। অবশ্যই সেই সময় নাগাদ জেন্টাইল প্রভাবিত চার্চ এইসব ইহুদি ক্রিশ্চান গ্রুপগুলোকে 'ধর্মদ্রোহী' হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল।[৪৭]

আদি চার্চের সংগঠিত চ্যারিটির বিকাশের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।[৪৮] আমরা দ্বিতীয় শতাব্দীর পরিস্থিতি সম্পর্কে সারাংশের জন্যে ক্রিশ্চান দার্শনিক অ্যারিস্তাইদের উল্লেখ করতে পারি। সম্রাট হাদ্রিয়ানের (সিএ. ১২৫) উদ্দেশে ক্রিশ্চানিটির সপক্ষে ক্রিশ্চানদের রেওয়াজ আর প্রবণতা সম্পর্কে নিচের বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি:

> ...তারা বিনয় আর দয়া নিয়ে চলে, তাদের মাঝে মিথ্যাচার দেখা যায় না, পরস্পরকে তারা ভালোবাসে:তারা জানালা থেকে ফিরে যায় না, তারা অত্যাচারীর হাত থেকে এতিমকে রক্ষা করে: কোনও বিদ্বেষ ছাড়াই তাকে যে কিছু দেয় বা দেয় না: আর যখন তারা কোনও আগন্তুককে দেখে, তাকে নিজেদের আবাসে নিয়ে আসে আর নিজের ভাইয়ের মতোই তাকে নিয়ে আনন্দ করে; কারণ ছাড়া মাংসের পিছনে ঘুরে তাদের ভাই বলে ডাকে না, কিন্তু তাদের ভাই বলে চেতনায় ও ঈশ্বরের সন্ধান করে: তবে যখন তাদের কোনও দরিদ্র মারা যায়, তাদের কেউ দেখলে তখন তার সাধ্যমতো তার কবরের ব্যবস্থা করে; এবং তারা যদি শোনে তাদের কোনও সদস্য তাদের মেসায়াহর নামে বন্দী হয়েছে বা নিপীড়িত হয়েছে তখন তারা সবাই মিলে তার প্রয়োজন মেটায়, আর সম্ভব হলে তাকে মুক্ত করে। এবং তাদের ভেতর যদি এমন কোনও লোক থাকে যে অভাবী বা দরিদ্র, তাদের কাছে যদি প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পণ্য না থাকে তারা তখন দুই বা তিনদিন উপবাস পালন করে যাতে অভাবীকে প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করতে পারে।[৪৯]

এটা অবশ্যই স্পষ্ট যে নাযারেথের জেসাসের পারলৌকিক নির্দেশনা সাধারণভাবে চার্চে বজায় রাখা সম্ভব ছিল না, যদিও তৃতীয় শতাব্দীতে মনাস্টিসিজমের উত্থান অন্তত অংশত এই ট্র্যাডিশনে প্রোথিত ছিল।

সম্পদশালী ক্রিশ্চানরা কীভাবে ক্রাইস্টের নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিত তার একটা কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ উঠে এসেছে ক্লিমেন্ট অফ আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মকথা হু ইজ দ্য রিচ ম্যান দ্যাট শ্যাল বী সেভড?-এ[৫০] ক্লিমেন্টের নিজস্ব চার্চ ছিল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ধনী, তিনি ধনী তরুণ, জেসাস এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে সারমন রচনা করে সরাসরি বিষয়টির মোকবিলা করেছেন (মার্ক ১০:১৭-৩১, উপরে আলোচিত)। ক্লিমেন্ট বাণীর সত্যতা স্বীকার করে শুরু করেছেন, "মানুষের জন্য যাহা অসম্ভব তাহা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব" (মার্ক ১০: ২৭-কিউডি ২)। কোনও ধনী ব্যক্তি যতক্ষণ ঈশ্বরের ফিল্যানথ্রপিতে (ফিল্যানথ্রপিয়া) বিশ্বাস করছে (কিউডি ৩) ততক্ষণ কেবল ধনী হওয়ার কারণে নিজেকে মুক্তি লাভের অযোগ্য মনে করতে পারে না। ক্লিমেন্ট এরপর সম্পূর্ণ টেক্সট উদ্ধৃত করে (কিউডি ৪)

এর পরপরই ত্রাতার বক্তব্য 'দৈহিক' অর্থাৎ আক্ষরিকভাবে না নিতে জোরালো অনুরোধ করেছেন, বরং "সেগুলোর অন্তঃস্থ অর্থ বোঝার কথা বলেছেন" (কিউডি ৫)। এরপর ক্লিমেন্ট প্রাধান্য বিস্তারকারী দর্শন গড়ে তুলেছেন। ধনীদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। আসলে যা বাতিল করার সেটাকে আত্মা থেকেই করতে হবে, যেমন, সম্পদ সম্পর্কে বেঠিক ধারণা (কিউডি ১৪)। যে ধনী ব্যক্তি ভাইয়ের কারণে ঈশ্বরের সম্পদ আর উপহার ধারণ করে সে প্রকৃতপক্ষে 'আত্মায় দীন' হিসাবে প্রভুর আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং স্বর্গরাজ্যের একজন উত্তরাধিকারী (কিউডি ১৬)। স্ক্রিপ্চার থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে এরপর এই ধারণাকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

একই ধরনের যুক্তির দেখা মেলে ক্লিমেন্ট, পিটার ১-এর আনুমানিক এক শতাব্দী পরের বিশপ অফ আলেকজান্দ্রিয়ার রচনা বলে কথিত ধর্মকথা অন রিচেস-এ । ৩০০-৩১১ পর্যন্ত বিশপ ছিলেন তিনি এবং ৩০৩ সিই-তে দিয়োক্লিতিয়ান সূচিত ক্রিশ্চানবিরোধী অভিযানের শেষের দিকের শহীদ ছিলেন। তাঁর ধর্মকথা[৫১]র দুটি মূল অংশ রয়েছে: ধনীদের উদ্দেশে সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ওপর একটি বক্তব্য (অনু. ১৪-৫৪), এবং ধনীদের সম্পদকে ঈর্ষা না করে বরং অহিংসভাবে নিজেদের অবস্থা মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে দরিদ্রদের উদ্দেশে একই রকম আহবান (অনু ৫৫-৬৯)। ওল্ড টেস্টামেন্টে ধনীদের সম্পদের উদার ব্যবহারের নজীর তুলে ধরা হয়েছে; এদের ভেতর আছেন সলোমোন, জব, আব্রাহাম এবং ডেভিড। এই ধর্মকথার কিছু কিছু উক্তি আর ব্যাখ্যা ক্লিমেন্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; সম্ভবত তা পূর্ববর্তী আলেকজান্দ্রিয়ারের রচনার কিছু জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

৩১৩ সালে কন্সট্যান্টাইনের সহিষ্ণুতার আইন চালু হওয়ার পর–যা ক্রিশ্চান সাম্রাজ্যের সূচনা চিহ্নিত করে–অভাবীদের সহযোগিতা দেয়ার চার্চের উন্নত ব্যবস্থা চার্চের রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় আরও জোরালো হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের গোটা খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাই চার্চ এবং ধর্মীয় নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরাই পরে রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হন।[৫২]

কন্সট্যান্টাইনের পর চতুর্থ শতকের সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অবশ্য একটি পেগান বিরতি ছিল: জুলিয়ান 'দ্য অ্যাপোস্ট্যাট'-এর শাসনামল (৩৬০–৩৬৩)। তিনি পেগানবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসের অংশ হিসাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেগান পুরোহিতদের লজ্জা দিতে ঘৃণিত ক্রিশ্চানদের ফিল্যানথ্রপিক চর্চা কাজে লাগিয়েছিলেন। এইসব পুরোহিতদের কাছে লেখা চিঠিতে তাঁর এই নীতি ফুটে উঠেছে। এসব চিঠিতে তিনি বারবার 'ফিল্যানথ্রপিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ গালাতিয়া প্রদেশের প্রধান পুরোহিত আর্সেসিয়াসকে লেখা চিঠিতে জুলিয়ান লিখছেন,

> আমরা কেন লক্ষ করি না যে আগন্তুকদের তাদের [ক্রিশ্চানদের] উদারতা (ফিল্যানথ্রপিয়া), মৃতদের কবরের যত্ন, আর তাদের পবিত্র জীবন যাপনের ভান, নাস্তিকতা [অর্থাৎ ক্রিশ্চানিটি] প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে?...প্রত্যেক শহরে

অনেক হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে আগন্তুকরা আমাদের উদারতা (ফিল্যানথ্রপিয়াস) থেকে মুনাফা লুটতে পারে; আমি কেবল আমাদের লোকদের কথা বোঝাতে চাইছি না, বরং যাদের টাকা-পয়সার প্রয়োজন আছে তাদের কথাও বোঝাচ্ছি।[৫৩]

জুলিয়ান এইসব নতুন প্রয়াসকে পেগান মন্দির ও পুরোহিত সমাজকে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে অর্থ বণ্টন

করেছেন। এছাড়া, তিনি পেগানদের দরিদ্রদের তাদের গুণ বিচার না করে ব্যক্তিগতভাবে দান করার তাগিদ

দিয়েছেন:

আমাদের তাহলে সবার সাথেই আমাদের অর্থ ভাগ করতে হবে, তবে যারা ভালো, অসহায় আর দরিদ্র তাদের প্রতি বেশি উদার হতে হবে যাতে তাদের অভাব মেটানো যায়। খানিকটা স্ববিরোধী হলেও আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, এমনকি দুষ্টদের সঙ্গে আমাদের পোশাক-আশাক ভাগাভাগি করাটাও ধার্মিকের কাজ হবে। কারণ আমরা মানুষের ভেতরের মনুষ্যত্বকেই দান করছি, তার নৈতিক চরিত্রকে নয়। সুতরাং, আমি মনে করি যে এমনকি যাদের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদেরও একই রকম যত্নের অধিকার রয়েছে, যেহেতু এই ধরনের ফিল্যানথ্রপি (ফিল্যানথ্রপিয়া) বিচার বিঘ্নিত করবে না।[৫৪]

উদাহরণ হিসাবে তিনি ইহুদি, ক্রিশ্চান উভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন:

এটা খুবই অসম্মানজনক যে যেখানে কোনও ইহুদি কখনও ভিক্ষা মাগে না, আর বিধর্মী গালিলিয়রা [ক্রিশ্চানরা] কেবল তাদের দরিদ্রদেরই নয় বরং আমাদের লোকদেরও সাহায্য করে, সেখানে আমাদের লোকজন [পেগানরা] আমাদের কাছ থেকে সাহায্য পায় না।[৫৫]

এভাবে এটা স্পষ্ট যে জুলিয়ান ক্রিশ্চান ধর্মের প্রতি বিপুল ঘৃণা সত্ত্বেও ক্রিশ্চান কায়দায় বেড়ে ওঠার কিছু অংশ বজায় রেখেছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনের পর চার্চ বিভিন্নভাবে তাদের চার্চ ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি সমর্থনসহ আর অনেক বেশী ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিল। থিয়োদোসিয়াসের (৩৭৯-৩৯৫) অধীনে পেগানবাদের পদ্ধতিগত দমনের কাজ শুরু হয়েছিল।

সাম্রাজ্যের খ্রিস্টয়করণের একটা প্রভাব ছিল চার্চের ক্রমবর্ধমান সেক্যুলারকরণ। এই অবস্থা চতুর্থ শতকের শেষে এবং পঞ্চম শতকের শেষের চার্চ-ফাদারদের রচনায় উঠে এসেছে। সেইন্ট জন ক্রিসোস্তোমের ধর্মকথা (সিএ. ৩৪৭–৪০৭, ৩৯৮ থেকে কন্সট্যান্টিনোপলের আর্চবিশপ) একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় তুলে ধরেছেন যা দিয়ে আমি এই আলোচনা শেষ করব।[৫৬] জন অপব্যয় আর দরিদ্রদের প্রতি চার্চের ধনী

সদস্যদের অসন্তোষ নিয়ে দুঃখ করেছেন। ভিক্ষা না দেয়ার পক্ষে তাদের অজুহাত, বিশেষ করে ভিক্ষা দানকে চার্চের বাজেটের অংশ বলে দাবি করা, নিয়ে বেশী ক্ষিপ্ত ছিলেন তিনি। তিনি প্রচলিত গ্রিক গুণ ফিলোতিমিয়া ('সম্মানের প্রতি ভালোবাসা,' উপরে আলোচিত)-কে অশুভের মূল একটি কারণ বলে আবিষ্কার করেছেন:

> ধনীরা তাদের দলভুক্তদের এমন এক মর্যাদার দিকে চালিত করে যা আসলে প্রকৃত সম্মানের বিপরীত, কিন্তু তাকে এমনভাবে রঙ করা হয়েছে যে মনে হয় তাই বুঝি ঠিক; যদিও আসলে তা নয়। কারণ বারবণিতার সুন্দর চেহারা প্রসাধন আর আইলাইনারের মাধ্যমে সৃষ্ট করা হলেও তা প্রকৃত সৌন্দর্যঋিত, এটা আসলে কুৎসিত কদর্য চেহারাকেই আপাতসুন্দর করে তোলে যা লোকে দেখে বিভ্রান্ত হয়, যদিও বাস্তবে ব্যাপার তা নয়। ঠিক এভাবে ধনীরা তোষামোদকে জোর করে মর্যাদা বোঝাতে চায়।[৫৭]

জন ধনীজনদের এই প্রবণতার প্রতিষেধক হিসাবে গস্পেলে ক্রাইস্টের বিধিনিষেধ আর তাদের মাঝে দরিদ্রজনের উপস্থিতি নিস্কৃতির সুযোগের তারিফ করেছেন। কিন্তু আমরা সন্দেহ করতে পারি যে 'সুভাষী' যাজক তাঁর অনুরোধে তেমন একটা সাফল্য পাননি।

সমাপনী মন্তব্য

ফিল্যানথ্রপির প্রাচীন উৎস অনুসন্ধানের এই জরিপে আমরা পেগান গ্রিস, জুদাইজম আর আদি ক্রিশ্চানিটির সাহিত্যে গ্রিক বুলি 'ফিল্যানথ্রপিয়া' ও এর বিভিন্ন অনুষঙ্গের ব্যবহার জানতে পেরেছি। এইসব ট্র্যাডিশনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ 'ফিল্যানথ্রপিক' প্রতিষ্ঠানও বিবেচনা করেছি। আমাদের বিবরণ চতুর্থ শতকের রোমান সাম্রাজ্যে এসে পর্যবসিত হয়েছে, যা ক্রিশ্চাানিটির বিজয় ও সেই বিজয়ের সহযোগী পরিহাসও প্রত্যক্ষ করেছে।

ক্রিশ্চান বিজয়ের উপাদান আলোচনা করার স্থান এটা নয়, তবে এটা উল্লেখ করতে চাই যে ক্রিশ্চানিটির বিস্তার ও এর সাফল্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল ফিল্যানথ্রপির ক্রিশ্চান আদর্শের চর্চা, যেখানে যত্নবান লোকদের 'নেটওয়ার্ক' অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা দরিদ্রদের প্রয়োজন আর চেনা-অচেনা নির্বিশেষে তাদের ভোগান্তির দিকে খেয়াল রাখতেন।[৫৮] হাদ্রিয়ানের উদ্দেশে অ্যারিস্তাইদের দেওয়া দ্বিতীয় শতকের ক্রিশ্চানদের বিবরণ যে কোনও ফাঁকা আদর্শকরণ ছিল না সেটা ক্রিশ্চানবিরোধী সম্রাট জুলিয়ানের মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি ক্রিশ্চান (আর ইহুদিদেরও) পেগান পুরোহিতদের অনুকরণীয় উদাহরণ বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে ক্রিশ্চানিটির বিজয়ের পরিহাসময় অনুষঙ্গও রয়েছে। ক্রিশ্চান জমায়েতের উদ্দেশে জন ক্রিসোস্তেমের আবেদনে যা আংশিকভাবে উঠে এসেছে। তিনি সেইসব লোকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছিলেন যারা এখন ক্রিশ্চান রাজকীয় শক্তির অংশ হয়ে গেছে, যারা ক্রিশ্চান ধর্মের বিজয়ের মূল্যবোধগুলো বিস্মৃত হতে শুরু করেছে। এটাই

আসলে আমাদের নিজেদের সমাজে, আমাদের নিজেদের সময়ে ক্রিশ্চানিটির ইতিহাসের একটা বড় অংশ।

সূত্র

১. প্রম. ৮-১১, লোয়েব ক্লাসিকাল লাইব্রেরি সংস্করণে স্মিদের অনুবাদ।

২. ইউথিফ্র. ৩ ডি, এলসিএল সংস্করণে ফাউলারের অনুবাদ।

৩. সিরোপিডিয়া ১.২.১, এলসিএল সংস্করণে মিলারের অনুবাদ।

৪. ইসোক্রেতিস অর. ৯.৪৩, এলসিএল সংস্করণে হুকের অনুবাদ।

৫. দেমোসথেনেস অর. ২০.১৬৫, এলসিএল সংস্করণে ভিন্সের অনুবাদ।

৬. ডিস. ৩.২৪.৬৪, এলসিএল সংস্করণে ওল্ডফাদারের অনুবাদ।

৭. ডিস. ৪.৮.৩২।

৮. কম. নট. ৩২.১০৭৫ ই, লেসিএল সংস্করণে চারনিসের অনুবাদ।

৯. এলএসজে গ্রিক-ইংলিশ অভিধানে উল্লেখ ১৯৩২ এ।

১০. বিশেষভাবে দেখুন এ.আর. হ্যান্ডস, চ্যারিটিজ অ্যান্ড সোস্যাল এইড ইন গ্রিস অ্যান্ড রোম (ইথাকা:কর্নেল ইউ.
প্রেস ১৯৬৮) ৩৫-৩৭।

১১. বিশেষভাবে দেখুন নেপথালি লুইস , লাইফ ইন ঈজিপ্ট আন্ডার রোমান রুল (অক্সফোর্ড: ক্লারেনডন, ১৯৮৩) ১৭৭-
৮৪।

১২. দেখুন হ্যান্ডস, চ্যারিটিজ, ৮৯-১৪৫।

১৩. অ্যাস্কিপিওস: আ কালেকশন অ্যান্ড ইন্টরপ্রিটেশন অভ দ্য টেস্টিমোনিজ (২ খ , বাল্টিমোর: জন হপকিন্স প্রেস,
১৯৪৫) এ এম্মা জে. এডেলস্টেইন সংগৃহীত ও মূল্যায়িত প্রাচীন টেস্টিমোনিয়া দেখুন।

১৪. এডেলস্টেইনের আলোচনা দেখুন, অ্যাস্কিপিওস ২:১৭৩-৮০।

১৫. উদাহরণের জন্যে এইলিয়ান, ন্যাট অ্যানিমেল. ৯.৩৩; এ. এরিসটইডস, অর. ৩৯.৫।

১৬. এডেলস্টইন, অ্যাস্কিলিপিওস, ২:১৭৮।

১৭. নিকোমাচিয়ান এথিকসের ধনস্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি গুণ হচ্ছে 'চমৎকারিত্ব'
(মেগালোপ্রিয়াপেইয়া–৪.২.১–২২)। অ্যারিস্টটলের কাছে এরচেয়েও বড় গুন হচ্ছে বিশালতা, 'হৃদয়ের বিশালতা'
(মেগালোপসুচিয়া), যার সাথে সম্মানের ব্যাপারটি জড়িত (সময়-৪.৩.১-৩৮)।

১৮. দিয়োজিনেস লিয়ারতিয়াস ৬.৫০, এলসিএল সংস্করণে হিক্সের অনুবাদ, নিউ টেস্টামেন্টে সিএফ ১ টিম ৬.১০:

"অর্থের প্রতি মায়া সব অশুভের উৎস।"

১৯ এই পার্থক্যের জন্যে দেখুন বিশেষ করে গিলদাস হামেল, পোভার্টি অ্যান্ড চ্যারিটি ইন রোমান প্যালেস্টাইন, ফার্স্ট

থ্রি সেঞ্চুরিজ সি.ই. (বার্কলি ইউসি প্রেস, ১৯৯০) ১৬৭-৭০।

২০. রিপাবলিক ৮.৫৫২ ডি

২১. প্লাতিয়াস, ত্রিনাম্মাস ৩৩৯, এলসিএল সংস্করণে নিকসনের অনুবাদ। প্লাতিয়াসের সকল নাটকই বিসিই তৃতীয়

শতকের গ্রিক মূলের উপর ভিত্তি করে রচিত বলে মনে করা হয়। এখন হারিয়ে গেছে।

২২. এলসিএর সংস্করণে থ্যাকারের অনুবাদ।

২৩. ভিন্ন রূপ উল্লেখ না থাকলে স্ক্রিপ্চারের উদ্ধৃতিসমূহ নিউ রিভাইজড ভার্শান থেকে নেওয়া। (বাংলা অনুবাদ

বাংলাদেশ বাইবেল সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'পবিত্র বাইবেল' থেকে নেওয়া–অনুবাদক)

২৪. ইসরায়েলের ঈশ্বরের নাম ওয়াইএইচডব্লু এইচ (সম্ভবত 'ইয়াহয়েহ' উচ্চারিত হত) কিন্তু জোরে বলার সময়

অ্যাদোনাই (='প্রভু' বা 'আমার প্রভু') উচ্চারিত হত।

২৫. লেবীয় ১৯:১০ হিব্রুতে বলা হচ্ছে 'নাই, বেং হিব্রুত দল।

২৬. সিএফ এছাড়াও আমোস ৪:১-৩; ৫: ১১-১৩; ৮: ৪-৬।

২৭. সিএফ আরও দেখুন যিশাইয় ১০: ১–৪।

২৮. হার্বার্ট ডেনলির অনুবাদে, দ্য মিশনাহ (অক্সফোর্ড ইউ. প্রেস, ১৯৩৩) ২০।

২৯. দেখুন হ্যামেল, পোভার্টি অ্যান্ড চ্যারিটি, ২১৮-১৯ সিএফ আরও দেখূন জর্জ এফ. মুর, জুদাইজম ইন দ্য ফার্স্ট

সেঞ্চুরিজ অফ দ্য ক্রিশ্চান এরা: দ্য এজ অফ দ্য তন্নাঈম (ক্যাম্ব্রিজ এমএ: হার্ভার্ড ইউ. প্রেস, ১৯২৭) ২:১৬২-

৭৯।

৩০. হ্যামেল, পোভার্টি অ্যান্ড চ্যারিটি, ২১৬। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হচ্ছে দান করা। আরবি যাকাত স্বেচ্ছা

দান সাদাকাত অন্তর্ভুক্ত করে, এটা নিশ্চিতভাবেই ইহুদি ধর্মের উত্তরাধিকার।

৩১. বেন সিরা হিব্রুতে লিখেছেন এবং তাঁর জ্ঞানের গ্রন্থটি আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর পৌত্রের হাতে গ্রিক ভাষায় অনূদিত

হয়। এই অনুবাদ গ্রিক বাইবেলের একটা অংশ, দ্য সেপেটাজিন্ট।

৩২. সিএফ আরও ৭:১০, ৩২-৩৬; ১২:৩-৭; ১৪:১৩; ১৭:২২; ১৮:১৫; ২৯:১-২০; ৩৫:৪; ৪০:১৭।

৩৩. সিএফ আরও ১২:৮-৯।

৩৪. জে. পি'য়া ১৫ বি-সি; টি. পি'য়া ৪.১৯; সুক্কা ৪৯১, মুরের জুদাইজম-এ উদ্ধৃত। ১৭ ১এফ।

৩৫. আইজাক আন্তরমানের অনুবাদ ও ধারাভাষ্যে উদ্ধৃত, পিরকে অ্যাবোথ: সেইংস অফ দ্য ফাদারস (নিউ ইয়র্ক: টঅনি

পাবলিলার্শ , ১৯৬৪) ৩১। সিমিওন দ্য জাস্ট ছিলেন সিএ ২০০ বিসিইতে জেরুজালেম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

মন্দির ধংসের পর ইহুদিবাদে প্রার্থনা 'স্বর্গীয় সেবার' স্থান দখল করে (মন্দির কাল্টের উৎসর্গ) ।

৩৬. আলোচনার জন্যে দেখুন হ্যামেল, পোভার্টি অ্যান্ড চ্যারিটি, ১৭৭-৮৬।

৩৭. কুয়োদ ওমনিস প্রোবাস লিবার সত ৭৬, এলসিএল সংস্করণে কলসনের অনুবাদ।

৩৮. গীর্জার ইতিহাসবিদ ইউজেবাস মনে করেন যে ফিলো আলেকজান্দ্রিয়ার আদি ক্রিশ্চানদের কথা বর্ণনা করছেন

(হিস্ট., ঈল, ২.১৭), কিন্তু এই অনুমানের পেছনে কোনও ভিত্তি নেই।

৩৯. উদাহরণ স্বরূপ কিছু অন-অনুশাসনিক রচনা ১ ক্লিমেন্ট অ্যান্ড দিদোচে পরবর্তীকালের নিউ টেস্টামেন্টের পূর্বের

রচনা, ১-২ টিমোথি, টাইটাস, এবং পিটার। নিউ টেস্টামেন্ট অনুশাসন রচনার নরম্যাটিভ লিস্ট হিসাবে চতুর্থ

শতাব্দীর ঘটনা। চার্চের আদি পবিত্র স্ক্রিপ্চার ছিল 'ওল্ড টেস্টামেন্ট', অর্থাৎ হিব্রু বাইবেল, শেষ পর্যন্ত ইহুদি

ডায়াসপোরায় বিকশিত গ্রিক ভাষ্যে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

৪০. বিশেষণ ফিল্যানথ্রপোস একই গ্রন্থে পলকে তাঁর যাত্রার সময় পাহারা দেওয়া রোমান প্রহরীদের আচরণ বোঝাতে

ব্যবহার করা হয়েছে।

৪১. থিয়োলজিকাল ডিকশনারি অফ দ্য নিউ টেস্টামেন্ট: ৯:১১১-১২। ক্লিমেন্ট প্রবলভাবে ফিলো অফ আলেকজান্দ্রিয়া

এবং গুণাবলী সম্পর্কিত ফিলোর আলোচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন (উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)। তাঁর স্ট্রোমাটিজ-

এ এর প্রতিফলন ঘটেছে। দেখুন আনাওয়াইজ ভ্যান ডেন হোয়েক, ক্লিমেন্ট অফ আলেকজান্দ্রিয়া অ্যান্ড হিজ ইউজ

অফ ফিলো ইন দ্য স্ট্রোমেটিজ: অ্যান আর্লি ক্রিশ্চান রিশেপিং অফ আ জুইশ মডেল (লিডেন: ব্রিল, ১৯৮৮)।

৪২. সিএফ. গস্পেল অফ টমাস, ৫৪ নম্বর শ্লোক, 'তোমাদের দীনেরা ধন্য, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।' (আমার

অনুবাদ)।

৪৩ 'আত্মায় দীনহীন' শব্দবন্ধনি ডেড সী স্ক্রোল-এও দেখা যায়, উদাহরণ স্বরূপ আইকিউএম ১৫, ৭।

৪৪. দেখুন মার্টিন হেনজেল, প্রপার্টি অ্যান্ড রিচেস ইন আর্লি চার্চ: আস্পেক্টস অফ আ সোস্যাল হিস্ট্রি অফ আর্লি
ক্রিশ্চানিটি (ফিলাডেলফিয়া: ফোট্রেস প্রেস, ১৯৭৪) ২৪

৪৫. ভবঘুরে ক্যারিশম্যাটিক আর তাদের স্থানীয় সমর্থক গ্রুপদের ব্যাপারে দেখুন জার্ড থেইসেন, সোসিওলোজি অভ
আর্লি প্রালেস্টাইনিয়ান ক্রিশ্চানিটি (ফিলালডেলফিয়া: ফোরট্রেস প্রেস, ১৯৭৮)।

৪৬. একলেসিয়া= কেহেল ইয়েওয়েহ: ডিউট ২৩: ২, ইত্যাদি।

৪৭. ইবিওনাইট ও অন্যান্য ইহুদি-ক্রিশ্চান গ্রুপ বিষয়ে আলোচনার জন্যে বিশষেভাবে দেখুন এ.এফ.জে.ক্লিন,
প্যাট্রিস্টিক এবিডেন্স ফর জিউইস-ক্রিশ্চন সেক্টস (লেইডেন: ব্রিল, ১৯৭৩)।

৪৮. উদাহরণের জন্যে দেখুন হেনগেল, প্রোপার্টি অ্যান্ড রিচেস (এন. ৪৫); এছাড়াও রবার্ট এম. গ্র্যান্ট, আর্লি ক্রিশ্চানিটি
অ্যান্ড সোসায়েটি: সেভেন স্টাডিজ (নিউ ইয়র্ক: হারপার অ্যান্ড রাউ, ১৯৭৭) বিশেষ করে অধ্যায় ৬: 'দ্য
অরগানাইজেশন অফ আল্মস'(পৃষ্ঠা ১২৪-৪৫) বাইযান্টাইন আমলের জন্যে দেখুন ডেমিটেরিওস জে.কন্সট্যানটেলস,
বাইযান্টাইন ফিলোসফি অ্যান্ড সোসাল ওয়েল ফেয়ার (নিউ ব্রান্সউইক: রাটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮)।

৪৯. অ্যারিস্তাইদস, অ্যাপোলজি ১৫, সিরিয়াক থেকে জে. রেন্ডাল হ্যারিস কর্তৃক অনূদিত (টেক্সট অ্যান্ড স্টাডিজ ১.১;
ক্যাম্ব্রিজ: ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৮৯১)।

৫০. কুইস দিভেস স্যালভেতর, এল সিএল সংস্করণে বাটারওঅর্থ-এর অনুবাদ।

৫১. ধর্মকথা কপ্টিক ভাষায় রক্ষিত আছে। দেবদূত মাইকেলের উপর বিষয়বস্তু সম্বলিত পরবর্তীকালের সংযোজন
রয়েছে বলে মনে হয়। সূচনা ও অনুবাদের জন্যে দেখুন বার্জার এ. পিয়ারসন ও টিম ভিভিয়ান, টু কপ্টিক হোমিলিজ
অ্যাট্রিবিউটেড টু সেইন্ট পিটার অফ আলেজজান্দ্রিয়া: অন রিচেস, অন দ্য এপিফ্যানি (রোমা: সি.আই.এম, ১৯৯৩)

৯-৩৯ ও ৯৫-১৪৪. সিএফ আরও পিয়ারসন, আ কপ্টিক হোমিলি অন রিচেস অ্যাট্রিবিউটেড টু সেইন্ট পিটার অফ
আলেকজান্দ্রিয়া, স্টুডিয়া প্যাট্রিসটিকা ২৬ (ল্যুভেন ফীটারস, ১৯৯৩) ২৯৬-৩০৭।
৫২. গ্র্যান্ট, আর্লি ক্রিশ্চানিটি অ্যান্ড সোসায়েটি, ১৪৪এফ
৫৩. জুলিয়ান এপি. ২২. ৪২৯-৪৩০ সি. এলসিএল সংস্করণে রাইটস-এর অনুবাদ।
৫৪. জনৈক পুরোহিতের কাছে লেখা চিঠির অংশবিশেষ। ২৯০ ডি-২৯১ এ (রাইট)।
৫৫. এপি. ২২. ৪৩০ ডি (রাইট)।
৫৬. পরের বিষয় ব্যাপকভাবে ব্লেক লেইরলে, 'জন ক্রিসোস্তোম অন আল্মস গিভিং অ্যান্ড দ্য ইউজ অফ মানি,'
হারভার্ড থিয়োলজিকাল রিভিউ ৮৭ (১৯৯৪) ২৯-৪৭ ভিত্তিক।
৫৭. ক্রিসোস্তোম, কুয়োদ নেমো সে লোদাতুর নিসি আ সেইপসো ৯ (পিজি ৫২. ৪৭০). লেইয়ারলে-এ উদ্ধৃত, 'জন
ক্রিসোস্তোম,' ৩৫-৩৬।
৫৮. সমাজবিদ রডনি স্টার্কের নতুন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দ্য রাইজ অফ ক্রিশ্চানিটি: আ সোসিওলজিস্টস রিকনসিডারস
রিলিজিয়ন দারুণ দক্ষতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। (প্রিন্সটন, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬)।

[বি.দ্র. 'হালখাতা'র সম্পাদক ও উপরিউক্ত অনুবাদকের নাম হুবহু এক কিন্তু এরা আলাদা ব্যক্তি।]

মূল রচনা সংগ্রহ: জাইদ-বিন-কালাম।